মৃত্তিকা-তত্ত্ব

Or

(Philosophy of the Soil)

'কৃষিক্ষেত্র', 'সবজীবাগ', 'ফলকর', 'মালঞ্চ', 'পটেটো-কাল্‌চার',
'টি্‌টিজ-অন-ম্যাঙ্গো' প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

Late Fellow of the Royal Horticultural Society of London,
late Superintendent of Gardens, Raj-Durbhanga,
Nizamat State Gardens, Murshidabad;
Chaluvamba Vilas Park, Mysore;
formerly of the Cossipur
Horticultural Institution, Calcutta

প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সন ১৩৩১ সাল

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

Printed by—**N. K. Basu.**
KRISHNA PRINTING WORKS.
13, Mohendra Bose Lane Shambazar,
CALCUTTA.

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

আট নয় বৎসর পূর্ব্বে 'কৃষক' নামক মাসিক পত্রিকায় মৃত্তিকা সম্বন্ধে ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত হয়। সেই অবধি মৃত্তিকা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লিখিবার বাসনা ছিল কিন্তু নানা ঝঞ্ঝট বশতঃ এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যে তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। উক্ত প্রবন্ধ নিচয় অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকা-তত্ত্ব লিখিত হইল।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব রচনাকালে সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ Wrightson, Fletcher প্রভৃতির পুস্তক দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, এজন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

অতঃপর 'কৃষিগ্রন্থাবলী'র প্রচার বিষয়ে বহুসম্মানাস্পদ দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর, কে, সি, আই, ই; মুরসিদাবাদের স্বদেশহিতৈষী নবাব বাহাদুর এবং আসাম-গৌরীপুরের বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। কিমধিকমিতি।

২৭।১ নং বিডন রো, কলিকাতা
১ লা বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

• দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিতে অনেকের কষ্ট বোধ হয়। একে ত ইহা নীরস বিষয়, উপরন্তু বিষয়টী অপেক্ষাকৃত গুরুতর, সুতরাং নাটক-নবেলের ন্যায় পড়িলে চলেনা, এক-বার, দুইবার, তিনবার বিশেষ মনোযোগ সহকারে না পড়িলে ইহার মজ্জাগতভাব আদায় হয় না, এই জন্য অনেকে ইহার মর্ম্মোদঘাটন করিতে পারেন না। কৃষিকর্ম্মে সফলকাম হইবার জন্য, মৃত্তিকার তত্ত্বটুকু বিশেষভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। চাষ আবাদের প্রথম উপকরণ বা উপাদান,—মাটী। সেই মাটী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে কৃষি কার্য্যে অনেক সময় ব্যর্থমনোরথ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। এই জন্য অনেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। অতএব মনোযোগ সহকারে কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা চাই। এই পুস্তক পাঠে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক হইল বিবেচনা করিব। কিমধিক-মিতি।

১লা বৈশাখ,
সন ১৩৩১ সাল। } শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা



উপক্রমণিকা

—:*:—

মানব সমাজের উন্নতির প্রথম সোপান—কৃষিকার্য্য। বর্ব্বরতার ঘোর তিমির মধ্যে থাকিয়া মানুষের মনে স্বতঃই কৃষিকার্য্য করিবার বাসনা হয়। অরণ্যজাত ফলমূল ভক্ষণে বা বন্য পশুপক্ষী বা মৎস্যাদি শীকার করিয়া জীবন ধারণ করা চিরদিন সুখকর ও সুবিধাজনক নহে। ইহা যখন মানুষ বুঝিতে পারিল তখন কৃষির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অভাবই—অভাব মোচনের উপায় দেখাইয়া দেয়। অভাব না হইলে সহজে কাহারও জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না, কাজেই মানুষকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যখন তাহারা ক্ষেত্র হইতে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইল, তখন কৃষির উন্নতি করিবার চেষ্টা হইল। আর্য্যেরা অতি পুরাতন জাতি এবং তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যখন তাঁহারা নানা অসুবিধা দেখিতে পাইলেন তখন সেই সকল অভাব কি উপায়ে বিদূরিত হইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে ও তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভূমি কর্ষণের জন্য যন্ত্রাদির সৃষ্টি হইল, ক্ষেত্র কর্ষণের একটা ব্যবস্থা হইল, ক্ষেত্রে সার প্রদান করা, জলসেচন করা প্রভৃতির আবশ্যকতা অনুভূত হইল।

কৃষিকার্য্য জনসমাজের উন্নতির ভিত্তি। যত প্রকার শিল্প বা বাণিজ্য আছে, তৎসমুদায়ই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষির অনুগামী।

কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া লোকে বাণিজ্য করে ও শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া মানব সমাজের সুখ-সমবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। কৃষি আছে বলিয়া ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই ফসল হইতে কত কল-কারখানা চলিতেছে, কত শ্রমজীবী কত প্রকারে প্রতিপালিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনেক সামগ্রী কৃষিজাত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয় না সত্য, কিন্তু যাহারা সেই সকল শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের মুল উদ্দেশ্য,—শ্রমজাত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় বা বিনিময় করিয়া আহার্য্য শস্যের সংস্থান করা। আহার্য্যের প্রয়োজন না থাকিলে কে কাহার জন্য পরিশ্রম করিত,—কে কষ্ট স্বীকার করিয়া শিল্প সম্ভার উৎপন্ন করিতে প্রয়াস পাইত ?

কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন—ভূমি। ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে তজ্জাত ফসলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা ও মৃত্তিকার উপাদান ভেদে উক্ত শক্তি পরিচালিত হইয়া থাকে। এইজন্য মৃত্তিকা সম্বন্ধে যত জ্ঞান থাকে, চাষ-আবাদের পক্ষে তত শুভকর। এস্থলে উল্লেখ, করা আবশ্যক যে, কেবল বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় যেরূপ ইহা সুসিদ্ধ হয় না, সেইরূপ কেবল প্রাকৃত বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় হওয়া সম্ভব নহে। কৃষির তাবৎতত্ত্ব অবগত থাকিলেও বৈজ্ঞানিক দ্বারা সুশৃঙ্খলে চাষ-আবাদ হওয়া সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসঙ্গত জ্ঞানের সহিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইলে সকল দিকে শোভা পায়, কার্য্যক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞান আলোচনা না করিয়াও কৃষকগণ যত কার্য্য করিতে পারে, মহা মহা বৈজ্ঞানিক দ্বারা তাহা হয় না। কৃষক নিরক্ষর হইলেও তাহার বহু দর্শন ও অভিজ্ঞতা মূল্যবান, সুতরাং কৃষক উপেক্ষাযোগ্য নহে। অভিজ্ঞ কৃষকের নিকট বিজ্ঞান পরাভব স্বীকার করিবে, কিন্তু কৃষকের

অভিজ্ঞতা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া সকল ক্ষেত্রে সকল সময় তদ্দ্বারা সুফল পাইবার আশা করা যায় না। বিজ্ঞানসম্ভূত কৃষির বিশেষত্ব এই যে, সকল দেশে সকল সময়ে মূলসূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে পারা যায়। একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া কাজ করিলে অনেক স্থলে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়।

কৃষির মুখ্য উদ্দেশ্য,—ক্ষেত্র হইতে অল্প ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা। চাষ-আবাদ করিবার সঙ্গে ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব সাধ্যানুসারে অবগত হইবার চেষ্টা করা উচিত। এইজন্য মৃত্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মৃত্তিকাসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে পারা যায় না, সুতরাং কৃষকদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিলে কৃষকের চলিতে পারে, কারণ কৃষকের অভাব অল্প,—কৃষক অল্পেই সন্তুষ্ট। ভদ্রশ্রেণীর অভাব অধিক, সাংসারিক ও সামাজিক ব্যয় অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃষি-কার্য্যে অবতরণ করিতে হইবে। কৃষক যে ক্ষেত্র হইতে পাঁচ মণ ফসল উৎপন্ন করে, সে স্থলে ভদ্রলোককে অন্ততঃ দশ মণ ফসল করিতে হইবে, তবে ব্যয় আদায় হইয়া লাভ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইজন্য কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন মৃত্তিকা,—ইহা মনে রাখিয়া মৃত্তিকার উৎকর্ষতা সাধন করা, নষ্টশক্তির পুনঃসংস্থাপন করা, একান্ত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব

—:০:—

প্রথম অধ্যায়

—:০:—

অবতারণা

মৃত্তিকা যে কি, তাহা অনেকের ভাবিবার বিষয় নহে। যাঁহাদিগের ভাবিবার বিষয় অনেকের তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর বা সুযোগ হয় না। মৃত্তিকা সম্বন্ধে ভাবিবার যে কিছু আছে, তাহাও অনেকের ধারণার মধ্যে আসে না। কৃষক আবাদ করে, চিরদিন মাটি লইয়া নাড়াচাড়া করে, কিন্তু মৃত্তিকার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে কি না, উর্ব্বরতার ইতরবিশেষ হইতেছে কি না, তাহার খবর রাখে না। লোকের ধারণা যে, শত বৎসর পূর্ব্বে জমির যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবী যত পুরাতন হইতেছে, ততই উহা সমতল ভূমি হইবার পথে চলিয়াছে। কঠিন ও সুদৃঢ় পাহাড় পর্ব্বত প্রতিনিয়ত চূর্ণীকৃত হইতেছে, সেই চূর্ণরাশী বৃষ্টির সাহায্যে ক্রমেই নিম্নদেশে ধাবিত হইতেছে, অবশেষে যেখানে স্থান পাইতেছে, সেইখানেই থাকিয়া যাইতেছে। এইরূপে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি বুজিয়া যাইতেছে, ক্রমে তাহাতে উদ্ভিদ জন্মিয়া ভূমিকে আবাদের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। হিমালয়ের যে উচ্চতা একশত বৎসর পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে

তাহাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষয়ের পরিমাণ এত অল্প যে সহজে তাহা অনুভূত হয় না, কিন্তু হিসাব রাখিয়া দেখিলে এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস, শিশির, তুষার প্রভৃতির ক্রিয়াবশে প্রতিক্ষণই ভূ-পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সকল ক্ষেত্রই পরিবর্ত্তনের অধীন। নিম্নভূমি সকল উচ্চ ও গড়েন জমির ধোয়াট পাইয়া ক্রমশঃ যেমন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে উচ্চ ও গড়েন জমি সকল ধুইয়া যাওয়ায় নীচু হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে সমগ্র পৃথিবী যেন সমতল হইবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক কারণ ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই যে, সকল আবাদী ক্ষেত-পাথারই প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কৃষক আবাদ করে, ক্ষেত্র হইতে ফসল লইয়া যায়। যে পরিমাণ ফসল ক্ষেত্র হইতে সংগৃহিত হয়, তাহার সহিত ভূমির কতক মাটি স্থানান্তরে চলিয়া যায়। উদ্ভিদ, শাখা, পত্র, মূল, ফল, ফুল, বীজ—এ সকলই মৃত্তিকার রূপান্তর মাত্র। পতিত জমি ও অরণ্য-ভূমি হইতে মৃত্তিকা অপচয় হইতে পায় না, তাহার কারণ এই যে, তজ্জাত গাছ-পালা বা ফল-ফুল বড় একটা স্থানান্তরিত হইতে পায় না। ঈদৃশ ভূমিতে যে সকল তরুলতাদি জন্মে, তাহারা সেই খানেই মরিয়া যায়, ফলতঃ ভূমির জিনিস ভূমি পুনরায় ফিরিয়া পায়। আবাদী জমি হইতে ফসল, গাছ, ফল, ফুল, মূল, পত্র প্রভৃতি স্থানান্তরিত হয় বলিয়াই তাহাতে সার প্রদান করিতে হয়, কর্ষণাদি দ্বারা মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। আচটু জমি ও অরণ্য-ভূমি হইতে কোন জিনিস অপহৃত হয় না বলিয়া উহাদিগের মাটি এত সারবান থাকে যে, তাহাতে আবাদ করিলে প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর কোন প্রকার সার ব্যবহার করিবার আবশ্যকই হয় না।

ভূমির উন্নতি আছে, অবনতিও আছে। ভূমির উৎকর্ষতা রক্ষা করা অনেকটা মনুষ্যের করায়ত্ত এবং চেষ্টা করিলে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। যে স্থানে একটী তৃণ জন্মে, তথায় দুই চারিটী তৃণ উৎপন্ন করাই উন্নত কৃষির উদ্দেশ্য। মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে উদ্দেশ্য সফল হয়। সার প্রদান করিলেই ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহাই লোকের সাধারণ ধারণা। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার ইহাই যে একমাত্র ও প্রকৃষ্ট উপায় তাহা নহে। ক্ষেত্রের উন্নতি বিধানের জন্য অন্য অনেক উপায় আছে। মৃত্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কেবল সার প্রদান করিলে কোন ফল নাই।

উন্নত কৃষি

দ্বিতীয় অধ্যায়

—:০:—

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, আমাদিগের পৃথিবী আসল বা মূল গ্রহ নহে, সূর্য্যের স্খলিত অংশমাত্র। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য হইতে একটী বৃহৎ অগ্নিময় পিণ্ড স্খলিত হয় এবং কালক্রমে পৃথিবীর আকার ধারণ করে। উক্ত অগ্নিপিণ্ড নানাবিধ ধাতব পদার্থ সমন্বিত। উহার উত্তাপ হ্রাস হইবার সঙ্গে পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল এবং গলিত পদার্থ রাশি

পৃথিবীর উৎপত্তি

জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীময় পাহাড় পর্ব্বতরূপ ধারণ করিল। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা অধিত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়, নদ নদী ও সাগর গর্ভে এবং তাহাদিগের নিম্নভাগে সেইরূপ এখনও অবস্থিত। তাহা ব্যতীত ভূগর্ভের নিম্নতম দেশে এখনও নানাবিধ ধাতব পদার্থ উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় সাগরবৎ প্রসারিত রহিয়াছে। ভূগর্ভ মধ্যে উল্লিখিত তরল পদার্থের অবস্থান হেতু সময় সময় ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূগর্ভ অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে সেই তরল পদার্থ রাশি বিক্ষোভিত ও আলোড়িত হইয়া উঠে এবং তাহারই ফলে ভূগর্ভ হইতে কখন কখন ভীষণ শব্দোত্থিত হয়, তরঙ্গাঘাতে, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, কোন কোন স্থান বিদীর্ণ হইয়া নানাবিধ ধাতব পদার্থ, বাষ্প প্রভৃতি উদ্গত হয়। বিগত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান ফাটিয়া গিয়া ঐরূপ বাষ্পাদিনির্গত হইয়াছিল। আগ্নেয় গিরি—এট্না ও বিযুবিয়স হইতে এখনও মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। মুঙ্গের ও চন্দ্রনাথ তীর্থের সীতাকুণ্ড হইতে প্রতিনিয়র্ত যে উত্তপ্ত জল উত্থিত হইতেছে তাহাও ভূগর্ভস্থিত ধাতব পদার্থের কার্য্য। উক্ত জলে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্টই বিরাজিত। যাহারা বরিশালে থাকেন, কিম্বা যাহারা কখনও তথায় গিয়াছেন, তাঁহারা মেঘ-গর্জ্জনবৎ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকিবেন। উহা 'বরিশাল কামান' (Barisal Gun) নামে পরিচিত। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথচ কামানোদ্ভূত শব্দের ন্যায় শব্দ পরিশ্রুত হইয়া থাকে। এ সকলই ভূগর্ভস্থিত উত্তপ্ত তরল ধাতব পদার্থের আলোড়ন শব্দ মাত্র। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভূগর্ভস্থিত তরল ধাতু সমুদ্র এখনও শীতল হয় নাই। উহা শীতল হইলে পৃথিবীতে আর ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির কোন আশঙ্কা

থাকিবে না, কিন্তু তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে তাহাতে কোন সংশয় নাই।

কিরূপে পাহাড় পর্ব্বত উৎপন্ন হইল তাহা বলিয়াছি। তৎসমুদয় প্রথমাবস্থায় কেবলই প্রস্তরময় থাকায় তাহাতে কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারিত না, ক্রমে মৃত্তিকা উৎপন্ন হইতে লাগিল। মৃত্তিকার প্রথম উপাদান—

মৃত্তিকা

পর্ব্বতস্খলিত পরমাণু রাশি। পৃথিবী পর্ব্বতে পরিপূর্ণ ছিল, পরে বৃষ্টি, শিশির, তুষার, বরফ, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতির ক্রিয়াযোগে সুকঠিন প্রস্তররাশি সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ক্রিয়াবশেই পর্ব্বতাঙ্গ বিধৌত কিম্বা বিদীর্ণ বা চূর্ণ হয় এবং পরমাণুসমূহ জলস্রোতে নিম্নদেশে নামিয়া আইসে। বৃষ্টিতে পর্ব্বতের গাত্র বিধৌত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে পর্ব্বতের গাত্র হইতে প্রস্তরান্তর্গত পরমাণুরাশি ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তুষার, শিশির ও বরফ দ্বারাও তাহা হয়। অনন্তর শীতোত্তাপের ক্রিয়াহেতু প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া থাকে। বিদারিত স্থানে রস সঞ্চারিত হইবার পর অতিশয় শীতে সঞ্চিত রস বরফে পরিণত হয়। জল জমিয়া বরফ হয় কিন্তু জল তরল ও ঘন বলিয়া সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে থাকিতে পারে। বরফের ধর্ম্ম স্ফীত হওয়া, সুতরাং জল, বরফে পরিণত হইলে স্ফীত হইতে থাকে এবং সেইসঙ্গে পর্ব্বত গাত্র বিদীর্ণ হয়। বিদীর্ণ স্থান বা ফাটাল যতই সূক্ষ্ম হউক, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া কিট্টাল বা মরিচা উৎপন্ন করে। বায়ুর অন্তর্গত অম্লজান (Oxygen) পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই কার্য্যে নিযুক্ত। স্ফীত স্থানে এইরূপে গুঁড়া জন্মিলে স্বভাবতঃ তাহাতে ছাতা ও শেওলা জন্মে। ইহারা উদ্ভিজ্জগতের অতি নিম্ন বা প্রাথমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ক্রমে ইহারা মরিয়া গিয়া সেইখানেই স্থান লাভ

করে। ইহারা মরিয়া গেলে স্ফীত স্থানে উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রথম সংস্থান হয়। অনন্তর তাহাতে অপেক্ষাকৃত বৃহজ্জাতীয় শৈবাল (Moss) ফার্ণ (fern) প্রভৃতি অপৌষ্পিক উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ স্থানকে আরও বিস্তৃত করে এবং পরে তথায় আপনাদিগের দেহ রক্ষা করিয়া অন্তর্হিত হয়। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তথায় অপরাপর বৃহত্তর উদ্ভিদ দেখা দেয়। যত বড় বড় জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে থাকে, পর্ব্বতের মৃন্ময় দেহ তত স্ফীত বা বিদীর্ণ হইতে থাকে, অন্যদিকে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে স্থলবিশেষে স্তর পড়িয়া যায়! পাহাড় হইতে এই সকল পদার্থ বৃষ্টিতে ধুইয়া নিম্নতলে আসিয়া মৃত্তিকার কলেবর পূর্ণ করে। অতঃপর নিম্নতর দেশে উদ্ভিদ জন্মিতে থাকে, পরে সে সকল ভূমি আবাদের উপযোগী হইয়া উঠে।

উপাদান ভেদের কারণ

উল্লিখিত প্রণালীতে পুরাকাল হইতে নাবাল ভূমির কলেবর দিন দিন স্থূল হইতেছে ও ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। মৃত্তিকা মধ্যে যে আমরা নানাধিব ধাতব পদার্থ দেখিতে পাই তৎসমুদায়ই প্রস্তরজাত, কারণ প্রস্তর নিজেই নানাবিধ ধাতু-সমাবিষ্ট জমাট মাত্র। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সকল পর্ব্বতের বা সকল প্রস্তরের উপাদান সম-প্রকারের নহে বলিয়া সকল স্থানের মৃত্তিকার উপাদানও এক প্রকারের নহে। মৃত্তিকার আদি পদার্থ তরল ধাতু, সুতরাং তদন্তর্গত যে যে পদার্থ যে যে স্থানে থাকিয়া জমাটে পরিণত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ সেই সেই স্থানের পর্ব্বতাঙ্গে অবস্থিত। যে স্থানে যেরূপ পর্ব্বত-চূর্ণ স্থান পায়, তথাকার মৃত্তিকায় তদনুরূপ পদার্থের প্রাধান্য থাকে। এইজন্য কোন স্থানের মৃত্তিকায় বালুকা বা লৌহ বা গন্ধক অধিক, আবার কোথাও বা স্বর্ণ বা রৌপ্য বা টিন্ বা তাম্রের সমাবেশ

অধিক। অতঃপর ইহাও দেখা যায়, পর্ব্বতাঙ্গের সকল স্তর সম পদার্থে গঠিত নহে। গলিত পদার্থ যে ভাবে থাকিয়া শীতল হইয়াছে, তদন্তর্গত পদার্থ রাশি ও সেইভাবে থাকিয়া গিয়াছে। এইজন্য বিদীর্ণ পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত স্তর সমূহ যে একই ভাবে বা একই ভাগে সজ্জিত আছে তাহা নহে। পর্ব্বত সমূহ মধ্যে এইরূপ স্তরের বিভিন্নতাহেতু তদুৎপন্ন ভূমির স্তরমধ্যে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদ মূলের শক্তি

ভূপৃষ্ঠ যতই কঠিন হউক, শিলাচল যত দৃঢ় হউক উদ্ভিদ একবার তাহাতে কোনরূপে স্থান পাইলে তাহাকে ক্ষয় বা বিদীর্ণ করিবে। অতিশয় পিচ্ছিল স্থানে কোন বীজ সংস্থিত হইতে পারে না,এজন্য ঈদৃশ স্থানে কোন উদ্ভিদকে জন্মিতে দেখা যায় না, কিন্তু সামান্য ছিদ্র বা ফাটাল উৎপন্ন হইলে কোথা হইতে বীজ আপনি স্থান পায় ও উপ্ত হয়। মূল সকল রস ও আহার্য্য আহরণ করতঃ উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করে, কিন্তু তাহা ব্যতীত উহাদিগের আর একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। উক্ত কার্য্য,—উদ্ভিদকে এক স্থানে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন রাখা। মূল সকলের এ শক্তি না থাকিলে সামান্য বাতাসে বা বৃষ্টিতে উদ্ভিদ ভূলুণ্ঠিত হইত কিম্বা কোথায় ভাসিয়া যাইত। এইজন্য উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হইলেই মূল সকল একদিকে যেরূপ আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে আশ্রয়-স্থানকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে। পিচ্ছিল বা কঠিন স্থানে মূল সকল অবলম্বন পায় না, কিন্তু উহাদিগের শেষাগ্রভাগে যে অম্লাক্ত রস থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা সন্নিহিত সূচাগ্র স্থানকে জীর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম মূলকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপে সূক্ষ্ম মূলগণ ক্রমে ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং প্রস্তরকে ক্রমশঃ বিদীর্ণ করে, সুতরাং এতদ্দ্বারা মৃত্তিকা সৃষ্ট হইবার বিশেষ সাহায্য হয়। পাহাড় পর্ব্বতময়

কে মহীরুহ রোপণ করিতে গিয়াছে? উহারা আপনাপন স্থান আপনারা করিয়া লয়। সুদৃঢ় অট্টালিকার কোন স্থানে একটী অশ্বত্থ, বট বা অন্য গাছ রোপণ করিলে কিছুদিন মধ্যেই তাহা ফাটিয়া যাইবে—ইহা উদ্ভিদ মূলের কার্য্য। উদ্ভিদ দ্বারা মৃত্তিকার উৎপত্তি যেরূপ সহায়তা হইয়া থাকে, মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংস্থানেরও সেইরূপ সুবিধা হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ ব্যতীত জৈব পদার্থ (animal matters) সমূহ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। জৈব-পদার্থ কোথা হইতে আসে, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত হইলে তাহাতে নানাবিধ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ জন্মে ও উদ্ভিজ্জ পদার্থে জীবনধারণ করে এবং মরিয়া গেলে তাহাদিগের দেহাবশিষ্ট মৃত্তিকায় সংযুক্ত হয়। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ সংস্থিত হইবার ইহাই প্রধান কারণ। অতঃপর তাবৎ জীবের মৃতদেহ ভূমিতে আবহমানকাল হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের অভাব হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মৃত্তিকার জৈব-পদার্থ

মৃত্তিকার কলেবর পুষ্ট ও সারবান করিবার পক্ষে জীব অপেক্ষা উদ্ভিদ দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। শত বর্ষজীবী একটী প্রকাণ্ড হস্তী মরিয়া গেলে তাহার শুষ্ক দেহ হয়ত এক শত মণ, কিম্বা তজ্জাত ভস্ম একমণ হইতে পারে কিন্তু একশত বর্ষজীবী একটী অম্রবৃক্ষ শুষ্ক হইলে, পত্র, পল্লব, ছাল, মূল প্রভৃতির পরিমাণ পাঁচশত মণেরও অধিক হয় এবং তজ্জাত ভস্মের পরিমাণ ন্যূনকল্পে পাঁচমণ হইতে পারে। এই কারণে মৃত্তিকা মধ্যে স্বভাবতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ পদার্থই মৃত্তিকার তাবৎ গুণ

জৈব ও উদ্ভিজ্জ

বজায় রাখিবার প্রধান উপকরণ কিন্তু তাহা হইলেও উভয়বিধ পদার্থ মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং কোনটীই উপেক্ষাযোগ্য নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

সৌর-জগৎ-স্খলিত জড়পিণ্ড হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি—ইহা আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু উক্ত জড়পিণ্ড মধ্যে কোন কোন্ পদার্থ ছিল তাহা এক্ষণে দেখা উচিত। মৃত্তিকা মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ অবস্থিত তাহা জানিতে হইলে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হয় এবং মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে যে যে পদার্থ—মৌলিক পদার্থ (Elementary matters)—বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই সেই জলন্ত পিণ্ডমধ্যে ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মৃত্তিকান্তর্গত ভূত

মৃত্তিকার ভিত্তি বা কাটাম,—উত্তপ্ত তরল ধাতব ও খনিজ পদার্থ সম্ভূত জমাট বা শৈলস্খলিত চূর্ণ। উক্ত চূর্ণ বিবিধ পদার্থ সমন্বিত। আর্য্য মনিষী ও মহর্ষিগণ জানিতেন যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,—এই পঞ্চভূত দ্বারা পৃথিবী-গঠিত।* ইহা বহুকালের কথা। এক্ষণে

ভূত সংখ্যা

* (১) ক্ষিতি=ভূমি; (২) অপ্=জল; (৩) তেজ=অগ্নি; (৪) মরুৎ=বায়ু; (৫) ব্যোম=আকাশ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর-কাঠাম, ৭২টী উপাদানের সমাবেশে সংগঠিত। উক্ত বায়াত্তরটী পদার্থ আর্য্য মনিষী দ্বারা আবিষ্কৃত পঞ্চভূতের অতীত নহে, তবে পঞ্চভূত সংক্ষিপ্ত। কেবলই পঞ্চভূতের উপর নির্ভর করিলে বড় গোলযোগে পড়িতে হয়। পঞ্চভূতান্তর্গত সংযুক্ত পদার্থগণ বিশ্লেষিত হইলে প্রত্যেক ভুত হইতে অনেকগুলি মৌলিক পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক ভুত যুক্ত-পদার্থ। অধুনা যে সকল মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগের সংখ্যা চব্বিশটী মাত্র। অবশিষ্ট আটচল্লিশটী উক্ত চব্বিশটী মুল পদার্থের অঙ্গীভূত বা একাধিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। প্রথমোক্ত চব্বিশটী পদার্থ সাকার, তুলাধীন, নিরেট ও ব্যাপক। ইহাদিগের কিছুতেই বিনাশ নাই। ভূত বিশেষের সংস্পর্শে আসিলে ইহাদিগের বর্ণ বা আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত চব্বিশটী ভূত বা মূল পদার্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

(১) অম্লজান (Oxygen) (১৩) হাড়জান (Phosphorus)
(২) অঙ্গারজান্ (Carbon (১৪) লবণ (Chlorine)
(৩) জলজান (Hydrogen) (১৫) বালুকা (Silicon)
(৪) সোরাজান (Nitrogen) (১৬) পটাস (Potash)
(৫) গন্ধক (Sulphur) (১৭) সোডা (Soda)
(৬) লৌহ (Iron) (১৮) চুন (Lime)
(৭) পারদ (Mercury) (১৯) ম্যাগ্নেসিয়াম (Magnesium)
(৮) তাম্র (Copper) (২০) য়্যালুমিনিয়ম (Aluminium)
(৯) সীসক (Lead) (২১) ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

(১০) টিন (Tin) (২২) ক্রোমিয়ম (Chromium)
(১১) স্বর্ণ (Gold) (২৩) নিক্‌ল (Nikel)
(১২) রৌপ্য (Silver) (২৪) দস্তা (Zinc)

উল্লিখিত মৌলিক পদার্থ সমূহ মৃত্তিকার প্রধান উপাদান বা ভিত্তি, কিন্তু সর্ব্বস্থানে উল্লিখিত সকল পদার্থই যে থাকিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন স্থানে পদার্থ বিশেষ বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকিলে তাহা খনি নামে অভিহিত হয়। অতঃপর মৃত্তিকা অগ্নিদগ্ধ হইলে ইহাদিগের মধ্যে জলজান, অম্লজান ও অঙ্গারজান নামক পদার্থ কয়টী এবং তৎসহ সোরাজান ও ফস্ফরস কিয়ৎ পরিমাণে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে গিয়া স্থান পাইয়া থাকে। উহারা পুনরায় বায়ু ও বৃষ্টির সহিত ভূমিতে আসিয়া সংযুক্ত হয়।

ভৌতিক শক্তি

উল্লিখিত জড় পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী শক্তি নিহিত থাকে তাহাকে Force কহে। উহার কোন আকার নাই। স্থূল পদার্থের ক্রিয়া দেখিয়া আমরা তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। জড় হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিতে পারা যায় না! উক্ত শক্তি নানা আকারে অবস্থান করিতেছে। এই জন্য, জড় পরমাণুরাশি কখন সংযুক্ত বা বিযুক্ত, কখন বা উত্থিত বা পতিত হইতেছে; কখনও রসাকার কখনও বাষ্পাকার ধারণ করিয়া জগতের নানা কার্য্য সাধন করিতেছে। আলোক (Light), উত্তাপ (Heat), বিজলী (Electricity), চুম্বকতা (Magnetism), মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation), সম-সমাবেশ (Cohesion) দলবদ্ধতা (Crystalisation), সংলগ্নতা, (Adhesion) ঘনিষ্ঠতা (Affinity), দ্রাবকতা বা রসালতা, (Solution), প্রক্ষেপণ (Repulsion), জীবনী (Vitalty), প্রভৃতি উক্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া

সংসারের তাবৎ কার্য্য সমাধান করিতেছে। উক্ত শক্তির প্রচ্ছন্নাবস্থাকে সঞ্চিত বা ভাবী শক্তি (potential energy) এবং ক্রিয়াশীল অবস্থাকে প্রকৃত-শক্তি (Actual energy) কহে। উভয়বিধ প্রবল শক্তি, সকল জড় মধ্যেই অবস্থান করতঃ মৃত্তিকার মধ্যে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। ইহাদিগের ক্রিয়াবশে মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের বর্দ্ধনকারী যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদিকা-শক্তি কহে। মৃত্তিকার অবস্থা ভেদে উক্ত শক্তি কখন প্রচ্ছন্ন, কখনও বা ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে।

উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি মৌলিক পদার্থের মধ্যে অঙ্গারজান, অম্লজান, জলজান, সোরাজান, গন্ধক, হাড়জান ও লবণ—অম্লময় বাষ্পীয় পদার্থ মধ্যে গণ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

—:০:—

মৃত্তিকা-ভেদ

মৃত্তিকান্তর্গত উপাদান সমূহের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে মৃত্তিকা নানা প্রকারের হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে নানাবিধ উপকরণ আছে, তাহারই ইতরবিশেষে উহা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রকার মৃত্তিকারই গুণ ও শক্তি স্বতন্ত্র। ক্ষেত্র মধ্যে কোন স্থলে দীর্ঘিকা বা কূপ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকার বর্ণ সকল স্থানে সমান নহে। কোথাও সাধারণ মৃত্তিকা কৃষ্ণ বর্ণ, কোথাও শ্বেতাভ, কোথাও হরিদ্রাভ আবার কোথাও লালাভ বা পাংশু অথবা অন্য প্রকারের হইয়া থাকে।

ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। পৃথিবীর নিম্ন ভূমি যত ভরাট হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহাতে স্তর পড়িতেছে,—ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। উচ্চ ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে বর্ষাকালের অপরিমিত জলরাশি নিম্নতম প্রদেশে আসিয়া পড়ে। বন্যা ও জল-প্লাবনে কিম্বা নদ নদী ভাসিয়া গেলে সন্নিকটস্থিত গ্রাম নগর প্লাবিত হইয়া যায়, সেই জলের মধ্যে নানা দেশের ও নানা স্থানের নানাবিধ পদার্থ সংযোজিত হইয়া জলের সচ্ছতা বিদূরিত করে, জল ঘোলা হয়। উক্ত ঘোলা জলের মধ্যে যে সকল পদার্থ ভাসমান থাকে, তাহা ক্রমে ভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহাকে পলি কহে। পলি পড়িলে ভূমি যে স্বতঃই উচ্চ হইয়া উঠিবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বভাবজাত জঙ্গলের গাছ-পালা হইতে পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি নিরন্তর ঝরিতেছে, কত গাছ মরিয়া যাইতেছে। এই সকল দ্রব্য স্থানান্তরিত হইতে না পাওয়ায় যথাস্থানে থাকিয়া যাইতেছে এবং বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে,—ভূমিকে উচ্চ করিতেছে। স্তর উৎপত্তির ইহাও একটী কারণ।

স্তরের উৎপত্তি

ঘোলা জলে যে জাতীয় পদার্থ থাকে, স্তরও তদনুরূপ হয়। ঘোলা জল কখন পাটকিলে বর্ণের, কখন শ্বেতাভ বা কৃষ্ণাভ হয়। জলে যখন পাটকিলে পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তখন সে ঘোলা জলের বর্ণ পাটকিলে হয় এবং তদন্তর্গত পলি যথায় স্থান প্রাপ্ত হয় তথাকার মাটি পাটকিলে বর্ণের হইয়া থাকে, স্তরও সেই বর্ণের হয়। অনন্তর একই ভূমির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্তর দেখা যায়, তাহার কারণ,—প্রতি বারের স্তর এক প্রকারের হয় না। কোন সময়ে জলের সহিত হয়ত মাত্র বালুকা আসে, কোন সময়ে পাহাড়ী দেশের লাল মাটি, কোন

স্তরের বর্ণ

সময়ে অরণ্যের খোয়াট মশি বর্ণের মাটি আসিয়া পড়ে। জলের সহিত বালুকা রাশি ভাসিয়া আসিলে স্তর বালুকাময় হয় এবং তাহার বর্ণ সাদা হয়। এটেল মাটির পলি হইলে স্তর কৃষ্ণাভ হয়, উদ্ভিজ্জ প্রধান হইলে মশি বর্ণের হয়,—লৌহ সঙ্কুল হইলে লাল বর্ণের হয়। এইরূপ অপরিষ্কার বা ঘোলা জলে যে বর্ণের পদার্থ থাকে পলির স্তরও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

স্তরের গুণভেদ

অপরিষ্কার জলের বর্ণ ভেদে যেরূপ স্তরের বর্ণভেদ হয়, তদন্তর্গত উপাদান সমূহের তারতম্যে স্তর বিশেষের মাটির গুণও ভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, পলি পড়িলেই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সকল সময় এ যুক্তি খাটে না। পলি দ্বারা অনেক সময় যেমন জমি উর্ব্বরা হয়, সেইরূপ অনেক সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কোন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বালুকার ঘন পলি পড়িলে চিরদিনের জন্য না হইলেও, অন্ততঃ দুই চারি বৎসরের জন্য তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নদ গর্ভে অনেক সময় চর পড়ে। বালুকাপ্রধান চর হইলে প্রথম দুই তিন বৎসর প্রায় তাহাতে কোন গাছ পালা জন্মে না। ক্রমে তাহাতে বায়ু সংযোগে নানা জাতীয় পদার্থের ধূলা আসিয়া সঞ্চিত হয়। তখন উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ ও আগাছা জন্মিতে থাকে। অতঃপর তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদিগেরই ডাল-পালা, ফলফুল পাতা-শিকড় প্রভৃতি বালুকার সহিত সংযোজিত হয় এবং পচিয়া গিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হয়। এইরূপে যত দিন যায় ক্রমশঃ গাছ-পালা জন্মিয়া সেই বালুকা রাশির প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, তখন আবার উহা আবাদের উপযোগী হয়।

যে স্তরে এঁটেল-মাটি থাকে, তাহা চটচটে, পিচ্ছিল ও ঘন হইয়া

থাকে। দোঁ-আঁশ মাটির উপরে এঁটেল মাটির স্তর পড়িয়া জমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। পূর্ব্বে উক্ত জমিতে যে ফসল সুচারু রূপে জন্মিত, অতঃপর তাহা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাতে এরূপ ফসলের আবাদ করিতে হইবে যে, তাহারা এঁটেল মাটিরই উপযোগী। আলুর জমিতে এঁটেল মাটি সঞ্চিত হইলে তাহাতে আর আলু আবাদ করা চলে না, অগত্যা তাহাতে অপর ফসলের আবাদ করিতে হইবে। পুষ্করিণী খনন কালে প্রায় সকলে পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে মাটি ফেলিয়া থাকেন, ইহাতে অনেক জমির উপকার হয়, আবার অনেক স্থলে ক্ষতি হয়। এইরূপে অনেক উর্ব্বরা ভূমি—ক্ষেত্র-পাথার ও বাগ-বাগিচা—নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খোদিত মৃত্তিকার উপাদান ও গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাকে ভূমি নিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

—:*:—

মৃত্তিকায় প্রধানতঃ দুইটী জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) জৈব (Organic.) (২) অজৈব (Inorganic.) যাহাকে মৃত্তিকা বলা যায়, তাহা উক্ত জাতীয় পদার্থের সমষ্টিমাত্র। পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় উক্ত দুই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনেরা পৃথিবীর তাবৎ পদার্থকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া

মৃত্তিকার উপাদান

উল্লিখিত জাতি চতুষ্টয় ব্যতীত মৃত্তিকা মধ্যে আরও দুইটী অদাহ্য পদার্থ

গিয়াছেন। * তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর প্রভৃতি মৌলিক পদার্থকে সহস্রবার দগ্ধ করিলেও রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কখনও অস্তিত্বশূন্য হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সকলেই চেতন ও দাহ্য পাদার্থ। ইহাদিগকে দগ্ধ করিলে দাহ্য অংশ বায়ুমণ্ডলে গিয়া আশ্রয় লয়; ভস্মাবশেষ মাত্র পড়িয়া থাকে। উক্ত ভস্মাবশেষ অদাহ্য পদার্থ। যে সকল পদার্থ দাহ্য মধ্যে পরিগণিত, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কতকগুলি অদাহ্য ও কতকগুলি বাষ্পীয় পদার্থের সমাবেশে উৎপন্ন, তবে আলোচনার সুবিধার্থ দাহ্য ও অদাহ্য—এই দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ

এই যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পাহাড় পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারা প্রতিক্ষণেই বায়ু বৃষ্টি শিশির প্রভৃতির ক্রিয়াবশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন দেশে আসিয়া স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল চূর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার ধাতব ও খনিজ পদার্থ অবস্থিত। তৎসহ উদ্ভিজ্জ পদার্থও জীবদিগের দেহাবশেষ সম্মিলিত হইলে মৃত্তিকা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন হইতে উহা আবাদের উপযোগী হইয়া থাকে। তবে, সকল স্থানের মৃত্তিকা একপ্রকারের নহে। উপকরণের তারতম্যে মৃত্তিকা উত্তম বা অধম হইয়া থাকে এবং সেই হেতু মৃত্তিকার প্রকৃতি বহুগুণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইজন্য কোন স্থলের ভূগর্ভে উত্তাপ অধিক আবার কোন স্থানে শৈত্যের প্রাদুর্ভাব।

এইরূপ কোন স্থানের মাটিতে অম্লের প্রাখর্য্য, আবার কোন স্থানের লবণের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়

* উদ্ভিদ যে চেতন পদার্থ মধ্যে পরিগণিত তাহা সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া উচিত। পরীক্ষা করিতে হইলে মৃত্তিকা পরীক্ষণীয়। স্থানীয় কোন উদ্ভিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যথা নিয়মে পরীক্ষা করিলে মৃত্তিকার স্বভাব বহু পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়, কারণ উদ্ভিদ শরীরে যাহা কিছু থাকে, তাহার অধিকাংশই মৃত্তিকাজনিত, অবশিষ্ট বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত অথবা এতদুভয়বিধ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উদ্ভিদগণ নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে মৃত্তিকা হইতে আহার্য্য পদার্থ আহরণ করিয়া থাকে। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর প্রয়োজন হয় সেইরূপ পরিমাণ বিষয়েও কোন কোন উদ্ভিদ এক পদার্থ অধিক, কোন উদ্ভিদ অল্প আহরণ করে। এই কারণে উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া মৃত্তিকার গঠন, উপাদান বা প্রকৃতি বিষয়ে সম্যক সিদ্ধান্ত কিছু করিতে পারা যায় না।

সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যের জন্য ভূগর্ভ হইতে দুই হাত মাটি খনন করিয়া দেখিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিম্নগামী দীর্ঘমূল বৃক্ষাদির জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক গভীর করিয়া খনন না করিলে চলে না। অনেক জমির উপরিভাগের মাটি ভাল হইতে পারে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী স্তরের মাটি অকর্ম্মণ্য হওয়া অসম্ভব নহে। ঈদৃশ জমিকে 'চোষা জমি' কহে। এই জন্য মৃত্তিকা বিশেষের উপযোগী ফসল নির্ব্বাচন কিম্বা ফসলের উপযোগী জমি নির্ব্বাচন করা উচিত। এই সূত্রটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা কার্য্যকালে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়,—অবশেষে উৎসাহ ভঙ্গ হয়। বালুকা-প্রধান মাটিতে পটোলের আবাদ করিতে হয়, কিন্তু তাহাকে এঁটেল মাটিতে পুতিলে কিছুতেই হইবে না। ইক্ষুকে পটোলের ক্ষেতে রোপণ করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এইজন্য নিজের আয়ত্বাধীন

জমির প্রকৃতি অনুসারে ফসল নির্ব্বাচন করা কিম্বা সঙ্কল্পিত ফসলের উপযোগী জমি গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রয়োজনানুসারে জমিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করিয়া লওয়া বড় ব্যয়সম্ভব ব্যাপার, সুতরাং স্থান নির্ব্বাচন বা ফসল নির্ব্বাচন সুবিধাজনক, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে, কোন মৃত্তিকার কিরূপ প্রকৃতি, কোন মৃত্তিকা কি কি উপাদানে সংগঠিত ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

-:*:-

মৃত্তিকার জাতিভেদ

মৃত্তিকা মধ্যে প্রধানতঃ চারিটী স্থূল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত চারিটী পদার্থের নাম (১) কর্দ্দম (clay), (২) বালুকা (sand) (৩) চূণ (Lime), ও (৪) দাহ্য পদার্থ .(humus) or organic ingedient)। উক্ত চারি পদার্থের সম্মিলনজনিত স্থূল পদার্থকে মৃত্তিকা কহে। উক্ত পদার্থ চতুষ্টয় যে সমভাগে মৃত্তিকায় অবস্থিত তাহা নহে। কোন পদার্থ অধিক, আবার কোন পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে। পদার্থ নিচয়ের পরিমানুসারে মৃক্তিকার জাতিভেদ ও নামকরণ হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় কর্দ্দমের ভাগ অধিক তাহা কর্দ্দম জাতিব, যাহাতে বালুকার ভাগ অধিক তাহা বালুকা জাতীয়, যাহার মধ্যে চূণের ভাগ অধিক তাহা চূণ-প্রধান এবং যাহাতে দাহ্য পদার্থের অংশ অধিক তাহা দাহ্য সঙ্কুল বা হালকা নামে অভিহিত মাটি

আছে,—পটাস (Potash) ও ফস্ফরিক য়্যাসিড (Phosphoric Acid)। উক্ত দুইটী পদার্থ উর্ব্বরতা গুণের মূল, কিন্তু মৃত্তিকামধ্যে উহাদিগের পরিমাণ অল্প এজন্য উহাদিগের অল্পতা বা আধিক্য হেতু মৃত্তিকার জাতিভেদ বা নামান্তর হয় না। এক্ষণে উক্ত পদার্থ কয়টীকে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিব।

ধাতু চূর্ণ

প্রথমেই কর্দ্দমের নামোল্লেখ করা গিয়াছে। মাটির সহিত জল মিশ্রিত হইয়া কাদা উৎপন্ন হয়। ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই প্রায় তাহা দেখিতে পাই। বিশুদ্ধ ভাষায় তাহাকে কর্দ্দম বলা যায়, কিন্তু এ স্থলে কর্দ্দমের সে অর্থ নহে। কর্দ্দম—মৃত্তিকার একটী প্রধান উপাদান এবং তাহা ধাতব সূক্ষ্ম পদার্থ। সিক্তাবস্থায় তাহা এত ঘনীভূত থাকে যে, তদন্তর্গত পরমাণু রাশিকে পৃথক করিতে পারা যায় না। সিক্ত কর্দ্দম অতিশয় কোমল ও পিচ্ছল। পরমাণু সমূহের সূক্ষ্মতা, আণবিক আকর্ষণ (molecular attration) ও আঁটালতা হেতু পরমাণু সমূহ পরস্পরে অতি ঘনভাবে সংলগ্ন থাকে, তন্নিবন্ধন অধিক রস ধারণে সক্ষম, কিন্তু ঘন সংলগ্নতাবশতঃ তাহাতে জল শোষিত হইতে কাল বিলম্ব হয়। আঁটাল মাটিতে জল শোষিত হইতে একদিকে যেমন বিলম্ব হয়, অন্যদিকে জল শুকাইতেও বিলম্ব হয়। ঈদৃশ মৃত্তিকায় কুম্ভকারগণ নানাবিধ সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। হাঁড়ি, কলসী, সরা, খুরী, ভাঁড়, নানাবিধ পুতুল খেলনা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া কুম্ভকার আমাদিগের নানা অভাব মোচন করিতেছে।—আমরা যে হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি দেখিতে পাই বা ব্যবহার করি, তাহা নানা বর্ণের হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে—পূর্ব্বে বলিয়াছি—মাটি নানাবর্ণের হইয়া থাকে। শৈলাঙ্গ স্খলিত পদার্থ মৃত্তিকার ভিত্তি

সুতরাং যে বর্ণের পাহাড় হইতে চূর্ণ স্খলিত হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হয়, কর্দ্দম সেই বর্ণেরই হইয়া থাকে। কৃষ্ণ পর্ব্বতস্খলিত পরমাণু সমূহ কৃষ্ণ বর্ণেরই হয়। এইরূপ লাল বা পাটকিলে বর্ণ বিশিষ্ট পরমাণু তদনুরূপই হয়। সচরাচর লাল বা পাটকিলে বর্ণেই তৈজস পত্র দেখা যায়। কর্দ্দম বা এঁটেল মৃত্তিকায় কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। উহার ঘনতা ও দৃঢ়তা এত অধিক যে, উদ্ভিদের মূল তাহা ভেদ করিতে পারে না। যত রসের অভাব হইতে থাকে, তত উহা দৃঢ় হয় ও চাপ বাঁধিতে থাকে; শুষ্ক হইলে ফাটিয়া যায় ও সমধিক কঠিন হয়। কোন এলো বা ঝুরা মাটিকে সম্বদ্ধ করিতে হইলে কিম্বা অবয়ব প্রদান করিতে হইলে তাহার সহিত অল্পাধিক কর্দ্দম মিশ্রিত করিলে সে ফল পাওয়া যায়। অর্দ্ধবিদগ্ধ কর্দ্দম চূর্ণ করতঃ ক্ষেত্রে প্রসরিত করিয়া দিলে ভূমির উর্ব্বরতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইষ্টক পুড়াইবার নিমিত্ত যে প্রকারে পাঁজা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কর্দ্দমকে স্তরে স্তরে সেইরূপে সাজাইয়া পোড়াইতে হয়। অতঃপর সেই বিদগ্ধ পদার্থকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে হয়। বিদগ্ধ হইলে মৃত্তিকার শোষকতা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে দগ্ধ-মাটী বৃষ্টির জল হইতে সমূহ পরিমাণে য়্যামোনিয়া (Ammonia) নামক বাষ্পীয় পদার্থ শোষণ করিতে পারে এবং ভাবী উদ্ভিদগণের ব্যাবহারের জন্য ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

বালুকা

বালুকা—প্রস্তরজাত চূর্ণ পদার্থ। কর্দ্দমের দানা অপেক্ষা ইহার দানা স্থূল ও ভারী। বালুকার যোজনা শক্তি নাই সকল দানাই পৃথক,—কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। বালুকাময় ভূমি উত্তাপ প্রতিক্ষেপক। বালুকা কণা সমূহের উত্তাপ-শোষণ-শক্তি না থাকায়

উত্তাপ আহরণ করিতে পারে না। এই জন্য রৌদ্রের সময় বালুকা এত শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বালুকার রস-শোষকতা আছে, কিন্তু ধারকতা (Power of retention) নাই। বালুকা স্তূপে জল পতিত হইবামাত্রেই শোষিত হইয়া যায়, কিন্তু সে জল পরমাণু পরস্পরের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ বাহিয়া নিম্নভাগে চলিয়া যায়, পরমাণু সমূহ সে জল আদৌ ধারণ করিতে পারে না।—এই হেতু বালুকা ভূমি নীরস। পরমাণু সমূহ যত স্থূল হয়, জল তত শীঘ্র ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়। চটচটে ও আঁটাল মাটীকে হালকা করিবার জন্য মৃত্তিকা মধ্যে বালুকার অবস্থিতি। আঁটাল মাটিতে জল, রৌদ্র বা বায়ু সহজে ও শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না। মুসলধারায় বৃষ্টি হইলে আঁটাল মাটির মধ্যে অধিক জল প্রবিষ্ট হয় না, কিন্তু বালুকা ভূমির দানা স্থূল বলিয়া তাহার ছিদ্রপথ [capillary tubes] স্থূল হয়। এইজন্য জল পড়িবামাত্রই ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিবার অবাধ পথ পায়, কিন্তু দানা সমূহের ধারকতা অভাবে মাটি অধিকক্ষণ সিক্ত থাকিতে পারে না। সকল মৃত্তিকারই—উপকরণের তারতম্যতা হেতু—ধারকতার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। মৃত্তিকার ধারকতা পরীক্ষা করিতে হইলে, কোন স্থানে অল্পাধিক মৃত্তিকার স্তূপ করতঃ তাহার মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত করিয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিতে হয়। এইরূপে জল ঢালিতে ঢালিতে ক্ষণ কাল পরে দেখা যাইবে যে, স্তূপের সর্ব্ব নিম্নভাগ দিয়া জল বাহির হইতেছে। যতক্ষণ শোষণ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ তাহা হইতে জল চুয়াইয়া বাহির হয় না। অতঃপর জলের অতিরিক্তাংশ তলদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মৃত্তিকায় জল ঢালিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ মৃত্তিকার জল ধারণ করিবার শক্তি কত? ইহা হইতে মৃত্তিকার শোষণ শক্তি

কিরূপ—তাহাও বুঝিতে পারা যায়। যে মাটি, শীঘ্র শোষণ করিতে পারে, তাহার দানা ও ছিদ্রপথ—স্থূল, আবার যে মাটিতে জল শোষিত হইতে বহু বিলম্ব হয়, তাহার কণা সূক্ষ্ম, ছিদ্রপথও সূক্ষ্ম—ইহাই বুঝিতে হইবে। বালুকা কণার শোষণ শক্তি নাই, কিন্তু বালুকা স্তূপের শোষণ শক্তি আছে, কিন্তু এই যে শক্তি, তাহা কেবল জলকে একদিক দিয়া লইয়া অপর দিক দিয়া বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতপক্ষে উহা শক্তি নহে।

মৃত্তিকার ভিত্তি

বাস্তবিক যাহা মৃত্তিকা নামে অবিহিত, তাহা যে জাতির হউক তাহাতে কর্দ্দম ও বালুকার অংশ অল্প বা অধিক পরিমাণে থাকিবে, কারণ উক্ত দুইটি সামগ্রীই মৃত্তিকার প্রধান উপাদান ও ভিত্তি। এক্ষণে উহাতে নানাবিধ পদার্থ সংযোজিত হইলে উর্ব্বরতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেলে-জমি বলিলে তাবৎ বেলে-জমি যে এক প্রকারের হইবে, তাহা নহে। বালুকা পরামাণুর স্থূলতা বা সূক্ষ্মতানুসারে বেলে-জমি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। বালুকা পরমাণুকে আকার ভেদে স্থূল, মাঝারি ও সূক্ষ্ম—তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে তিন প্রকারের বেলে-জমি আমরা দেখিতে পাই। অতএব তিন প্রকার বেলে জমির গুণও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। স্থূল দানাজনিত বেলে-মাটিতে কূপ বা ছিদ্র [Pores] সংখ্যা অল্প, এজন্য অধিক পরিমাণে রস শোষণ করিতে পারে না, কিন্তু ছিদ্র ও ছিদ্রপথ সমূহ স্থূল বলিয়া শীঘ্র শোষণ করিতে সক্ষম। তাহাতে জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ শোষিত হইয়া নিম্নদেশে চলিয়া যায় এবং যে সামান্য জল পরমাণুতে লাগিয়া থাকে তাহাও বায়ু ও রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। এত শীঘ্র শুষ্ক হইবার কারণও সেই কূপের ও ছিদ্রপথের স্থূলতা। হুগলী জেলায় মগরায় যে

ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের মোটাদানা-বালুকা পাওয়া যায়, তাহা এই শ্রেণীর বালি। উহা 'মগরার বালি' নামে অভিহিত এবং প্রতিদিন নৌকা বোঝাই হইয়া কলিকাতা চালান হইয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে এই বালি দ্বারা ঘর বাড়ী পলস্তরা (plaster) করা হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বালি। অতঃপর—

সূক্ষ্ম-পরমাণুজনিত বেলে-জমি দানার সূক্ষ্মতাবশতঃ অধিক জল শোষণ করিতে পারে, কিন্তু শোষণ করিতে অপেক্ষাকৃত কালবিলম্ব হয়। পরমাণুর সূক্ষ্মতা হেতু কুপ ও ছিদ্রপথের সংখ্যা অধিক হয়, তন্নিবন্ধন অধিক রস শোষিত হইবার পথ থাকে, কিন্তু তৎসমুদায় সূক্ষ্ম বলিয়া জল অল্পে অল্পে ভূগর্ভমধ্যে নামিতে থাকে। শোষণে বিলম্ব হইবার ইহাই কারণ। বেলে মাটির মধ্যে ইহা অনেক ফসলের আবাদোপযোগী। ঈদৃশ জমিতে অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ রস থাকে। ইহাতে ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, খেঁড়ো, পটোল, বজরা, ভুট্টা প্রভৃতির আবাদ হইতে পারে।

মাঝারি বেলে-মাটির দানা মাঝারি আকারের হয়, সুতরাং তাহার শোষিকতা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। নদী সৈকতে ও চরে এই প্রকারের জমি প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ হইলে আবাদের উপযোগী হয়। কেবল বালুতে কোন গাছ বাঁচিতে পারে না, তবে গাছ জন্মিয়া শিকড় নিম্নস্তরে পৌছিলে, তখন আর আশঙ্কা থাকে না।

চূণ

মৃত্তিকার তৃতীয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান—চূণ। সচরাচর সকল মৃত্তিকা মধ্যেই প্রায় চূণ থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সামান্য হইলেও মৃত্তিকা মধ্যে তাহার কার্য্যকারিতা বিশ্লেষণ না করিলে উপলব্ধি হয় না। ভূগর্ভমধ্যে নানাবিধ পদার্থের যেরূপ স্তর থাকে, চূণ-সঙ্কুল পদার্থেরও

সেইরূপ থাকে; চূণপ্রধান মাটি দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যে জমিতে চূণের অভাব বা অল্পতা অনুভূত হয়, কিম্বা যাহার উর্ব্বরতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে চূণ সংযোজিত হইলে মৃত্তিকার দোষ কাটিয়া যায়, মৃত্তিকামধ্যে ক্রমে আবার উর্ব্বরতার আবির্ভাব হয়।

উদ্ভিজ্জ

উল্লিখিত তিনটী বিশেষ উপাদান সত্ত্বেও উদ্ভিজ্জ বা জৈব পদার্থ না থাকিলে কোন মৃত্তিকাকে পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। ইহারই সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যত গাছপালা ও জীব জন্মগ্রহণ করে তৎসমুদায়ই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অবশেষে মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হয়। মৃত্তিকামধ্যে এইরূপে দাহ্য পদার্থের সমাবেশ হইয়া থাকে। উক্ত পদার্থ যাবৎ না অগ্নি সংযোগে ভস্মে পরিণত হয়, তাবৎ উহা ঘন (solid বা inorganic) ও লঘু পদার্থ (organic) সমন্বিত থাকে। উক্ত পদার্থ দাহ্য নামে অভিহিত হইলেও উহার অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ দাহ্য নহে। তাবৎ পদার্থ দাহ্য হইলে তাহার অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, পত্র হইতে জীব শরীরের সকল অংশই দগ্ধীভূত হইলে তাহার কিয়দংশ ভস্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। উক্ত ভস্মাবশিষ্ট পদার্থও ঘন পদার্থের সামিল। এজন্য তাহাকে জৈব বা দাহ্য পদার্থ (inorganic) না বলিয়া যুক্ত পদার্থ (combined matter) বলিলে ক্ষতি হয় না। যাহা হউক, জীব ও উদ্ভিদ মরিয়া মৃত্তিকার অঙ্গ পুষ্ট করে—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উদ্ভিদ বা জীবদেহকে বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে নানাবিধ লক্ষণ, ক্ষার, সোডা, পটাস, চূণ, ম্যাগ্নেসিয়া, লৌহ, বালুকা, য়্যালুমিনা, ফস্ফরিক-এসিড, কার্ব্বনিক-য়্যাসিড, সল্‌ফিউরিক-

য়্যাসিড প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যবক্ষারজান নামক বাষ্পীয় পদার্থ পাওয়া গিয়া থাকে। সকল জৈব পদার্থ মধ্যে যে উল্লিখিত পদার্থ নিচয়ের সমাবেশ থাকে কিম্বা সম পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহা নহে। যে উদ্ভিদ বা যে প্রাণী যে যে জিনিস, এবং যে জিনিসের যে পরিমাণ আহরণ করে উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহে সেই সেই দ্রব্য সেই অনুপাত মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্লিখিত কতকগুলি পদার্থ স্বভাবতঃ মৃত্তিকা মধ্যে বর্ত্তমান, আবার কোন কোন পদার্থ বায়ুমণ্ডল হইলে আহরিত হইয়া শরীরমধ্যে প্রবেশলাভ করতঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকান্তর্গত যবক্ষারজান (Nitrogen) বায়ুমণ্ডলেরই সামগ্রী। মাটির মধ্যে যে এক জাতীয় জীবাণু (Bacteria) থাকে, তাহারাই বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া মৃত্তিকায় সঞ্চিত করে। অতঃপর কর্ষিত ভূমির মধ্যে বায়ু সংযোগেও নাইট্রোজেন প্রবেশ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টির সময় বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন নাইটিক-য়্যাসিড ও য়্যামোনিয়া রূপে ভূমিতে আসিয়া স্থান পায়। অনেকে উদ্ভিজ্জ পদার্থকে হিউমস্ (humus) নামে অভিহিত করেন। প্রকৃত পক্ষে উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Vegetable mould) ও হিউমস্—দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। যেখানে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সেইখানে হিউমস্,—ইহা ঠিক, কিন্তু যেখানে হিউমস সেইখানেই উদ্ভিজ্জ পদার্থ—এরূপ বলা যাইতে পারে না। অম্লজান (Oxygen) জলজান (Hydrogen) ও নাইট্রোজেন (Nitrogen)—এই তিনটি বাষ্পীয় পদার্থের সমাবেশ ফলে 'হিউমস্' নামক পদার্থের উৎপত্তি। উক্ত তিনটি পদার্থ বায়ুমণ্ডলের জিনিস। ভূমি যত উর্ব্বরা হয় তাহাতে তত অধিক হিউমস্ সঞ্চিত হয়। ভূমির উর্ব্বরতা ফলে ক্ষেত্রস্থ ফসল বা বৃক্ষগণ বৃদ্ধিশীল ও তেজাল হয়—বহু শাখা ও পত্র সম্বলিত হয়, সুতরাং ফসল মধ্যে বহু পরিমাণে

হিউমস সঞ্চিত হয়। সেই হিউমস্ পূর্ণ পত্রাদি মৃত্তিকায় স্থান পাইলে স্বতঃই তাহা সারবান হইয়া থাকে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, উদ্ভিদগণ হিউমসের আধার। স্নতরাং আধারের ব্যাপ্তি যত অধিক হইবে ততই তাহতে অধিক হিউমসের সঙ্কুলান হইবে। এই জন্য উদ্ভিদ যাহাতে ঝাড়াল ও পরিপুষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত এবং তাহা হইলেই ভূমিতে হিউমসের সঞ্চার হইবে, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যাহা হউক, উদ্ভিজ্জ পদার্থ না থাকিলে মৃত্তিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, মৃত্তিকার স্থিতি-স্থাপকতা লোপ পায়, ছিদ্রপথ অবরূদ্ধ হয় এবং মৃত্তিকার শোষণ ও ধারণ শক্তির অভাব হয়। ক্ষেত্রে যতই উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তত তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় এবং উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষেত্রজাত বন, জঙ্গল বা কসলের অবশিষ্টাংশ—পত্র, ফুল প্রভৃতি কিছু নষ্ট না করিয়া ভূমিতে সংযুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

উপাদানের ইতর বিশেষ

যে চারিটি প্রধান প্রধান স্থুল পদার্থের সমাবেশে মৃত্তিকার উৎপত্তি তাহা পূর্ব্বোধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তাহা-দিগের প্রত্যেকের পরিমাণানুসারে মৃত্তিকার গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, ঘুটিং, খড়ি, মার্ল (Marl) মর্ম্মর জিপ্‌সম

(Gypsum) প্রভৃতি চূণময় প্রস্তর। উহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিলে চূণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শম্বুক পোড়াইলেও চূণ উৎপন্ন হয়। যাবতীয় জীব শরীর মধ্যস্থিত অস্থি এবং মৎস্যের কাঁটা দগ্ধ করিলে অল্পাধিক পরিমানে চূণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদ মধ্যেও চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়।

কর্দ্দম বা এঁটেল মাটি ও বালুকা মধ্যে গুণাগুণ বিষয়ে পরস্পরের যে বৈষম্য আছে, তাহাকে সামঞ্জস্য করিবার জন্য মৃত্তিকা মধ্যে চূণ থাকা প্রয়োজন। চূণ নিজ শক্তিমত রস শোষণ ও ধারণ করিতে সক্ষম এবং উল্লিখিত দুইটী ঘন বা নীরেট (Solid) পদার্থকে একেবারে জমাট বাঁধিতে না দিয়া পরস্পরকে পৃথক রাখিয়া স্বীয় শক্তি সংযোগে কার্য্য করাইয়া লয় এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের স্থূলতা হ্রাস করিয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রেরণ করিয়া থাকে। ঈদৃশ ক্রিয়াশীলতা নিবন্ধন চূণ আপন কলেবরও ক্ষয় করিয়া উহাদিগের সহিত ঘনিষ্টরূপে মিশিয়া যায়। চূণের এই সকল গুণ আছে বলিয়া ঘন ও আটাল মাটিতে বিবেচনা মত চূণ মিশাইয়া দিলে উক্ত মৃত্তিকার স্বাভাবিক ঘনতা বিদূরিত হয়, মৃত্তিকা লঘু হয়, ফলতঃ তাহাতে জল বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশের দ্বার মুক্ত হয়। জমিতে নিরন্তর কত জিনিষ সংযোজিত হইতেছে, কত উদ্ভিজ্জ পদার্থ, কত মৃত জীব দেহ ও উচ্ছিষ্ট মিলিত হইতেছে! এতন্নিবন্ধন মৃত্তিকায় নানা জাতীয় অম্ল প্রতিদিন সন্নিবিষ্ট হইতেছে। উক্ত অম্লজ পদার্থের বিনাশ সাধন করিবার জন্য কিম্বা তাহাকে সংস্কৃত করিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য মৃত্তিকা মধ্যে চূণ থাকে বিশেষ প্রয়োজন। চূণহীন জমি প্রায় অম্লময় হয় এবং অম্লাধিক্য হেতু তাহাতে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। আঁটাল-মাটি, বেলে-মাটি, দো-আঁশ বা কাঁস-মাটি,

দুধে-আটল প্রভৃতি যত প্রকার মাটি আছে চারিটী পদার্থের সংযোগে তৎসমুদায় উৎপন্ন তাহাদিগের প্রত্যেকের যথাযথ পরিমাণের সম্মিলন। ফলে মৃর্ত্তিকার জাতিগত নামকরণ হইয়া থাকে। কোন মৃত্তিকায় কর্দ্দমের, কোন মৃত্তিকার বালুকার, কোন মৃত্তিকার চূণের, আবার কোন মৃত্তিকার জৈব পদার্থের ভাগ অল্প বা অধিক থাকে। যে মাটিতে যে পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তদানুসারেই তাহাকে অভিহিত করিতে হয়। কর্দ্দম-প্রধান মাটির আঁটালতা অধিক, এজন্য উহা আঁটাল-মাটি; বালুকা প্রধান মাটির নাম বেলে-মাটি; এই উপাদান বিশেষের আধিক্য দেখিয়াই মৃত্তিকা বিশেষকে বিশেষ নামে অভিধান করিতে হয়।

উপাদানের সামঞ্জস্যতা

প্রধান উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকার কোন একটীর অভাব বা অল্পতা পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, অপর একটী, দুইটী বা তিনটীর পরিমাণ অধিক আছে। এই অবিচ্ছিন্ন ফল রাশিকে ইংরাজিতে Law of Minimum কহে। ইহা গণিত শাস্ত্রানুমোদিত সুতরাং ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। স্মাবশ্যকীয় যে কয়টী উপাদানের পরিমাণ যথাযথ থাকা আবশ্যক কিন্তু তাহা না থাকিলে, সমষ্টির পূর্ণতা হেতু অবশিষ্ট কয়েকের আধিক্য নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকল জমিতেই এক বা একাধিক পদার্থের যেরূপ আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ ন্যুনতা থাকাও অবশ্যম্ভাবী। এই ন্যুনত্বেই তাবৎ ফসল নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হইলে তাহার পুষ্টি ও পালনের জন্য মাটিতে যে পদার্থ থাকা আবশ্যক তাহা না থাকিলে সেই সেই পদার্থকে স্থানান্তর হইতে আনিয়া মৃত্তিকার সেই অভাব পূরণ করিতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ রাসায়নিক লাইবিস্

Baron von Liebig সাহেব উক্ত ন্যূনাধিক্যের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

উপাদান-ভেদে মৃত্তিকার গুণবত্তার ও ক্রিয়াশীলতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ-শরীরে তাহার ফল পরিলক্ষিত হয়। উপাদানের বিভিন্নতা হেতু কোন জমি নীরস ও উত্তাপ-বিক্ষেপক; কোন জমি সরস ও উত্তাপশোষক হইয়া থাকে ; আবার কোন জমি সামান্য রসের অভাবে একবারে শুষ্ক ও হীনশক্তি হইয়া পড়ে। অনন্তর, কোন জমি, বারোমাসই যথা পরিমাণ রসধারণক্ষম বলিয়া বৎসরের পর বৎসর সুন্দর ফসল প্রদান করে। অনেক জমি সামান্য বারিপাত হইলেই এমন পিচ্ছিল ও আটালবৎ হইয়া যায় যে, তাহা কিছু দিনের জন্য অর্থাৎ যাবৎ উত্তমরূপে না শুষ্ক হয়,—একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কোন কোন জমি বৃষ্টির পরেও অধিক দিন সিক্ত থাকে এবং সেই রস শুকাইবার পূর্ব্বেই হয়ত আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এরূপ হইলে ফসলের বপন ও রোপণাদি কার্য্যের অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। অনেকের ভাগ্যে এরূপ অনেক সময় ঘটে যে, ক্ষেতের জল শুষ্ক হইবার জন্য পাঁচ সাত দশদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। চাষ আবাদ কার্য্যে এই কয়দিন সময় নষ্ট হওয়া বড় কম কথা নহে !

আলোচিত পদার্থ চতুষ্টয়ের পরিমাণানুসারে ফ্বলার সাহেবের মতে

মৃত্তিকা নির্দ্দেশ

মৃত্তিকার প্রধানতঃ আটটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীকেই তিনি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনন্তর প্রত্যেক বিভাগকে তিন উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া এ পর্য্যন্ত মোটের উপর অষ্টচত্বারিংশ প্রকারের মৃত্তিকা নির্ণয় করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ কৃষিতত্ত্ববিৎ ফ্বলার

৩

সাহেবের শ্রেণী বিভাগানুসারে তাহার প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ আটটী প্রধান শ্রেণীর নাম দেখা যায়ঃ—(১) অাঁটাল-মাটি, (২) দোয়াঁশ, (৩) বেলে-দোয়াঁশ, (৪)এঁশো বালি, (৫) বেলে-মাটি, (৬) চুণ-মধ্যম, (৭) কষামাটি ; (৮) বোদমাটি বা হিমউস্। বলা বাহুল্য যে, পদার্থ বিশেষের আধিক্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া মৃত্তিকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে।

(১) যে মাটি আঁটাল ও চট্‌চটে তাহাকে আঁটাল মাটি কহে। ঈদৃশ মাটিতে য়্যালুমিনা (alumina) নামক শ্বেত ধাতুর চূর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অাঁটিল মৃত্তিকায় ৫০ ভাগের অধিক উক্ত পদার্থ থাকে। চুণের পরিমাণ ভেদে উক্ত মৃত্তিকা দুই প্রকারের হইয়া থাকে। শতভাগ মৃত্তিকা মধ্যে সাধারণতঃ ১ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত চুণ থাকে। ভাগের ইতরবিশেষে উহা উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন জাতিতে বিভক্ত। যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ চুণ থাকে, তাহা উত্তম, যাহাতে ২॥০ হইতে ৫ ভাগ থাকে তাহা মধ্যম, এবং যাহতে ২॥০ হইতে অৰ্দ্ধ ভাগ চুণ থাকে তাহা অধম প্রকারের অাঁটাল মাটি। আবার যে অাঁটেল মাটি একেবারেই চুণবিহীন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অাঁটাল মাটি, এবং তাহাও প্রথম বিভাগের চুণবিশিষ্ট অাঁটাল মাটির ন্যায় উত্তম, মধ্যম ও অধম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন তিন উপবিভাগে বিভক্ত। ফলতঃ ইহা এঁটেল মাটির শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাহাতে ৫০ ভাগের অধিক চিক্কণ মাটি অবস্থিত। ইহাতে শূন্য হইতে অৰ্দ্ধভাগ অর্থাৎ একশত ভাগের এক ভাগের অৰ্দ্ধভাগ মাত্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে, অবশিষ্ট অংশ বালুকা।

যে মাটিকে আমরা সহজ ভাষায় গঙ্গা-মৃত্তিকা বলিয়া থাকি, তাহাই প্রকৃত এঁটেল (clay) মাটি। কুম্ভকারগণ এই মৃত্তিকার দ্বারা হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি নানাবিধ মৃৎপাত্র এবং খেলনা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। এঁটেল

মাটিতে প্রায় পটাস্, সোডা, চূণ, লৌহমল, প্রভৃতি সম্মিলিত থাকে, এইজন্য ইহা বিশেষ সারবান মৃত্তিকা। শুষ্ক এঁটেল মাটিতে জল লাগিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, তাহাকে সোঁদা কহে। অনেক স্ত্রীলোক উক্ত সোঁদা গন্ধের জন্য পাতখোলা বা আধ পোড়া ইষ্টক চর্ব্বন করেন।

২। দোয়াঁশ মাটি (loamy soil)।—সাধারণতঃ ইহাকে বাগান জমি কহে। সাধারণ ঔদ্যানিক কার্য্য ও চাষ আবাদের পক্ষে দোয়াশ-মাটি বিশেষ উপযোগী। ইহাতে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দ্দম বা চিক্কণ-মাটি, ৫ ভাগ চূণ, ৫ ভাগ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং অবশিষ্টাংশ বালুকা থাকে। অতঃপর, চূণের অংশের ইতরবিশেষে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—১ম, চূণপ্রধান দোঁয়াশ; ২য়,—চূণবিহীন দোঁয়াশ। অনন্তর উপাদান ভেদেও এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটীরই উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনটী বিভাগ আছে।

(৩) বেলে-দোঁয়াশ (sandy loam)—এরূপ মাটিতে সচরাচর বালুকা থাকে, তদপেক্ষা অধিক বালুকা যে দোঁয়াশ মাটিতে দেখা যায়, তাহাই বেলে-দোঁয়াশ নামে অভিহিত। দোঁয়াশ মাটি অপেক্ষা ইহার রস-ধারণ-শক্তি কম, এবং ইহা অপেক্ষাকৃত উত্তাপ বিক্ষেপক। ইহাতে উদ্ভিজ্জ-সার সংযোগ করিলে মৃত্তিকার রস-শোষণ ও ধারণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহাতে ২০ হইতে ৩০ ভাগ মাত্র চিক্কণ-মাটি থাকে। ইহার মধ্যে যাহাতে চূণ আছে তাহা চূণ-যুক্ত, এবং যাহাতে চূণ নাই তাহা চূণবিহীন বেলে-দোঁয়াশ নামে আখ্যাত। এতদুভয়ই আবার উহার পরিমাণের তারতম্যে তিন উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

(৪) এঁশো-বালি বা ফাঁস-মাটি (loamy sand)।—বেলে-মাটির সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ, কারণ ইহাতে বালুকারই প্রাধান্য

অধিক। দোঁয়াশ মাটির অল্লাধিক উপাদান ইহার সহিত সংযুক্ত থাকায় ইহা বালুকা-ভূমি অপেক্ষা ঈষৎ ভাল। ঈষৎ পুরাতন বালুকা-চর বা নদী-সৈকত ভূমি সমূহ প্রায় এই জাতীয়। বেলে জমিতে ক্রমশঃ তৃণ ও আগাছা জন্মিয়া উহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ করিয়া দেয়, তখনই উহা ফাঁস-মাটি নামের যোগ্য হয়। ফাঁস-মাটি অতিশয় নীরস কিন্তু জলের সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া ঈষৎ সরস থাকে এবং তাহাও বর্ষাকালে ও বর্ষার পর দুই একমাস পর্য্যন্ত। ইহাতে ১০ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত চিক্কণ মাটি থাকে।

(৫) বেলে বা বালি-মাটি (sandy soil)।—ইহার অধিকাংশই প্রায় বালুকা। ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ ত থাকেই না, তবে চিক্কণ মাটি দশভাগ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঈদৃশ জমিতে কোন প্রকারেই চাষ-আবাদ চলে না। বেলে-জমির পৃষ্ঠদেশ রৌদ্রের সময় এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, সেদিকে কেহ চাহিতে পারে না, তাহার উত্তপ্ত বাতাসে যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতে থাকে এবং তৎসন্নিকটে লোকজন বাস করিতে পারে না। বহুকাল পতিত থাকিলে ক্রমশঃ তাহা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে।

(৬) চূণ-মাঝারি (marly)।—ইহাতে ৫ হইতে ২০ ভাগ চূণ থাকে। সার সংযোজিত করিয়া ইহাকে কার্য্যোপযোগী করিতে পারা যায়। যাহাতে ইহা আঁটাল, দোঁয়াশ, বা বেলে-দোঁয়াশ মাটির অন্তর্গত হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তদন্তর্গত চূণের শক্তিকে হ্রাস করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহাতে বহু পরিমাণে উদ্ভিজ্জ-সার নিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়োজিত হইলে চূণের পরিমাণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার প্রাধান্য বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহা (Law of minimum) নামে অভিহিত।

(৭) কষা-মাটি (Calcareous soil)—কষামাটী অতিশয় চূণসঙ্কুল,

এমন কি তাহাতে ২০ ভাগেরও অধিক চূণ থাকে। সংস্কার করিয়া লইলে উহা আঁটল, দোঁয়াশ প্রভৃতির অন্তর্গত করিতে পারা যায়, কিন্তু যে মাটিতে ৯০ হইতে ৯৮ ভাগই চূণ, তাহাকে আসল চূণ বলিলে ক্ষতি হয় না। আমরা যে চূণ ব্যবহার করি বা দেখি, মৃত্তিকায় তাহা সে অবস্থায় থাকে না। চূণসঙ্কুল প্রস্তরময় পাহাড়ের সন্নিহিত স্থানে ঈদৃশ জমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত প্রস্তর সমূহের চূর্ণ ও খণ্ড বা ঘুটীং যে ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে আসিয়া সঞ্চিত হয়, সেই ক্ষেত্রই চূণময় হয়। উল্লিখিত চূর্ণ ও খণ্ডকে সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করিলে চূণ উৎপন্ন হয়।

(৮) উদ্ভিজ-মৃত্তিকা (humus soil)—ইহার মধ্যে সাধারণ মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে। সচরাচর মৃত্তিকা মধ্যে এক বা দেড় ভাগ ত্রৈবাষ্পিক পদার্থ থাকিতে দেখা যায় কিন্তু উদ্ভিজ্জ-মৃত্তিকায় পাঁচ ভাগেরও অধিক থাকে। উদ্ভিজ্জ-পদার্থ ও হিউমস্ যে দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। হিউমস্—তিনটী বাষ্পীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইলেও উদ্ভিদের সহিত সংস্পর্শিত হইয়া তদন্তর্গত স্থূল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। এই জন্য উহার কতকাংশ দ্রবনীয়, কতকাংশ অদ্রবনীয়। উক্ত দ্রবনীয় অংশ—উদ্ভিদের মুলসমুহ স্বভাবতঃ আহরণ করিয়া থাকে। হিউমসের দ্রবনীয় অংশের নাম উদ্ভিজ্জাম্ল (humic acid) এবং অদ্রবনীয় অংশের নাম অঙ্গার বা হিউমিন্ (humin)। অঙ্গারজান বা কার্ব্বনই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। মৃত্তিকায় উক্ত পদার্থের অভাব থাকিলে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। এইজন্য হিউমস্ হইতে মৃত্তিকায় কার্ব্বন সংস্থিত হয়, উপরন্তু উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতেও উহা আহরণ করে।

উল্লিখিত আট প্রকারের মৃত্তিকা ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে

আরও কয়েক প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী বিশেষ :—

৯। বোদমাটি (vegetable mould)।—অনেকের নিকট ইহা 'পাণ্ডব-পোড়া মাটি' নামে পরিচিত কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পর পাণ্ডবদিগের মৃতদেহ ভূমিতে পতিত থাকিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকা 'পাণ্ডব-পোড়া-মাটি'। যাহা হউক—

বোদমাটি সম্পূর্ণ মৃত্তিকা নহে। উহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ অত্যন্ত অধিক। উক্ত মাটি শুষ্কাবস্থায় অগ্নিসংযোগে প্রজ্জলিত হয় এবং লঘুতা বশতঃ জলে ভাসিতে থাকে। ইহার বর্ণ সিক্তাবস্থায় মশিবৎ এবং শুষ্কাবস্থায় পোড়া মাটির ন্যায় খস্‌খসে ও ফাটা। মৌলিক বা আসল অবস্থায় উহাতে তৃণটী পর্য্যন্ত জন্মে না। কিন্তু অপরাপর মৃত্তিকার সহিত সংযোজিত হইলে, সংযুক্ত মাটি অত্যন্ত তেজস্কর হইয়া উঠে। প্রথমাবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না, কিন্তু ক্ষেত্রান্তরে উক্ত মৃত্তিকা সাররূপে ব্যবহার করিলে আশাতিরিক্ত শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাল, বিল বা বিস্তীর্ণ জলাশয় এদোঁ পড়িয়া গেলে তাহাতে হিংচা, কল্‌মী, শুস্নি, হোগ্‌লা, পানা, শেওলা, কচুরী প্রভৃতি নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। বহুকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিলে সেই সকল উদ্ভিদে জলাশয় ক্রমে ভরাট হইয়া উঠে,—ক্রমে জল শুকাইয়া যায়। অতঃপর কোন গতিকে মাটি চাপা পড়িলে বহুকাল তদবস্থায় থাকিয়া যায়,—কর্ষণাদির অভাবে উহা বিক্ষিপ্ত বা চূর্ণিত হইতে না পারিয়া বা অল্লাধিক বিগলিত হইয়া সেই অবস্থাতেই সঞ্চিত থাকে। ঈদৃশ ক্ষেত্রকে ক্রমাগত কর্ষণ করিলে দীর্ঘকাল পরে আবাদের উপযোগী হইতে পারে।

১০। লোনা-মাটি (saline soil)।—সমুদ্রের সন্নিহিত ক্ষেত-পাথারে লোনা মাটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং তথাকার খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল প্রায় লবণময় হয়। যে সকল ক্ষেত্রের মৃত্তিকা লবণাক্ত তাহা চাষ আবাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। ঈষৎ লবণাক্ত মৃত্তিকাকে সংশোধন করা চলে, কিন্তু অতিরিক্ত লবণময় হইলে তাহাতে কোন আবাদই চলে না।

১১। উষর-ভূমি।—বেহার, যুক্ত-প্রদেশ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এজন্য তথায় লোণা জমি পাওয়া যায় না কিন্তু সে প্রদেশের অনেক জমিতে অন্য প্রকারের লবণ থাকে। ঈদৃশ জমি বঙ্গদেশের লোনা জমির ন্যায় চাষ আবাদের পক্ষে বড় অসুবিধাজনক। গ্রীষ্মকালে এই সকল জমিতে লবণ ফুটিয়া উঠে। ভূমির উপরিভাগে উক্ত লবণ শুভ্র বর্ণের গুঁড়ার ন্যায় প্রসারিত থাকিতে দেখা যায়। ঈদৃশ ভূমির উপরিভাগ চাঁচিয়া সংগ্রহ করতঃ বেহারের নুনিয়া জাতির লোকে সোরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এরূপ জমিকে 'উষর-ভূমি' কহে। উষর-ভূমিতে সোডা (Sodium Sulphate), সাজিমাটি (Carbonate of Soda) প্রভৃতি তীব্র লবণ সঞ্চিত থাকে। পতিত ও অনাবাদী জমিতেই লবণ অধিক প্রকাশ পায়। বর্ষাকালে উক্ত পদার্থ জলের সহিত বিধৌত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়ে কিম্বা ভূমির গভীরতম দেশে নামিয়া যায়,সুতরাং সে সময়ে তথায় চাষ-আবাদ করা চলে। এই সকল ক্ষেত্রে বারোমাস কোন-না-কোন ফসলের আবাদ করিলে—অভাব পক্ষে আগাছার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে—উপরে লবণ উঠিতে পারে না।

১২। কিট্টাল মৃত্তিকা।—ইংরাজিতে ইহাকে Ferrugenous soil কহে। কোন কোন জমি কুদ্দালিত হইলে মৃত্তিকা-চাপের গাত্রে মেটে-লাল বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈদৃশ

মৃত্তিকাকে জলে গুলিলে ঈষৎ লালাভ হইয়া থাকে। যে সকল জমিতে লৌহের গুঁড়া স্থান পায় তথাকার মৃত্তিকার বর্ণ এইরূপ হইয়া থাকে। লৌহসঙ্কুল পাহাড়ের ধোয়াটের সহিত লৌহের পরমাণু থাকে, সেই জল যে জমিতে স্থান পায় তাহাতেই লৌহকিট্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহের পরমাণুদল জল-বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে তাহাতে মরিচা জন্মে এবং সেই মরিচাকে লোহকিট্ট বা লৌহমল কহে। আবাদী ক্ষেত্রের উপরিভাগে বা আবাদী-স্তরে লৌহমল প্রায় দেখা যায় না। গুরুত্ববশতঃ উহারা নিম্নস্তরে নিমজ্জিত হয়। অধিক কিট্টালযুক্ত জমিতে ফসল তেজাল হইতে পারে না। দ্বারভাঙ্গা জেলার অনেক স্থানের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহমল দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে তথাকার অনেক খানা-ডোবায় ঈষৎ লাল বর্ণের সর পড়িতে দেখা যায়। উক্ত সর লৌহমল-জাত পদার্থ ভিন্ন আর কিছু নহে। সমতল অপেক্ষা ঢালু প্রদেশে (alluvial) ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক, কারণ এই সকল দেশের জমি পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত, পাহাড়ের জল তাহাদিগের উপর দিয়াই প্রবাহিত হয় এবং প্রবাহকালে জলে ভাসমান অপরাপর পদার্থের সহিত লৌহরেণুও ভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হয়। কর্ষাণাধীন ভূমির আবাদীস্তরে যে উহাদিগকে দেখা যায় না, তাহার কারণ—আলগা মাটিতে উহারা নিরবলম্বভাবে অবস্থান করে, সুতরাং বৃষ্টি হইলে নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। নিম্নস্তরে নামিয়া গেলেও যোগাকর্ষণে রসের সহিত উহাদিগের কষ উপরিভাগে আসিয়া থাকে এবং রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ লাভ করে। ইহাদিগের ঘনতা দূর করিবার জন্য ক্ষেত্রে ভাল মাটি বা সার প্রভূত পরিমাণে প্রদান করা উচিত; এরূপ করিলে রেণু সমূহের পুঞ্জ বা ঘনতা ভাঙ্গিয়া যায়,—ফলতঃ তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

—০ঃ*ঃ০—

ছিদ্রতা

মৃত্তিকা ভগ্নপ্রবণ পদার্থ সুতরাং যতই কঠিন হউক, অল্লাধিক আঘাত পাইলে চূর্ণ হইয়া যায়। মাটি যত চূর্ণ ও ঝুরা হয়, তত তাহার ছিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। ভূমির উর্ব্বরতার প্রধান কারণ,—ছিদ্রতা (porousity)। যে মাটির যত অধিক ছিদ্রতা তাহা তত অধিক উর্ব্বরা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তদন্তর্গত পরমাণু বা দানা সমূহ অতিশয় ক্ষুদ্র, তন্নিবন্ধন তাহাতে ছিদ্রও অধিক। স্থুলদানাবিশিষ্ট মৃত্তিকায় জল পতিত হইবামাত্র শোষিত হয় বলিয়া তাহার শোষকতা অধিক, এরূপ মনে করা ভ্রম। এরূপ মৃত্তিকায় শীঘ্র জল শোসিত হইবার প্রধান কারণ—দানা ও ছিদ্রপথসমূহের স্থুলতা। ইহাতে যে জল পতিত হয়, তাহা শীঘ্রই নিম্নদেশে নামিয়া যায়,—আবাদী স্তরের মধ্যে অধিকক্ষণ সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যে মাটির দানা স্থুল, তাহার শোষকতা ও ধারকতা অল্প। একখানি সুপক্ক ইষ্টক যত জল শোষণ ও ধারণ করিতে পারে, তৎপরিমিত সুচুর্ণীত ইষ্টক বা ধূলা তদপেক্ষা বহুগুণ জল শোষণ ও ধারণ করিতে পারে। অভগ্নাবস্থায় ইষ্টকখানি যত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে সূক্ষ্ম ধূলায় পরিণত করিলে, ধূলারাশি ইষ্টকাপেক্ষা বহু অধিক স্থান অধিকার করিবে—ইহা নিশ্চয়, কারণ সমষ্টি অপেক্ষা ব্যষ্টির আয়তন অধিক। পরমাণুরাশি একত্রে ঘনরূপে সম্বদ্ধ থাকিলে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং বিস্তৃত স্থানেরও আবশ্যক হয় না। সমষ্টি হইতে বিচ্যুত হইলেই একদিকে যেরূপ তাহাদিগের

স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হয় অন্যদিকে সেইরূপ থাকিবার জন্য অধিক স্থানেরও আবশ্যক হইয়া থাকে। ধূলা একত্র সমাবিষ্ট হইলে প্রত্যেক পরমাণুর আকারানুসারে প্রত্যেকের চতুষ্পার্শ্বে স্থান থাকিবেই। সমাবিষ্ট চূর্ণরাশির উপরিভাগে দানা পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ফলে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র স্থান অনধিকৃত থাকে। ইহাই মৃত্তিকার ছিদ্র বা কূপ (pores)। উক্ত ছিদ্রসমূহের দ্বারাই ভূগর্ভের সহিত বায়ুমণ্ডলের আদান-প্রদান হইয় থাকে। উহাদিগের ভিতর দিয়া বায়ু, বৃষ্টি, আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি ভূগর্ভমধ্যে প্রবেশ লাভ করে। প্রবেশদ্বার অধিক থাকিলে বায়বাদি অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। সকল প্রকার মাটির দানা অপেক্ষা এঁটেল মাটির দানা সূক্ষ্ম, এইজন্য তাহাতে ছিদ্র অধিক,— মৃত্তিকার মধ্যে স্থান অধিক,—পরমাণু পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী শিরালা বা ছিদ্রপথ অধিক কিন্তু সঙ্কীর্ণ। এই সকল কারণবশতঃ এইরূপ মাটির শোষকতা ও ধারকতা অধিক। আঁটাল-মাটির নামে অনেকের ভীতির সঞ্চার হয়, কিন্তু তাহার সদৃশ উত্তম মাটি আর নাই। বালুকা-দানার স্থূলতা অধিক বলিয়া পরমাণু পরস্পরের মধ্যে স্থান অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাহাতে অধিক জল প্রবেশ করিতে কিম্বা অধিক জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। বেলে মাটি অতি শীঘ্র জল শোষণ করিতে পারে বলিয়া লোকের ধারণা যে, বেলে-মাটি অধিক জল শোষণক্ষম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ছিদ্রতার আধিক্য হেতু এঁটেল-মাটির ভিতর যেরূপ অধিক জল প্রবেশ করিতে পারে, সেইরূপ অলোক, উত্তাপ ও বায়ু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর দেখা যায়,—

যে ভূমিতে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ চতুষ্টয়ের প্রতিপত্তি থাকে, তাহা স্বভাবতঃ উর্ব্বরা হয়। বৃষ্টির হইবার ২।৪ দিন পরে মাটি বেশ শুষ্ক

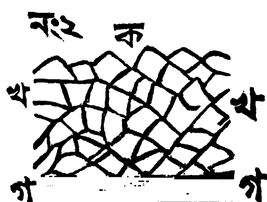
হইলে দেখা যায়, তদুপরিস্থ উদ্ভিদ—বিশেষতঃ কোমল-প্রকৃতি উদ্ভিদ,—বিষণ্ণভাব ধারণ করে, তাহার কারণ ভূপৃষ্ঠ বারিবিধৌত হইয়া ছিদ্রপথ সমুহের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় তন্নিবন্ধন মৃত্তিকা মধ্যে বায়বাদি প্রবেশ করিতে পারে না। মৃত্তিকা মধ্যে উক্ত পদার্থ-সমুহ প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। কোমলপ্রকৃতি উদ্ভিদে ইহার ফলাফল যত শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য উদ্ভিদে সেরূপ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, উল্লিখিত কারণে যে সকল উদ্ভিদ বিষণ্ণভাব ধারণ করে, তাহাদিগের কতকগুলির গোড়ার মাটি চূর্ণ করিয়া দিলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই এই সকল বৃক্ষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সজীব হয়, প্রফুল্লভাব ধারণ করে। ভূপৃষ্ঠের ছিদ্র বুজিয়া গেলে মৃত্তিকা যতই সারবান হউক, কিছুতেই কিছু হইবে না। কেবল যে, বৃষ্টির জল দাঁড়াইলে অথবা উপরে সর পড়িলে ভূমির ছিদ্র বুজিয়া যায় তাহা নহে, জমির উপর দিয়া লোক চলাচল করিলে অথবা গরু-বাছুর চরিলে তাহাদিগের পদভরেও মাটি যথেষ্ট বসিয়া যায়,—ছিদ্র বুজিয়া যায়।

নং১

ছিদ্র পথ

রস, আলোক উত্তাপ প্রভৃতি ভূগর্ভ মধ্যে-প্রবেশ করিবার যে পথ তাহাকে ছিদ্রপথ (Capillary tubes) কহে। ভূ-পৃষ্টের উপরিভাগ হইতে ছিদ্রপথ সমূহ নিম্নাভিমুখী হইয়া ক্রমে ভূগর্ভস্থ বারিপৃষ্টে (water level) মিলিত হইয়াছে। ভূগর্ভ মধ্যে এমন একটী স্থান আছে যথায় ভূপৃষ্ঠশোষিত তাবং জল ক্রমশঃ নিম্নদেশে গিয়া স্থান পায়। এত যে বৃষ্টি হয়, তাহার সমুদায় জল নিকাশ হইতে পারেনা—কতক জল ভূমিতে শোষিত হয়, কিন্তু কত জল যে শোষিত হয় তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, কারণ তাহা মৃত্তিকার

শোষকতার উপর নির্ভর করে। কুর্ম্ম-পৃষ্ঠ ও গড়েন জমি অপেক্ষা সমতল জমিতে অধিক জল শোষিত হয়। এইরূপ নানা কারণে ভূগর্ভ মধ্যে অল্প বা অধিক জল শোষিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা যে পরিমাণ জল ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, সেই পরিমাণ জল ধারণ করিয়া রাখে, অবশিষ্টাংশ ছিদ্রপথের ভিতর দিয়া অন্তর্ভৌম জলাশয়ে গিয়া স্থান পায়। ঋতু অনুসারে উক্ত জলাশয় ভু-পৃষ্ঠের অধিক বা অল্প নিম্নে বিদ্যমান থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির আধিক্য-হেতু জলাশয় ও ছিদ্রপথ সমূহ জলে পূর্ণ থাকে, সুতরাং সে সময়ে হয়ত এক হাত মাটি খনন করিলেই জল পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত বারি জলাশয়ের নহে,—ছিদ্রপথের সঞ্চিত জল। বর্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর মাটিতে রস কমিয়া আসে, তখন অগত্যা অধিক দূর খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না—পুষ্করিণী বা কূপ খনন কালে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে যে চিত্র (নং ২) দেওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে বুঝিতে হইবে,—ক,-ভূপৃষ্ঠ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দ সমূহ মৃত্তিকার ছিদ্র বা ছিদ্রপথের মুখ ; খ, খ,—মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সূত্রবৎ দাগ, তৎসমুদায় ছিদ্রপথ ; এবং গ, গ—চিহ্নিত মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্তর্ভৌম জলাশয়। সূর্য্যোত্তাপে ভূপৃষ্ঠ হইতে যত জল আকর্ষিত হইতে থাকে, যৌগিকাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ছিদ্রপথ দিয়া তত জল সেই জলাশয় হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। উক্ত জলাশয় কখনও জলশূন্য হয় না। যেখানে যত জল থাকুক, তাবৎ জলই সেই মহাজলাশয়ের সহিত সম্মিলিত হয়। জলাশয় নিরন্তর বারিপূর্ণ থাকায় এবং বাহ্যাকর্ষণে উক্ত জলাশয় হইতে ছিদ্রপথ দিয়া জলরাশি নিরন্তর উপরিভাগে উঠিতে থাকায় মাটি সর্ব্বদা



অল্পাধিক সিক্ত থাকে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে রৌদ্রাভাবে এবং রাত্রিকালে রসাকর্ষণ-ক্রিয়া অল্পাধিক স্থগিত থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক্ ছিদ্রপথের ক্রিয়া কি? ছিদ্রপথের ক্রিয়া—

ছিদ্রপথের ক্রিয়া

উত্তাপ, বায়ু ও রস আহরণ করতঃ ভূমির মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া এবং যোগাকর্ষণ (capillary attraction) শক্তি দ্বারা ভূগর্ভস্থ জলাশয় হইতে জল শোষণ করিয়া উর্দ্ধাভিমুখে আনয়ন করা। এইরূপে ভূগর্ভস্থ রস বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে সংযুক্ত হয়। ছিদ্রপথের মুখ যত উন্মুক্ত থাকে, মৃত্তিকামধ্যে উল্লিখিত ক্রিয়া সমূহের কার্য্য তত অধিক হয়। মাটি জমাট বাঁধিয়া গেলে, মাটির উপর সর পড়িলে অথবা ভূমি অধিক দিবস অকর্ষিতাবস্থায় পতিত থাকিলে ছিদ্রপথের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন বায়ু, রৌদ্র বা আলোক মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। উল্লিখিত পদার্থ সমুহ্ মৃত্তিকার জীবন স্বরূপ। তাহাদিগের অভাবে মৃত্তিকাকে নির্জীব বা মৃত বলিতে পারা যায়। বহুকালের পতিত ও কঠিন জমিতে চাষ দিলে তাহার অব্যবহিত পরেই তাহাতে রৌদ্রাদির ক্রিয়া সঞ্চারিত হয়। ভূমি নির্জীবাবস্থায় থাকিলে তদন্তর্গত পদার্থ সমূহ বিশ্লেষিত হইতে পায় না এবং যাবৎ উত্তমরূপে বিশ্লেষিত না হয় তাবৎ কাল উক্ত পদার্থনিচয় যতই সারাল হউক—উদ্ভিদের কোন কার্য্যেই আসে না। তবে ইহা দেখা যায় যে, মৃত্তিকা প্রায় নিষ্ক্রিয়াবস্থায় থাকে না, সুযোগ-সুবিধার অভাবে বা তাহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটিলেই নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। ভূমি প্রলিপ্ত হইলে অথবা তদুপরে বিস্তৃত প্রস্তর বা অন্য কোন গুরুভার সামগ্রী নিপতিত থাকিলে মৃত্তিকার ক্রিয়াশীলতার অভাব হইয়া থাকে। অতপরঃ—

ক্ষেত্র কুদ্দালিত হইলে মাটির বড় বড় চাপ্ উৎপন্ন হয়। সেই সকল

চাপ্ ভাঙ্গিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া না দিলে ভূগর্ভ মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। হলকর্ষণ করিলেও এরূপ হয়। কর্ষিত ও কুদ্দালিত হইলে ভূপৃষ্ঠের ছিদ্রপথ সমূহ ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত্তিকামধ্যে রৌদ্র, বায়ু প্রভৃতি সকল জায়গায় সমভাবে প্রবেশ করিতে পায় না, এইজন্য মৃত্তিকা বিচলিত হইবার পর বিদে, চৌকী বা মদিকা দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করতঃ চাপিয়া দিতে হয়। উল্লিখিত যন্ত্রের সাহায্যে এক দিকে মৃত্তিকা চূর্ণ হয় ও ভারে বসিয়া যায়, অন্যদিকে জমিও চৌরস হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সংরক্ষণহেতু কর্ষণ, চূর্ণণ ও চাপন—এই তিনটী কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাকেই কহে—সুচাষ। দেশের ফলন যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, তাহার অন্যতম কারণ—চাষের অসম্পূর্ণতা। সুচাষ দ্বারা প্রতি বৎসর ক্ষেত্র হইতে সমূহ পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিলে, মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি বা জলপ্লাবনে অথবা অন্য কোন দৈব কারণে অজন্মা হইলে তত ভয়ের কারণ থাকে না। রপ্তানি বন্ধ সম্বন্ধে আমরা অনন্যোপায়, সুতরাং অন্য উপায়ে আমাদিগকে ঘরের অভাব মোচন করিতে হইবে এবং সে উপায়—ক্ষেত্র হইতে যাহাতে পাঁচ মণ স্থলে দশমণ ফসল উৎপন্ন করিতে পারি তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য আমাদের প্রধান কার্য্য—সুচাষের বন্দোবস্ত করা।

ভূমির আয়তন বৃদ্ধি

ঢেলা যত ভাঙ্গিয়া যায়, দানা সকল তত বিযুক্ত হইয়া পড়ে। জমি ঢেলাবিশিষ্ট হইলে উদ্ভিদের স্থানের অসঙ্কুলান হয়। ঢেলাময় ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ঢেলা পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক দানা পতিত হয়ও তথায় উপ্ত হয়। দশ কি পাঁচ কাঠা ভূমি ঢেলা দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকিলে কার্য্যতঃ উক্ত দশ কি পাঁচ কাঠা জমির পূর্ণ উপসত্ব ভোগে আমরা বঞ্চিত হইয়া

থাকি। সেই সকল ঢেলা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃতাবস্থায় থাকিলে সমগ্র এক বিঘা জমিতে বীজ ছড়াইয়া পড়িতে পারে। বীজ ঘনরূপে পতিত হইলে ঘনভাবে গাছজন্মে, কিন্তু প্রয়োজনমত স্থানের অভাববশতঃ উপ্ত গাছ সকল অযথাদীর্ঘে হইয়া উঠে, অনেক গাছ ঘনতা হেতু মরিয়া যায়। আবার যে সকল গাছ থাকিয়া যায়, ঘনতা হেতু তাহাদিগের গোড়ায় নিড়েন বা খুরপী করা চলে না। এরূপ অবহেলায় আবাদ করিলে প্রথম ক্ষতি—ফসলের উৎপন্নের হ্রাস পরিমাণ দ্বিতীয়তঃ,একবিঘা জমির খাজনা দিয়া পূরা এক বিঘা জমির উপসত্ব ভোগে বঞ্চিত হওয়া। এরূপে এক বিঘার আবাদ অপেক্ষা স্থচাষের দশ কাঠা জমিও ভাল। স্থচাষ দ্বারা দশ বিঘার ফসল পাঁচ বিঘা হইতে উৎপন্ন করিতে পারিলে অপর ব্যক্তি আর পাঁচ বিঘা লইয়া আবাদ করিতে পারে।

সকল মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমান নহে। মৃত্তিকান্তর্গত উপকরণের

ছিদ্রপথের অসমতা

ও দানার স্থূলতা বা সূক্ষ্মতানুসারে ভূপৃষ্ঠের ছিদ্র যেরূপ অধিক বা অল্প, বড় বা ছোট হইয়া থাকে, ছিদ্রপথও সেইরূপ অধিক বা অল্প স্থূল বা সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির জল তেমনি শীঘ্র বা বিলম্বে নিম্নদেশস্থ বারিস্তরে গিয়া পড়ে। উদ্ভিজ্জ-পদর্থ-সম্বলিত মৃত্তিকায় সহজে রসের অভাব হয় না। বেলে মাটিতে বালির পরিমাণ অধিক, বালির দানাও স্থূল। এই কারণে তাহার ছিদ্রপথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু—

এঁটেল মাটির প্রকৃতি ও গঠন ঠিক উহার বিপরীত অর্থাৎ এঁটেল মাটির দানা সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্ম দানার অধিক্য হেতু ছিদ্রপথ অতিশয় কৃশ হয় কিন্তু সংখ্যায় অধিক হয়। যে সকল ক্ষেত্রের মাটি ফাটিয়া যায়, তজ্জাত গাছের শিকড়ও ছিঁড়িয়া যায়, মাটির ভিতর রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করিয়া নিম্নস্তরের মাটিকে নীরস ও কঠিন করিয়া দেয়। স্থূল

অর্থাৎ অর্দ্ধ বিগলিত উদ্ভিজ্জ-সার প্রদান করিলেও, আপাততঃ সে দোষ ঢাকা পড়ে কিন্তু তদ্দ্বারা মৃত্তিকার স্থায়ী সংস্কার হয় না, কারণ উহা বিগলিত হইলে ছিদ্রপথ সমূহ পুনরায় সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এস্থলে কেবল এঁটেল ও বেলে মাটির বিষয়ই আলোচিত হইল। এতদুভয়ের অন্তর্গত মৃত্তিকা সমূহ উপাদানের অল্পাধিক্যে ও ঘনতা বা স্থূলতানুসারে স্থূল বা সূক্ষ্ম, অল্প বা অধিক হইয়া থাকে।

নবম অধ্যায়

-:*:---

রসাকর্ষণ

যৌগিক আকর্ষনের দ্বারা পৃথিবীর রস বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডলে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ভূমি পাছে নীরস হইয়া যায়—এই জন্য জগদীশ্বর মৃত্তিকাকে এরূপ একটী বিশেষ শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা উহা বায়ুমণ্ডল হইতে সহজে রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়। মৃত্তিকান্তর্গত উপাদান সমূহের গুণাগুণে এবং প্রাকৃতিক ও ভৌতিক কারণে উক্ত শক্তির অল্পতা অধিক বিকাশ হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডল হইতে মৃত্তিকার এই রসাকর্ষণ শক্তিকে ইংরাজীতে Hygroscopioity কহে। উক্ত শক্তিকে ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য ভূমি যাহাতে কঠিন না হয় এবং ভূমির ছিদ্রপথের মুখ রুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। অল্পাধিক সরস মৃত্তিকা যে যে পরিমাণে রস শোষন করিতে সক্ষম, শুষ্ক ও ঝুড়া মাটিতে তত নহে।

মৃত্তিকা মধ্যে রস থাকিলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে। মৃত্তিকা মধ্যে রস সঞ্চালিত না হইলে তদন্তর্গত স্থূল পদার্থ সমূহ বিগলিত বা বিশ্লেষিত হইতে পারে না। উক্ত ক্রিয়াকে নিরন্তর তৎপর বা ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য মৃত্তিকা মধ্যে রস থাকা যেরূপ প্রয়োজন, বাহ্যিক উত্তাপেরও সেইরূপ প্রয়োজন, কারণ একের অভাবে-অপরের নিষ্ক্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী। রসহীন মৃত্তিকায় যতই প্রখর সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হউক, তদ্দ্বারা মৃত্তিকার কোন উপকার দর্শে না—কেবল তাহার উপরিভাগ ঈষৎ উত্তপ্ত হয় মাত্র। আবার সরস মৃত্তিকা সূর্য্যোত্তাপ হইতে বঞ্চিত হইলে তাহারও কোন উপকার দর্শে না, বরং সঞ্চিত রস জড়ভাবে থাকিয়া ক্রমে দূষিত হইয়া পড়ে, জমিতে উত্তাপের অভাব হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ—তদুপরিস্থ উদ্ভিদগণ শীর্ণ, বিবর্ণ, বৃদ্ধিহীন হয়।

রস ও উত্তাপ

রস-সঞ্চালনী ক্রিয়া কি এবং তাহার ফলই বা কি? রস ও উত্তাপ যতক্ষণ স্বতন্ত্রাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহাদিগের এক-প্রকার নিজস্ব ক্রিয়া থাকে, কিন্তু এতদুভয়ের সম্মিলন ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তদ্দ্বারা অতি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে পরিক্রমণী-ক্রিয়া (Circulation of moisture) দেখা যায়, তাহা রস ও উত্তাপ জনিত শক্তির ফল মাত্র। সূর্য্যোতাপ—মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ রসের সংস্পর্শে আসিলে রস উত্তপ্ত হইতে থাকে। সেই উত্তাপ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইলে সমগ্র রস অল্পাধিক উষ্ণ হইয়া উঠে। রস যত উষ্ণ হইতে থাকে ততই তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ফলতঃ সমগ্র রস মধ্যে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়া ভূগর্ভস্থিত জড় পদার্থ সমূহ বিশ্লেষিত হইতে থাকে।

রসপরিক্রমণী

রসের পরিক্রমণ-ক্রিয়া বারোমাস সর্ব্বদেশে বা সকল প্রকার মৃত্তিকায় সমভাবে সমাহিত হয় না। সূর্য্যোত্তাপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তাহার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখরতা—সকল ঋতু অপেক্ষা অধিক হয়, এজন্য গ্রীষ্মকালে পরিক্রমণ-ক্রিয়া সমধিক হইয়া থাকে, কিন্তু এ সময়ে ভূমিতে রস কমিয়া যায়, তজ্জন্য পরিক্রমণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে কিন্তু এ সময়ে কখন কখন বারিপাত হইলে কিম্বা জমিতে জল সেচিত হইলে পরিক্রমণ কার্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বা প্রবল হয়। শীতকালে জলমাত্রেই ঘনীভূত হইয়া থাকে,—সহজে উত্তপ্ত হয় না, উপরন্তু সে সময়ের দিবা ভাগ অল্প, সূর্য্যের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষণ, সূর্য্যরশ্মিও তাদৃশ্য প্রখর নহে। এই সকল কারণে শীতকালে ভূমির রস উত্তপ্ত হইতে বিলম্ব হয়, এবং যে উত্তাপ উদ্ভুত হয়, তাহাও বহুক্ষণ স্থায়ী অথবা সমধিক উত্তপ্ত হয় না। সর্ব্বদেশের কথা যে বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধেও উল্লিখিত যুক্তি বহু পরিমাণে প্রযোজ্য, কারণ কোন দেশ শীত প্রধান, কোন দেশ উষ্ণ-প্রধান ইত্যাদি। শীত-প্রধান দেশে শীতের প্রাধান্য, সূর্য্যোত্তাপের মৃদুতা, বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা প্রভৃতি কারণ বশতঃ তথাকার মৃত্তিকার উত্তাপ কম। উত্তাপের অল্পতা নিবন্ধন মৃত্তিকার রস-পরিক্রমণ ক্রিয়াও অনেক কম হইয়া থাকে। আবার অনেক দেশে বরিপাত অত্যধিক, বৎসরের অধিকংশ দিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সুতরাং সেখানে সূর্য্যোত্তাপের পরিমাণ অল্পই হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃতিক কারণের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে,—

পরিক্রমণের ইতরবিশেষ

মৃত্তিকান্তর্গত উপকরণ সমূহের তারতম্যে ও তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ভেদে, ভূগর্ভ মধ্যে সময় বিশেষে উত্তাপের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এঁটেল মাটির পৃষ্ঠ-কূপ (pores) ও ছিদ্রপথ সমূহ অতিশয়

ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া উত্তাপাদি তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে কালবিলম্ব হয়, তদ্ধেতু উত্তপ্ত রস শীতল হইতে থাকে। এই জন্য এঁটেল ও তজ্জাতীয় মাটি মাত্রেই স্বভাবতঃ অল্পাধিক ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। ডোবা বা বিল জমিতে উত্তাপ আদৌ ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না। বালুকা বা মরুভূমিতে রসাভাব, কাজেই তাহারও প্রায় সেই দশা। পতিত জমিতে যতদিন না হলচালনা করা যায়, তত দিন তাহা এক ভাবে—অতি নির্জীব ভাবে থাকে, এবং তাহাতে যে তৃণাদি জন্মে তৎসমুদায় তাদৃশ বৃদ্ধিশীল বা লাবণ্যযুক্ত হয় না, কিন্তু যে দিন বা যে ক্ষণ হইতে সেই বহুদিনের পতিত ভূমিতে হলচালিত হয়,—সেই ক্ষণ হইতে তাহার নির্জীবতা দূর হয়,—তাহাতে নব-জীবনের সঞ্চার হয়।

ভৌতিক যৌথ

ইহার মূল—রস, উত্তাপ ও বায়ু। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় জীবের ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য উক্ত তিনটী অমূল্য পদার্থের যেরূপ একান্ত প্রয়োজন, ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষার জন্যও সেই সকল সামগ্রী তদনুরূপ আবশ্যক। আবাদী জমিতে হলচালনা করা হয়, মাটি উলট-পালট হয়, সেই জন্য তাহাতে উক্ত তিনটী বিশেষ বিশেষ পদার্থের কার্য্য হইয়া থাকে। উহাদিগের একের অভাবে অপরের কোন ক্রিয়াশীলতা থাকে না। উক্ত পদার্থত্রয়ের মধ্যে যাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে, তাহারই অনুপাতে উহাদিগের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার একটী সহজ উপায় আছে। খানিকটা জমির (দুই এক হাত হইলেও ক্ষতি নাই) এক বিতস্তি আন্দাজ মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে ২।৩ অঙ্গুলি পুরু করিয়া বিচালি, টাটকা অশ্ব-পুরীষ বা অপর কোন উত্তাপ-জনক সার প্রসারিত করতঃ তদুপরি উত্তোলিত মৃত্তিকা প্রসারিত করিয়া দৃঢ়রূপে চাপিয়া দিবার পর তাহাতে জল সেচন করিতে হয়। সেচিত

জল ক্রমে সমুদায় মৃত্তিকা সিক্ত করতঃ নিম্নস্থিত পদার্থে গিয়া সঞ্চিত হয়। নিম্নস্থিত সার বা খড়ে জল সঞ্চিত হইবার কিছুক্ষণ পরে তন্মধ্যে উত্তাপের সঞ্চার হয়। তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে—উত্তাপের অস্তিত্ব ও পরিমাণ জানিতে পারা যায়। উত্তাপ জন্মিলে তথা হইতে যে, উত্তপ্ত বাষ্প নির্গত হইতে থাকে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। এই উত্তাপকে বিশ্লেষক-উত্তাপ বলিতে পারা যায়, কারণ উক্ত উত্তাপ উদ্ভূত হইলে পদার্থ সমূহের স্থূলতা ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণুতে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, উক্ত পদার্থত্রয়ের বিনা সমন্বয়ে বিশ্লেষক-উত্তাপ উদ্ভূত হইতে পারে কি না? এতদর্থে উক্ত পরীক্ষাধীন স্থানে বায়ু প্রবেশের পথ রোধ করিতে হইবে। মৃত্তিকা দৃঢ়রূপে চাপিয়া দিলে তন্মধ্যে বায়ু বা রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না স্থতরাং মৃত্তিকা মধ্যে উত্তাপ জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ,—অন্য সকল কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন করিয়া যদি তাহাতে আদৌ জল সেচন করা না যায়, তাহা হইলেও তন্মধ্যে উত্তাপ জন্মে না। অতঃপর দেখা যায়—বায়ু প্রবেশের পথ থাকিলে রৌদ্র বা উত্তাপ প্রবেশের পথ থাকিবে; তন্মধ্যে অবশ্যই যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাটিতে সার—বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ সার—থাকিলে তন্মধ্যে এত স্থান খালি থাকে যে, তথায় বহু পরিমাণ বায়ুর স্থান হয় এবং তন্মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। এই তিন পদার্থের যৌথ ক্রিয়া ফলে মৃত্তিকান্তর্গত জড় ও দ্রবনীয় পদার্থ-সমূহ বিগলিত হইয়া ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে।

ভূগর্ভস্থ রস তপ্ত হইলে এতই লঘু হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহা শীতল রসের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া বাষ্পাকার ধারণ করতঃ বায়ুমণ্ডলে গিয়া মিশিতে থাকে। ভূমি হইতে যে নিরন্তর

বাষ্পোদ্গত হইতে থাকে, তাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায়। অনাবৃত জমির কোন স্থানে একটী কাচের গেলাস উল্টাইয়া রাখিয়া দিলে ক্ষণকাল পরে দেখা যাইবে যে, গেলাসের ভিতর চারিদিকে শিশির বিন্দু লাগিয়া আছে। উক্ত শিশির বিন্দু ভূ-নিস্যতঃ বাষ্পের রূপান্তর মাত্র। গেলাসের দ্বারা আবৃত থাকায় উক্ত বাষ্প বায়ুমণ্ডলে যাইতে না পারিয়া শীত সংযোগে ঘনতা প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় বারিতে পরিণত হয়। দিবাভাগে ভূমি হইতে যে বাষ্প নিঃসৃত হয়, বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতা ও রৌদ্রের উত্তাপ হেতু নিঃসরণ মাত্রেই শুকাইয়া যায়, সেইজন্য আমরা তাহা দেখিতে পাই না, কিন্তু রাত্রিকালের নিঃসৃত বাষ্প বায়ুমণ্ডলের সিক্ততা ও ঘনতা হেতু অধিক উপরে উঠিতে পারে না, ফলতঃ শিশিরে পরিণত হয়। তৃণহীন ভূমিতে শিশিরপাত হইলে ভূমি তাহা শোষণ করিয়া লয় বলিয়া তাহাও আমাদিগের নয়নগোচর হয় না, কিন্তু তৃণাবৃত স্থানে শিশির বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শীতকালে অত্যধিক শিশিরপাত হয় বলিয়া তৃণহীন স্থানও তাহাতে সিক্ত হইয়া থাকে,—শীতকালের প্রাতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

রস

মৃত্তিকা মধ্যে জলের প্রাধান্য সামান্য নহে। রস না থাকিলে মৃত্তিকার ক্রিয়াশীলতা থাকে না,—ইতঃপূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ধারকতা অনুসারে মৃত্তিকা মধ্যে যত অধিক রস থাকে, উদ্ভিদের পক্ষে ততই মঙ্গলকর। জলই উদ্ভিদকে বাঁচাইয়া রাখে এবং জলের সহিতই মৃত্তিকান্তর্গত খাদ্য উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার অবয়ব গঠনের সহায়তা করে। কোন গাছকে কেবলমাত্র স্বচ্ছ বারিমধ্যে বসাইয়া রাখিলে তাহা বাঁচিয়া থাকে সত্য, কিন্তু বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আরও

লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত উদ্ভিদ যত রস আহরণ করিতে থাকে, তৎসমুদায় তাহার কোমলাংশ ও পত্রস্থ ছিদ্র (stomata) দ্বারা বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। এস্থলে উদ্ভিদকে জল ও বায়ুমণ্ডল—এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালী বা pump স্বরূপ বলা যাইতে পারে। যে গাছ যত অধিক বৃদ্ধিশীল সে গাছ তত অধিক রস শোষণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে তত অল্প স্থূল পদার্থ থাকে।* ফল ও ফুলে রসের ভাগ অত্যধিক। ইহাদের মধ্যে অনেক গাছই শত করা প্রায় ৯০ ভাগ জলে পূর্ণ, অবশিষ্ঠ স্থূল পদার্থ। অগ্ন্যুত্তাপে কটাহে ভাজিলে কিম্বা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহা ভস্মীভূত হইয়া যায়, উহার দাহ্য পদার্থ পুড়িয়া যায়, সুতরাং পরিমাণ আরও কমিয়া যায় ফলতঃ প্রকৃত জলের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় না। পরীক্ষাধীন দ্রব্য যতক্ষণ না ভগ্নপ্রবণ হয়, ততক্ষণ তাহাকে বাষ্পোত্তাপে রাখিতে হইবে এবং কটাহের জল উদ্বেলিত হইয়া তদুপরিস্থিত পাত্রে না পড়ে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মৃত্তিকা মধ্যে কত রস থাকা প্রয়োজন। মৃত্তিকায় যত রস কম থাকে, গাছের বৃদ্ধি তত কম হইয়া থাকে,—উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থ তত কম পরিমাণে আহরিত হয়। দীর্ঘজীবী মহীরুহ মধ্যে রসের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প দেখা যায়,—৫০।৬০ ভাগ হয়ত তাহাতে রস থাকে। ঈদৃশ গাছ যে অল্প রস আহরণ করে তাহা নহে। বড় বড় গাছ বহু পত্রক ও বহুশাখী হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা বহু পরিমাণ রস বহির্গত

* জলোত্তাপে (Water Bath) কোন দ্রব্যকে শুষ্ক করিতে হইলে এক কটাহ জলে একটী পাত্র রাখিয়া সেই পাত্র মধ্যে উক্ত দ্রব্যকে রাখিয়া দিতে হয়। অতঃপর পাত্র সমেত কটাহকে প্রজ্জ্বলিত উনানে বসাইয়া রাখিতে হয়। জলের উত্তাপে উক্ত দ্রব্য শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু দগ্ধ হয় না। পরীক্ষধীন দ্রব্যকে অতঃপর ওজন করিলে বুঝা যাইবে যে, উহাতে কত জল ছিল।

হইয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে (উদ্ভিদের কোমলাংশ, শাখা প্রশাখার শেষাগ্র) ভাগ ও পত্রের ভিতর দিয়া রস বাষ্পরূপে বহির্গত হইয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমধিক পরিমাণে রস আহরণে অসমর্থ হইলে তাহারা বৃহদাকার হয় কিরূপে, ইহা ভাবিয়া দেখিলেই এ সমস্যা প্রতিপাদিত হইবে। মৃত্তিকা মধ্যে রসের অভাব নাই এবং কখনও অভাব হয় না। ভূমি ব্লটিং কাগজের ন্যায় শোষণক্ষম। বর্ষাকালে ভূমিতে যত জল শোষিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভূগর্ভ মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং সেই সঞ্চিত রস উদ্ভিদকে বারোমাস পোষণ করিয়া জীবিত রাখে ও বর্দ্ধিত করে। ভূমির সঞ্চয় শক্তি না থাকিলে বর্ষাকালের অব্যবহিত পর হইতেই গাছ-পালা মরিয়া যাইতে থাকিত এবং অল্প দিন মধ্যেই পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হইত। অনাবৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠ শুষ্ক হইতে পারে, কিন্তু যতদিন রসাতল বা পাতাল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ভূমি একেবারে রসহীন হইবে না,—উদ্ভিদের রসাভাব হইবে না ইহা স্থির।

ধারণক্ষম মৃত্তিকা স্বভাবতঃ রসা (moist) হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকার সে শক্তি নাই, তাহাতে জল সঞ্চিত হইলে তাহার কিয়দংশ ভূমির উপরিভাগ দিয়া অন্যত্র প্রবাহিত হইয়া যায়, অবশিষ্ট নিম্নাভিমুখী হইয়া অধোস্তরে, এবং তথা হইতে নিম্নতরদেশে নামিয়া যায়। অতঃপর যেখানে গিয়া কঠিন ও ঘন মাটির স্তর পায় সেইখানে গিয়া স্থিতি লাভ করে, কিন্তু উপরিভাগের রসের ভারে তদূর্দ্ধস্থ ঝাঁজরা মাটি ভেদ করিয়া কতক জল কোন দিক দিয়া নির্গত হইয়া যায়। পর্ব্বতে যে সকল নির্ঝরিণী দেখা যায়, তাহারা সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমতল প্রদেশে নির্ঝরিণীর উদ্ভব হয় না বটে, কিন্তু নানাদিক দিয়া জল চুয়াইয়া দূরে গিয়া পড়ে, অবশেষে খাল, বিল, কূপ, নালা

মধ্যে গিয়া পৌঁছে। অতিশয় রসা জমিকে দো-রসা বা শুষ্ক করিতে হইলে ক্ষেত্রের চারিদিকে অল্লাধিক গভীর নয়াঞ্জুলি কাটিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।



যে দেশের মাটি বড় শুষ্ক, তথাকার ভূগর্ভে উত্তাপেরও বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। রৌদ্র হেতু উপরের মাটি উত্তপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মৃত্তিকার রসাভাব হেতু ভূগর্ভ মধ্যে উত্তাপ প্রবিষ্ট হয় না। সেই জমিকে কৃত্রিম উপায়ে জল সিক্ত করিবার ক্ষণকাল পরে—ইতোমধ্যে অবশ্য সূর্য্যোত্তাপ পাইলে,—তাহার মধ্যে তাপমান যন্ত্র (Thermometer) প্রবিষ্ট করিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, তাহার উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে।

নয়াঞ্জুলি

যে জমি অতিশয় সরাল, কিম্বা যে জমির আর্দ্রতা শীঘ্র দূর হয় না, তাহার উন্নতি সাধন করিবার জন্য, হয় জমিকে অল্লাধিক উচ্চ করিতে হয়, কিম্বা সুবিধা থাকিলে তাহার চারিপার্শ্বে নয়াঞ্জুলি খনন করিতে হয়। নয়াঞ্জুলির অপর নাম 'পগার'। নয়াঞ্জুলি বা পগারের দ্বারা দুইটি বিশেষ উপকার হয় ১ম—ভূগর্ভ দিয়া ভূপৃষ্ঠের জল চুয়াইয়া সেই পগারে গিয়া পড়ে, ফলে জমির আর্দ্রতা হ্রাস হয়; ২য়,—পগারের মাটি দ্বারা ভূমিকে উচ্চ করিতে পারা যায়; ৩য়,—অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইতে পারিলে

ছিদ্রপথ মধ্যে অল্পাধিক স্থান হয়, তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং রৌদ্রের উত্তাপ প্রবিষ্ট হইয়া রসকে উত্তপ্ত করিতে পারে, উপরন্তু রসের পরিক্রমণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর—

নয়াঞ্জুলি উদ্ভিদ

নয়াঞ্জুলি যত গভীর হয়, তৎসন্নিহিত জমির মাটি তত অধিক নিম্নদেশ অবধি অল্পাধিক শুষ্ক হইয়া থাকে। মৃত্তিকা আনর্দ্র অথচ সরস থাকিলে উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল হয়। আনর্দ্রতা হেতু মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের মূল সমূহ বহু দিকে ও বহুদূর নিম্নে ধাবিত হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে উদ্ভিদ মাত্রেই অধিক জল আহরণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। নীরস বা অল্পরস মৃত্তিকা মধ্যে তাহাদিগের রসাভাব বিদূরিত হয় না, অগত্যা মূল সমূহকে জলের উদ্দেশ্যে চারিদিকে,—বিশেষতঃ নিম্নভাগে প্রসারিত হইতে হয়। ৩ সংখ্যক চিত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'ক' দুই খণ্ড জমির মধ্যবর্ত্তী পগার ; 'খ' বৃক্ষ সমন্বিত ভূপৃষ্ঠ ; 'ঘ-ক' ও 'ক-ঙ'-ভূগর্ভ ; 'গ-গ' মধ্যবর্ত্তী স্থান বারিস্তর। 'খ-খ' ভূমিখণ্ডদ্বয়ের উপর যে উদ্ভিদ দেখা যাইতেছে, তাহাদিগের মূল 'গ-গ' নির্দ্দেশিত বারিস্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পগারের নিম্নাংশ বারি পূর্ণ। বারিস্তর যে, পুষ্করিণীর ন্যায় জলে পূর্ণ থাকে তাহা নহে, তবে তথায় সমধিক জল থাকে এবং তথাকার মাটি অত্যন্ত রসা ও থস্ থসে নরম হইয়া থাকে।

সুশ্নী, কল্মী, হিংচা পানা, শেওলা প্রভৃতি জলজ এবং ধান্য (আমন ও জলি) পাট প্রভৃতি অর্দ্ধ জলজ উদ্ভিদ ভিন্ন অপর কোন উদ্ভিদ জলমগ্ন বা অর্দ্ধ জলমগ্ন হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সকল গাছের প্রকৃতি সমান নহে,সেই জন্য কোন কোন বৃহৎ বৃক্ষ দুই পাঁচ দশ দিন গোড়ায় জল সঞ্চিতাবস্থায় জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উদ্ভিদগণ বারিস্তরের

উপরিভাগ মাত্র পর্শ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু মূল সমূহ জলে ডুবিয়া থাকিলে গাছ মরিয়া যায়। ভূমি রসাল হইলে মূলগণ তত নিম্নদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ না করিতে পারে। উদ্ভিদগণের একটা সংস্কার আছে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিতে পারে ও তদনুসারে কার্য্য করে, অধিক জলে অসুস্থ হইবার বা মরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে তাহাদিগের মূল সমূহ জলের দিকে না গিয়া অন্যদিকে প্রসারিত হইতে থাকে, আবার জগদীশ্বরের এমন সুন্দর কৌশল যে, উপায়ান্তর হইলে উদ্ভিদগণ যাহাতে সেই রস ভূমিকে অনোপযোগী করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিকে বর্জ্জন শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি সহযোগে ইহারা পত্র-কূপ (pores) দ্বারা রস বর্জ্জন করিয়া জমির রসকে শুকাইয়া লয়। শুষ্কভূমির গাছ রসা ভূমিতে এবং রসা ভূমির গাছ শুষ্ক ভূমিতে কোনরূপে গিয়া পড়িলে অর্থাৎ রোপিত হইলে ক্রমে সে জমি তাহা-দিগের গা-সওয়া হইয়া যায়—তাহারা সে জমিতে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

নালা বা ডোবার সন্নিহিত গাছ-পালার মূল প্রায় দীর্ঘ হয়। ভূমির জল চুয়াইয়া স্থানীয় ডোবায় গিয়া পড়ে, এইজন্য নালা ডোবার যত নিম্নে জল থাকে, তৎসন্নিহিত মৃত্তিকার সরসতা তত নামিয়া গিয়া উভয় জলস্তরের সমতলতা রক্ষা করে। পগারের বা নিকটস্থ জলাশয়ের বারি যত নিম্নে নামিয়া যায় কিম্বা যত শুকাইয়া যায়, ভূমির রস ততই নামিয়া যায়। বর্ষাকালে জলাশয় বা পগারের জল বৃদ্ধি হেতু, ভূমির জল চুয়াইয়া বাহির হইতে পারে না, ফলতঃ ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা অতিশয় রসাল হয়, ভূগর্ভের বারিস্তর উচ্চ হইয়া উঠে অবার বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিপার্শ্বস্থিত নাবাল জমি, নয়াঞ্জুলি, খানা, ডোবা হইতে জল কমিয়া গেলে, ভূমির রস হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বস্থলে নয়াঞ্জুলি বা ক্ষেত্রের মধ্যে পুষ্করিণী থাকা স্পৃহনীয় নহে।

নয়াঞ্জুলির অপকারিতা

রসা-দেশে বা রসা-ভূমিতে নয়াঞ্জুলি দ্বারা উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু উচ্চ প্রদেশে ও উচ্চ ভূমি কিম্বা বেলে ভূমিতে জল নিকাশ হইবার সমধিক ব্যবস্থা থাকিলে ভূমি আরও নীরস হইয়া যায়। ঈদৃশ স্থানের মাটি যাহাতে সরস থাকে তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। জলাশয় বা নয়াঞ্জুলি করা বা না করা, ভূমির ধারকতার উপর নির্ভর করে, ইহা মনে রাখিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। উচ্চ, শুষ্ক, নীরস বা বেলে জমিতে বৃষ্টির জলকে যত ধরিয়া রাখিতে পারা যায় ততই শুভকর। ঈদৃশ জমিতে বা জমির পার্শ্বে খানা ডোবা না থাকাই ভাল। অতঃপর বৃষ্টির তাবৎ জলকে ভূগর্ভে সংরক্ষণের নিমিত্ত গড়েন জমির স্থানে স্থানে আল বাঁধিয়া দিতে হয়, এবং ভূমিকে সমতল ও মৃত্তিকাকে কর্ষিতাবস্থায় রাখিতে হয়। এই সকল প্রণালী অবলম্বন করিলে আকাশের তাবৎ জলই ভূমিতে শোষিত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহা উদ্ভিদের কাজে আইসে। অনেক স্থলে দেখা যায়,—ভূমি স্বভাবতঃ নীরস নহে, কিন্তু পারিপার্শিক কারণে এবং জল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না থাকায় মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায়। মৃত্তিকা সিক্ত বা স্যাঁত স্যঁতে না হয়, অথচ সরস থাকে, ইহা সতত বাঞ্ছনীয়। জমিকে নীরস করা বরং সহজ, কিন্তু মৃত্তিকার সরসতা রক্ষা করা বিশেষ বিবেচনার কার্য্য। এতৎ প্রসঙ্গে আর একটী বিশেষ কথা এই যে, নীরস জমিকে কর্ষিতাবস্থায় রাখা যেরূপ প্রয়োজন, অন্যদিকে মাটিকে অধিক আলগা থাকিতে না দিয়া চাপিয়া দেওয়া সেইরূপ প্রয়োজন। মাটিকে চাপিয়া দিলে যৌগিকাকর্ষণে ধীরে ধীরে রস উপরে উঠে, সুতরাং বহুদিন মাটিতে রস থাকে, কিন্তু আল্‌গা মাটির রস শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সকল রস ফসলের উপকারে না আসিয়া

কতক রসের অপচয় হয়। উচ্চতল প্রদেশের বাগান-বাগিচার কেয়ারি ও গাছের 'থালা' সমূহের জমি, পার্শ্বস্থিত সাধারণ জমি হইতে ২।৪ অঙ্গুলি গভীর রাখা হয়। এতদুপায়ে সেই সকল নিম্নস্থানে অধিক জল সঞ্চিত হয়, তন্নিবন্ধন মাটি সমধিক ও অধিক দিন সরস থাকে। এ প্রণালী সিক্ত বা নিম্নতল প্রদেশে আদৌ চলে না।

নয়াঞ্জলির গভীরতা

গোধূম, ভুট্টা, তিসি, সর্ষপ, প্রভৃতি নানাবিধ ফলের গাছ ও সাময়িক তরি-তরকারির উদ্ভিদ অতি অল্পদিন স্থায়ী। ইহারা ভূগর্ভে বহু দূর মূল প্রসারিত করে না এবং করিবার অবসর পায় না। সচরাচর ইহাদের মূল উপরিভাগের এক বিতস্তি মাটির মধ্যেই প্রায় আবদ্ধ থাকে। একে ত ইহারা অল্পদিন স্থায়ী, তাহাতে শুকা দিনের ফসল। ইহাদিগের আবাদের জন্য মৃত্তিকায় রস থাকা প্রয়োজন, এজন্য ইহাদিগের ক্ষেত্রের পার্শ্বে গভীর—স্থল বিশেষে আদৌ—পগার কাটিবার কোন প্রয়োজন হয় না, বরং তাহা করিলে তৎসন্নিহিত উদ্ভিদের রসাভাব হয়। নাবাল জমিতে পটোল, অড়হর, গাজর প্রভৃতি দীর্ঘমূল ফসলের আবাদ করিতে হইলে, সে জমির পার্শ্বে আবশ্যক মত গভীর পগার কাটায় লাভ আছে। পটলের মূল দেড় বা দুই হাত, অড়হরের মূল দুই হইতে আড়াই হাত দীর্ঘ হয়, সুতরাং ইহাদিগের জন্য অল্লাধিক গভীর পগার কাটিতে পারা যায়। কেবল পগার কাটিলেই যে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা নহে, পগারের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পগার বারমাস জলে পূর্ণ হইয়া থাকিলে জমির জল চুয়াইয়া বাহির হইতে পারে না। স্থানীয় অবস্থা ও ক্ষেত্রস্বামীর উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া পগারের গভীরতা স্থির করিতে হইবে।

পগার ও জলাশয়

এদেশে কৃষকদিগের জমির বিস্তৃতি অধিক নহে, সকলের প্রায় এক বিঘা, দুই বিঘা মাত্র। যদিও কোন কোন কৃষকের অধিক জমি থাকে, তাহাও একত্রে সংশ্লিষ্ট নহে। টুকরা জমিতে নয়াঞ্জুলি করায় লাভ নাই, বরং তাহাতে সহজে যে ফসলের আবাদ হইতে পারে, তাহারই আবাদ করা ভাল। তাহা ব্যতীত, বিস্তীর্ণ সমতল ময়দানের মধ্যে বিস্তীর্ণ জমি থাকিলেও সেখানে পগার কাটায় কোন ফল নাই, কারণ তথাকার পগারের জল বহির্গত হইবার উপায় নাই, তবে প্রকারান্তরে একটী উপকার হইতে পারে যে, পগারের মাটি আনিয়া প্রসারিত করিয়া দিলে জমি উচ্চ হইয়া থাকে। কেবল জমি উচ্চ করিতে হইলে পগার না কাটিয়া জমির কোন স্থানে পুস্করিণী, অথবা সুদীর্ঘ ঝিল খনন করিলে তদপেক্ষা অধিক লাভ আছে, কারণ পুষ্করিণী থাকিলে তাহাতে বারমাস জল থাকে এবং তাহাতে মৎস্য রাখিতে পারা যায়, ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত জল সেচন করিতে পারা যায় ইত্যাদি অনেক উপকার হইয়া থাকে। পগারের দ্বারা সকল উপকার পাওয়া যায় না, বরং ইহা দ্বারা অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। পগারের জল নিকাশ হইতে না পারিলে, সেই জল ক্রমে পচিয়া স্থানীয় বাতাস দুষিত করে। পুষ্করিণী দ্বারা যে তাহা হয় না এমন নহে, তবে পুষ্করিণী লোকে প্রায় পরিষ্কার রাখে। পল্লি-গ্রামে যে এত মেলেরিয়া বিসূচিকা প্রভৃতির প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলীভূত কারণ অস্বাস্থ্যকর পগার, ডোবা, জঙ্গল। নয়াঞ্জুলি থাকিলে জমি আনার্দ্র অথচ সরস থাকে এবং বারিস্তরের নিম্নতাহেতু উদ্ভিদগণ বহু ও দীর্ঘ মূলক হয়, তন্নিবন্ধন বহু রস শোষণ করিয়া উদ্ভিদকে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিশীল করে। মূল অল্প হইলে রস আহরণ অল্প হয়, ফলতঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধিও তদনুরূপ হয়।

যে জমি স্বভাবতঃ উচ্চ কিম্বা রস-ধারণে অক্ষম, সে জমির জল বহির্গত হইতে না দেওয়া ভাল। মৃত্তিকা [illegible]ব্য

উত্তাপ

রস না থাকিলে, তাহাতে উত্তাপ থাকে না। ভূগর্ভে স্বভাবতঃ যে উত্তাপ থাকে, তাহা রসাভাবে কার্য্য করিতে না পারিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে বা ক্রমে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সরস মাটিতেই উত্তাপ পরিক্রমণ করিয়া থাকে, ইহাকে (Circulation of heat) বলে। রস না থাকিলে বায়ুর দ্বারাও কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বণ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি উদ্ভিদ পোষণোপযোগী বাষ্পীয় পদার্থ নীরস মৃত্তিকায় আবদ্ধ হইতে পারে না। সরস মৃত্তিকার সংযোগে আসিলে উল্লিখিত পদার্থ সমুহ রসে আবদ্ধ হইয়া যায়, মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে মাটি উলট্-পালট্ হয়, উপরের শুষ্ক মৃত্তিকা নিম্নভাগে এবং নিম্নভাগের মৃত্তিকা উপরিভাগে আসিয়া পড়ে। একদিকে নিম্নের সরস মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠোপরি আসিয়া বায়ুবাদির ক্রিয়াধীন হয় এবং সংযুক্ত ও আবদ্ধ পদার্থ সমুহ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, অন্যদিকে উপরের শুষ্ক মৃত্তিকা নিম্নদেশে গিয়া শীতোত্তাপ সংযোগে তদন্তর্গত যুক্ত পদার্থ সমূহকে বিগলিত করিয়া উদ্ভিদের ভাবী ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে এবং উপরিভাগের মৃত্তিকান্তর্গত সার পদার্থের নিম্নগামী অংশকে আহরণ করিয়া সারবান হইতে থাকে। ভূমির নিম্নস্তর (sub-soil) একখানি বিস্তৃত শোষক-কাগজ (blotting paper) সদৃশ্য। কর্ষিত মৃত্তিকার নিম্নে প্রসারিত থাকিয়া উপরিভাগের নিম্নগামী পদার্থ সমূহকে তাহা আটক করিয়া রাখে। উপরে যে সার প্রদত্ত হয়, কিম্বা যে সকল পাতা লতা, ফল মূল, মৃত কীট পতঙ্গ বা অপরাপর জীব কিম্বা অপর যে সকল পদার্থ বিগলিত হয়, তাহার কতকাংশ জলের সংযোগে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। এই সকল

দার্থ কর্ষিত মৃত্তিকার ঠিক নিম্নে গিয়া অবস্থান করে। কর্ষিত মৃত্তিকার নিম্নস্থ মাটী স্বভাবতঃ দৃঢ় থাকে, সুতরাং ভূতলাভিমুখী জল পদার্থকে সেই খানেই অবরুদ্ধ থাকিতে হয়।

ভূমির মধ্যে কোনরূপে জল প্রবেশ করিতে না দিলে কিম্বা ভূমি নীরস হইলে মৃত্তিকার যেরূপ ক্রিয়াশীলতা থাকে না, জমিকে জলে প্লাবিত করিয়া রাখিলেও, উহা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সিক্ত ভূমির উত্তাপ কম, উর্ব্বরতাও কম। অনন্তর ভূগর্ভস্থ উত্তাপ কিম্বা উপর হইতে যে উত্তাপের সঞ্চার হয়, তাহা উৎপাদিকা শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ স্বাভাবিক উত্তাপ উদ্ভিদ শরীরে নিয়ত কার্য্য করে, অতঃপর সূর্য্যের উত্তাপ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমোক্ত উত্তাপকে উদ্দীপ্ত করে। বর্ষাকালে মাটি কর্দ্দমাক্ত হইয়া থাকে, ভূপৃষ্ঠে সর পড়িয়া ছিদ্র ও ছিদ্রপথ সমুহকে বদ্ধ করিয়া রাখে,, এজন্য সে সময়ে মাটির মধ্যে ভালরূপে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় না। ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা-কূপের (pores) দ্বার উদ্ঘাটিত এবং ছিদ্রপথ সরস থাকিলে সূর্য্যের উত্তাপ ও যোগাকর্ষণে ভূগর্ভের রস উপরিভাগে আসিয়া বাষ্পাকারে আকাশে মিলিত হয়। এইরূপ আকর্ষণে রস বাষ্পাকারে উপরে উঠিতে থাকে, সুতরাং বাষ্প নির্গমন রোধ হয় না। উপরিভাগের রস উত্তপ্ত হইলে তজ্জাত উত্তাপ নিম্নস্থিত প্রত্যেক বারিকণাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। এইরূপে প্রত্যেক জলকণাকে উত্তপ্ত করিতে করিতে সেই উত্তাপ মৃত্তিকাভ্যন্তরে চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। যে সকল বারিকণা উত্তপ্ত হইয়া উঠে তাহারা লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া উপরিভাগে উঠিতে থাকে এবং বাষ্পরূপে ভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে গিয়া সম্মিলিত হয়। এইরূপে ক্রমাগত হইতে থাকায় মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস থাকে,—মৃত্তিকায় উত্তাপ থাকে। কাজেই

মধ্যে এইরূপে যে উত্তাপ বাহিত হয় তাহাকে রসের বাহিনী শক্তি (conducting power) বলে। উক্ত শক্তির প্রভাবে ভুগর্ভের রস সজীব ও সচঞ্চল থাকে। যে মাটীর রস এইরূপ সচঞ্চল তজ্জাত উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল ও তেজাল হয়,—তাহাদিগের ফলন-ফুলনও সুন্দর হয়!

দশম অধ্যায়

ভূমি অতিশয় শিক্ত থাকিলে ছিদ্রপথ সমূহ রসে পূর্ণ থাকে। এরূপ অবস্থায় তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। দো-রসা মাটিতে রস থাকে অথচ রসের অনাধিক্য হেতু ছিদ্রপথ সমূহের মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে। মাটীর মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট না হইলে উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না। মাটির মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত রসকে সঞ্চালিত করে,—যাবতীয় স্থূল পদার্থ সমূহকে বিশ্লেষিত করে। জলমগ্ন স্থানের উদ্ভিদ যে মরিয়া যায়, তাহার অন্যতম কারণ—মূলগণ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু আহরণ করিবার সুযোগ পায় না। এস্থলে জলজ উদ্ভিদগণ এ নিয়মের অধীন নহে। যাহা হউক—

মৃত্তিকা ও বায়ু

মৃত্তিকার পরমাণু পরস্পরের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ সমূহ হয় জল, না হয় বায়ু, কিম্বা এতদুভয়ে পূর্ণ থাকে। মৃত্তিকা মধ্যস্থ বায়ুব সহিত ভূপৃষ্ঠের বায়ুর ঈষৎ প্রভেদ আছে। ভূমধ্যস্থ বায়ুতে অম্লজান বাষ্প একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত কম থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ কার্ব্বনিক-এসিড বাষ্প ও য়্যামোনিয়া বাষ্প অধিক থাকে। উদ্ভিদ-মূল অম্লজানের কিয়দংশ এবং অপর দুইটী বাষ্প মৃত্তিকা মধ্যস্থিত গলন্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে আহরণ করিয়া থাকে। অতঃপর বিগলিত উদ্ভিজ্জপদার্থজাত নাইট্রিক য়্যাসিড নামক দ্রাবকের সহিত উক্ত অম্লজান সম্মিলিত

হইয়া নাইট্রেট (nitrate) নামক সেরাজান-সম্ভূত লবণ উৎপন্ন করিয়া উদ্ভিদের আহার্য্যের সংস্থান করিয়া দেয়। মৃত্তিকা মধ্যে অধিক বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারিলে অধিক উপকার দর্শিয়া থাকে, এই জন্য মৃত্তিকার প্রাকৃতিক অবস্থা যেরূপ, তন্মধ্যে বায়ুর প্রক্রিয়াও তদানুপাতিক হইয়া থাকে। অকর্ষিত ও কঠিন মৃত্তিকা মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকে, এজন্য মৃত্তিকার কার্য্যকারিতা থাকে না অথবা অতি অল্প থাকে কিন্তু কর্ষিত আল্‌গা ও লঘু মৃত্তিকা মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে, এবং সেই কারণে তাহার উর্ব্বরতা অধিক। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূপৃষ্ঠ অধিক ফাটিয়া থাকিলে কিম্বা অত্যন্ত আলগা থাকিলে তন্মধ্যে অধিক বাতাস প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকা নীরস হইয়া পড়ে।

বায়ুর প্রবেশ পথ।

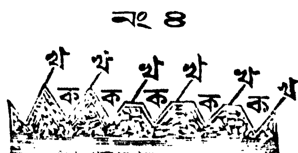
ভূ-গর্ভে যাহাতে বায়ু প্রবেশর পথ সঙ্কীর্ণ না হয় কিম্বা যাহাতে তন্মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটী উপায় আছে। সুচাষ, জল নিকাশের জন্য পয়ঃ-প্রণালী প্রবর্ত্তন, ও দীর্ঘমূল উদ্ভিদ রোপণ,—এই তিনটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। সুচাষ দ্বারা ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়া থাকে, মৃত্তিকা চূর্ণীত হয় ও মৃত্তিকাকে অল্লাধিক চাপিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর, জল-নিকাশের জন্য ভূমির চতুর্দ্দিকে বা স্থানে স্থানে আবশ্যক মত পগার ও পুষ্করিণী খনন করিবার কথাও অধ্যায়ান্তরে বলিয়াছি। পগারাদি দ্বারা জমির অতিরিক্ত রস নিম্ন ভাগে নামিয়া যায়, তন্নিবন্ধন ছিদ্রপথের স্থান অল্লাধিক শূন্য হয়। স্থূল ও দীর্ঘ মুল উদ্ভিদ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় কারণ মূলের স্থূলতা ও দীর্ঘতা হেতু ভূগর্ভ মধ্যে অল্লাধিক শূন্যতা পাওয়া যায়, সুতরাং তন্মধ্যে বায়ু অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে। ধান্য, গোধুমাদি অদীর্ঘ

ও সূক্ষ্ম মূল উদ্ভিদ দ্বারা সে উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু পটোল বা অড়হরের ন্যায় দীর্ঘমূল গাছের শিকড় ২।৩ হাত গভীর মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে সুতরাং ইহারা অধিক দূর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বায়ূ প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ইহাদিগের অনেক শিকড় মাটির মধ্যে মরিয়া পচিয়া গেলেও মাটির মধ্যে অনেক শূন্য স্থানের আবির্ভাব হয় এবং তথায় গিয়া বায়ূ স্থান প্রাপ্ত হয়। মহীলতা, উইচিংড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার কীট, পতঙ্গ ও মূষিক, গন্ধমূষিক প্রভৃতি ভূমির মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া থাকে, ইহাতেও ভূমির মধ্যে বায়ূ প্রবেশের পথ সুগম হয়। সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মূল উদ্ভিদের আবাদ করিলে তাহারা পত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজানা (nitrogen) আহরণ করতঃ মাটির মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যায়,এতদ্দ্বারা মৃত্তিকায় উক্ত পদার্থেরও সঞ্চার হয়।* অপরাপর উদ্ভিদগণ মাটির ভিতরের বায়ূ মূল দ্বারা আহরণ করে, ফলতঃ ইহারা ঘরের জিনিষ খরচ করে, কিন্তু সিম্বীক উদ্ভিদগণ বহির্দ্দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া মাটির মধ্যে সংস্থাপন করে।

উদ্ভিদাণু

ভূগর্ভে বায়ূ প্রবেশ করিতে না পারিলে উদ্ভিদাণুগণ জীবিত থাকিতে পারে না। উক্ত উদ্ভিদাণুগণ বায়ূমণ্ডলের সোরাজান বাষ্পকে আহরণ করিয়া ভূগর্ভে সংস্থাপিত করে সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে উহাদিগের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উহারা যে কেবল বাষ্প আহরণ করে তাহা নহে, মৃত্তিকান্তর্গত জৈবাজৈব নির্ব্বি-

* পত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান আহরণ করিবার শক্তি কেবল সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদেরই আছে। অপরাপর উদ্ভিদগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ বায়ু হইতে মূল দ্বারা উক্ত পদার্থ আহরণ করে। বুট, মটর, কলাই, মাষ-কলাই, অড়হর প্রভৃতি সিম্বী-জাতীয় উদ্ভিদ। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নাম—Leguminosæa.



শেষে সকল পদার্থকে জীর্ণ করিয়া শীঘ্রই উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। এই সকল ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবাণুগণ দ্বারা জগতের কত ইষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মাটির মধ্যে যাহাতে ইহাদিগের বহুল পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। বায়ু হীন স্থানে ইহারা বাঁচিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়

বিজলী

বায়ুমণ্ডলে যেরূপ সর্ব্বদা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বর্ত্তমান, ভূমির মধ্যেও সেইরূপ নিরন্তর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ভূমধ্যস্থ প্রবাহ অতি ক্ষীণ ও ধীর। তাহা হইলেও এতদ্দ্বারা উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলস্থ বৈদ্যুতিক পদার্থ বৃষ্টির সহিত সংযুক্ত হইয়া ভূমিতে আসিয়া স্থান প্রাপ্ত হয়। ভূমির জল শুকাইয়া গেলেও উক্ত বৈদ্যুতিক পদার্থ ভূমির মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিন্তু ভূমি সরস থাকিলে উহা ভূপৃষ্ঠের দিকে নিরন্তর আকৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার কতকাংশ মৃত্তিকা মধ্যে এবং অপরাংশ ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটে বর্ত্তমান থাকে। এতন্নিবন্ধন উদ্ভিদের পত্রগণ বায়ুমণ্ডল হইতে অঙ্গারিক-বাষ্প (Carbonic acid gas) আহরণ করিতে সমর্থ হয়। ফরাসী বৈজ্ঞানিক নলেট ও বার্থিলট (Abbe Nollet ও Abbe Berthelot) বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অতি সহজে নানাবিধ বীজ অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত শক্তি প্রভাবে ভূগর্ভস্থ উদ্ভিদাণুগণ অনু-

প্রাণীত হইয়া উঠে এবং মৃত্তিকান্তর্গত সোরাজানকে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী লবণে (nitrate) পরিণত করিবার সহায়তা করে। কেবল তাহাই নহে। উহারা অনুপ্রাণীত হইয়া অদ্রবনীয় খনিজ পদার্থ সমূহকে এরূপে দ্রবীভূত করিয়া লাবণিক অবস্থায় আনিয়া দেয় যে, তাহা সহজে মূল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্ভিদ রসের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। প্রোফেসর লেমষ্ট্রম (Professor Lem Strom) বলেন যে, বৈদ্যুতিক-শক্তি দ্বারা উদ্ভিদ মধ্যে রস-প্রবাহ দ্রুত হয় সুতরাং উদ্ভিদগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বৃদ্ধিশীল ও তেজাল হয়। বিগত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লেমষ্ট্রম সাহেব বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা গোধুম ও যবের ফলন ১০ গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

বর্ষাকালে নিরন্তর বৃষ্টি হয় বলিয়া ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ বৈদ্যুতিক পদার্থে প্লাবিত থাকে বলিলেই হয়, এজন্য সে সময় উদ্ভিদ মধ্যে রসের প্রবাহ প্রবল থাকে, ফলতঃ উদ্ভিদগণ সে সময়ে যথেষ্ট তেজাল হয়। শীতকালে একে বৃষ্টির অভাব, তাহাতে শৈত্যতা হেতু উদ্ভিদ মধ্যে রস গাঢ় ও সুপ্ত থাকে, এজন্য এ সময়ে উদ্ভিদে তাদৃশ সজীবতা পরিলক্ষিত হয় না। এ সময়ে ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োগ করিতে পারিলে উদ্ভিদের জড়তা বিনষ্ট হয়,—মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিদাণুগণ সমধিক ক্রিয়াশীল হইয়া উদ্ভিদের আহার্য্য প্রস্তুত করণে তৎপর হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে—ফসলের ফলন প্রচুর এবং ফসল পরিপুষ্ট হয়।

কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংযোজিত করিতে হইলে ভূমি হইতে ঈষৎ উচ্চে অথবা ভূমির মধ্যে তারের (Electric wire) টানা দিয়া ফসল-কালে সময়ে সময়ে নিয়মিতরূপে বিদ্যুতের প্রবাহ প্রয়োগ করিতে হয়। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইভ্সায়ের (Eveshaw) বমফোর্ড কোম্পানী (Messrs R & B Bomford) প্রায় ৬০ বিঘা

গোধূম ও যব-ক্ষেত্রে বিজলীর প্রভাবে শতকরা পচিশ ভাগ শস্যের ফলন এবং তদপেক্ষা অধিক খড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুক্ত-রাজ্যের স্থানে স্থানেও গবর্ণমেণ্টের একটী আদর্শ-ক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। প্রবাহ অধিক হইলে গাছ মরিয়া যায়। ভারতবর্ষে আদৌ ইহার পরীক্ষা হয় নাই, অপর কোন দেশে হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই। ভারতে ইদানীং বৈদ্যুতিক আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধনীব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে বাগন-বাগিচায় বা ক্ষেত্রে বিজলী-তার সংযুক্ত করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

মৃত্তিকার সংস্পর্শে জলীয় বা স্থূল—যে কোন পদার্থ আসে, ধরিত্রী তাহাকে স্বীয় গর্ভমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা নিরত এবং স্বীয় সামর্থ্যানুসারে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে তৎপর। মৃত্তিকা মধ্যে এইরূপে নানাবিধ পদার্থ সঞ্চিতাবস্থায় থাকে বলিয়া মানুষের বিনা চেষ্টাতেও গাছপালা প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। বৃক্ষলতাদির মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ফলফুল, বা কন্দ হউক, অথবা জীবদেহাবশিষ্ট মেদ, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, কেশ, নখ হউক অথবা বালি, কাঁকর, চূণ, পটাস, ফসফরস হউক,—মৃত্তিকা সংস্পর্শে আসিবামাত্রই যে উদ্ভিদগণ তাহাদিগকে আহরণ করে তাহা নহে। প্রদত্ত বা আহরিত পদার্থের অতি সামান্য পরিমাণই উদ্ভিদের আপাততঃ ব্যবহারে আসে,—অবশিষ্ট অধিকাংশই মৃত্তিকার সেই ছিদ্রপথ মধ্যে অবরুদ্ধ বা সঞ্চিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তজ্জাত নানা উদ্ভিদের নানা অংশ শুষ্ক ও বিচ্যুত হইয়া আপনা

মৃত্তিকার সংস্থান-শক্তি

হইতে ভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার কলেবর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট করে। এই জন্য—

উদ্ভিদের আহারোপযোগী যে কোন পদার্থ ভূগর্ভে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম,—গলিত অর্থাৎ যাহা আপাততঃ ব্যাবহারোপযোগী ; ২য়,—মধ্য-দশা-প্রাপ্ত পদার্থ অর্থাৎ যাহা অনতিকাল মধ্যেই ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে ; ৩য়,—যাহা দীর্ঘ কাল পরে ব্যবহারোপযোগী হইবে। ভূমির মধ্যে উল্লিখিত তিন প্রকারের পদার্থ প্রতিনিয়ত না থাকিলে আমাদিগকে সর্ব্বদা সারের জন্য ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে হইত ; উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে বর্ত্তমান হইতে সুদূর ভবিষ্যতের পর্য্যন্ত আহার্য্য মৃত্তিকায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া জমিতে সার প্রয়োগ না করিয়াও আবাদ করা চলিতে পারে। ঈদৃশ অবস্থায় মৃত্তিকার স্বাভাবিক গুণাগুণ ও কর্ষণাদির তারতম্য অনুসারে ফসলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল সারের উপর নির্ভর না করিয়া মৃত্তিকান্তর্গত সারের উপর যতটা ভরসা করিতে পারা যায় তাহা করা উচিত। সার প্রয়োগ করিতে পারিলে ত উত্তমই হয়। সুকর্ষণের পর সার সংযোজিত হইলে, 'সোনায় সোহাগা,' হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

সদ্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষি-কার্য্য করা চলে না। ভূগর্ভে উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ সমূহ উল্লিখিত তিন অবস্থায় থাকায় জমিতে গাছটী রোপন করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। উপস্থিত ব্যবহারের জন্য মাটিতে যে পদার্থ প্রস্তুত থাকে, তদ্দ্বারা উদ্ভিদ আপাততঃ জীবন ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইত্যবসরে ক্ষেত্রগর্ভস্থ আশুদ্রবনীয় পদার্থ নিচয় বিগলিত ও বিশ্লিষ্ট

হইতে থাকে, এবং উদ্ভিদের মূলগণও বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইয়া আহারান্বেষণ করে ও লব্ধ পদার্থ আহরণ করিয়া লয়, সুতরাং উদ্ভিদকে আর তাদৃশ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। উক্ত দ্বিতীয় প্রকার পদার্থ খরচ হইবার সঙ্গে তদপেক্ষা স্থূল পদার্থ ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। সুতরাং উদ্ভিদের প্রায় আহারাভাব ঘটে না।

গামলার গাছ।

টবে বা গামলায় যে সকল গাছ রোপিত হয় তাহাতে সারের ফলাফল স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। উত্তম সার সংযোগে মাটী তৈয়ার করিয়া গামলা পূর্ণ করতঃ তাহাতে কোন উদ্ভিদ রোপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গামলার আয়তন অনুসারে তাহাতে যে পরিমাণ মাটী থাকে, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব অনুসারে উদ্ভিদ তাহাতে অল্প বা অধিক দিন জীবিত থাকে, বর্দ্ধিত হয় ও ফল পুষ্প প্রদান করে, কিন্তু যেমন মৃত্তিকান্তর্গত সার পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়, অমনি উহা ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে থাকে। এই সময়ে তাহাতে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা বা সার সংযোজিত করিতে পারিলে উক্ত উদ্ভিদ পুনরায় তেজাল ও মনোরম্য হইয়া উঠে, কিন্তু সে অবস্থায় নূতন মাটী বা সার না দিলে গাছ মরণোন্মুখ হয়—প্রথমতঃ পত্রসমূহ বিবর্ণ হয়, পরে খসিয়া পড়ে, অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। ইহা দ্বারা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্তিকার তাবৎ সারাংশ খরচ হইয়া না গেলেও তাহাতে এরূপ কোন গলিত সার নাই যদ্দ্বারা উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে। জমিতে গাছ থাকিলে শীঘ্র যে তাহার কোন অভাব হয় না তাহার কারণ এই যে, উহার বৃদ্ধির সঙ্গে মূলগণও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া নানাদিক ও দূর হইতে আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করে। টবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে উদ্ভিদকে

টবের মধ্যস্থিত মাটীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। স্বাধীন জীব আপনার আহার ব্যবহারের জিনিষ আপনই সংগ্রহ করিতে পারে কিন্তু অবরুদ্ধকে আহার না যোগাইলে সে অনাহারে মরিয়া যাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এমন ও ঘটে যে, গামলার সমুদয় সারাংশ খরচ না হইলেও তজ্জাত উদ্ভিদ দুর্দ্দশাপন্ন হয়। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নিয়ম রক্ষার জন্য জন-মজুরেরা টবে অল্প জল দিয়া থাকে, তাহার ফলে মাটীর উপরিভাগের ২।১ ইঞ্চ মাত্র সিক্ত হয়, নিম্নাংশের মাটী শুষ্ক ধূলার ন্যায় থাকিয়া যায়। এই প্রণালীতে জল সেচন করিলে উদ্ভিদকে উপরিভাগের সিক্ত মৃত্তিকার উপরই নির্ভর করিতে হয়, নিম্নভাগের রসাভাববশতঃ মূল সমূহ তদ্দেশে প্রবেশ করে না, অধিকন্তু যে সকল মূল ইতিপূর্ব্বে নিম্নাংশে প্রবেশ করিয়াছে তৎসমুদায় ক্রমশঃ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাজেই তাহাদিগের দ্বারা উদ্ভিদের আর কোন কাজ হয় না। নিম্নাংশের মৃত্তিকা সারাল হইতে পারে, কিন্তু শুষ্কতা বশতঃ উদ্ভিদ মূল তাহা হইতে রস কিম্বা সার আহরণ করিতে পারে না। টবের গাছ এরূপ অনেক দেখা যায় যে গাছে যথানিয়মে জল সেচন হইতেছে কিন্তু তাহার বৃদ্ধি নাই, শ্রী নাই,—গাছে পত্রাভাব, পত্রে বর্ণাভাব ইত্যাদি।

মৃত্তিকার শক্তি হ্রাস

কোন এক খণ্ড জমিতে বিনাসারে ক্রমান্বয়ে একই ফসলের আবাদ হইতে থাকিলে দেখা যায় যে, সে জমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে,—ফলন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এরূপ হইবার অনেক কারণ আছে। সকল ফসলই জমি হইতে কিছু সার পদার্থ লইয়া যায় কিন্তু সকল ফসলের আহরণ সমান নহে। সকল ফসলের আহার্য্য পদার্থেরও প্রকার ভেদ আছে। কোন ফসল যবক্ষারজান, কোন ফসল ফস্ফরিক পদার্থ, কোন ফসল পটা স

ইত্যাদি অপর ফসল অপেক্ষা হয়ত অধিক আহরণ করে; কোন ফসল সমধিক রস আহরণ করে। যে ফসল সমধিক যবক্ষারজান-ভক্ত, একই ক্ষেত্রে বারম্বার তাহার আবাদ হইতে থাকিলে মৃত্তিকা মধ্যে যবক্ষারজানের অভাব হইয়া থাকে। প্রয়োজনানুসারে উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্য আহরণ করে। এই কারণ বশতঃ একই ক্ষেত্রে একই ফসলের পুনঃপুনঃ আবাদ করিলে মৃত্তিকা মধ্যে পদার্থ বিশেষের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তজ্জাত ফসল হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভূগর্ভ সার-পূর্ণ বটে, কিন্তু সকল সময়ে তন্মধ্যে সকল পদার্থ সদ্যব্যবহারোপযোগী অবস্থায় থাকে না—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফসল উঠিয়া যাইবার পর ভূমি কিয়দ্দিনের জন্য বিরাম পাইলে ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ষিত হইলে তদন্তর্গত অবিগলিত ও অজীর্ণ পদার্থরাশি বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্ভিদাহারের উপযোগী হইতে পারে। ভূমিকে বিরাম দিবার সুবিধা বা সামর্থ না থাকিলে পর্য্যায় পদ্ধতিতে (Rotation) আবাদ করিলে চলিতে পারে। জমিকে পতিতাবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে কেহ ভাল বাসে না, এই জন্য পর্য্যায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে পর্য্যায়-পদ্ধতি অবলম্বনের কোন আবশ্যক হয় না। যাহারা দীর্ঘকালস্থায়ী ফসলের আবাদ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের ক্ষেত্র দুই চারি বৎসর বা ততোধিক কাল একই ফসলের দ্বারা অধিকৃত থাকে,—জমি খালি হইতে পায় না, অগত্যা সে জমিকে বিরাম দেওয়া অথবা তাহাতে পর্য্যায় মতে অপর ফসলের আবাদ করা চলে না। নানাবিধ স্থায়ী ফলের গাছ, চা, কাফি, রবার, তুঁত, প্রভৃতি বহু বৎসরকাল ভূমি অধিকার করিয়া থাকে। এই সকল আবাদ-ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

এক ফসলের পর অপর ফসলের আবাদকে পর্য্যায়-পদ্ধতি কহে।

পর্য্যায় পদ্ধতি

পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন ফসলের বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের প্রয়োজন এবং তাহাদিগের আহরণ শক্তিও তদনুরূপ—ইহা স্মরণ রাখিয়া কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসলেরআবাদ করা উচিত তাহা বিচক্ষণতা সহকারে নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সংরক্ষিত হয়—নষ্ট শক্তি পুনরাগত হয়—মৃত্তিকার উৎপাদিনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ফলে সকল দেশের কৃষকগণই মোটামোটী একটী পর্য্যায় পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে এবং তদনুসারে বরাবর কাজ করিয়া আসিতেছে। পর্য্যায় ফলে কৃষকের বড় একটা সারের প্রয়োজন হয় না। কৃষক জানে যে, কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল আবাদ করিতে হয়। শিক্ষানবিশের পক্ষে পর্য্যায়ের ফসল নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া বড় কঠিন কথা। স্থানীয় কৃষকদিগের পদ্ধতি অবলম্বন করা শিক্ষানবিশের পক্ষে বিশেষ শুভকর। অভিজ্ঞতার সহিত পর্য্যায়ের মূল-সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, স্বীয় ক্ষেত্র ও তাহার মৃত্তিকা, স্থানীয় আবহাওয়া ও নিজ সঙ্কল্পিত ফসল—এই কয়টীর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রচলিত পর্য্যায়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। যথেচ্ছভাবে ফসল নির্ব্বাচিত হইলে আবাদ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইবার বিশেষ সম্ভবনা।

পর্য্যায়ের বিভিন্নতা

দেশ, কাল, ভুমি ও মৃত্তিকা নির্ব্বিশেষে এক প্রকারের পর্য্যায় পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে না। দেশ অনুসারে আবহাওয়া যেরূপ বিভিন্ন হয়, সেইরূপ ঋতু ভেদে ভুমির অবস্থা রসা বা শুষ্ক হইয়া থাকে; ভুমির স্বাভাবিক অবস্থান ভেদে কোন জমি উচ্চ, কোন জমি নিচু আবার কোন জমি গোড়েন হয়। ঈদৃশ কারণ বশতঃও ভূমি রসা

বা শুষ্ক হইতে পারে। আবার মৃত্তিকা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, কত দেশে, কত স্থানে কত প্রকারের মাটি; চচ্‌চটে গঙ্গা-মৃত্তিকা. কোথাও বেলে বা দোয়াশ, আবার কোথাও ফস্‌ফরিক পদার্থের অভাব, কোথাও পটাসের প্রাদুর্ভাব। এই সকল কারণ বশত যে দেশে ও যে প্রকার জমিতে যে যে ফসল সহজে জন্মে তৎসমুদয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকলদেশের কৃষকগণ আপনাদিগের মনোমত এক একটী পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের পর্য্যায়, আসাম বা নিম্নবঙ্গে যেরূপ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, সেইরূপ হিমালয় সদৃশ হিমপ্রধান দেশের পর্য্যায়, সমতল প্রদেশে চলিতে পারে না। হিমপ্রধান দেশের ফসল সমতল ভূখণ্ডে না জন্মিলে তথাকার পর্য্যায় ও সমতলে কোন ফলপ্রদায়ক হইবে না। এইকারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভূমির প্রাকৃতিকতা ও মৃত্তিকার উপকরণ ভেদে নানা দেশে নানা প্রকারের পর্য্যায়-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্য্যায় ব্যতিক্রম

যাহারা একবারেই পর্য্যায়ের অনুসরণ করিতে পারে না, তাহাদিগের মধ্যে দুই জাতীয় কৃষিকর্ম্মনিরত ব্যক্তি দেখা যায়। এক শ্রেণীর অন্তর্গত—উদ্যানক; অপর শ্রেণীর অন্তর্গত—ফল ও বাণিজ্য-পণ্য-আবাদীগণ। উদ্যানকগণ পর্য্যায়ের পদ্ধতি যে একবারেই অনুসরণ করে না তাহা নহে। উদ্যানে বা সব্‌জী-ক্ষেত্রে উদ্যানকগণ জমির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা প্রকার তরি-তরকারি প্রতি বৎসরই উৎপন্ন করে কিন্তু একই ফসলকে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট চৌকায় না দিয়া ভিন্ন ভিন্ন চোকায় দিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা কৃষকদিগের ন্যায় পর্য্যায়ের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। উদ্যানকগণের পদ্ধতিকে কৃষির নিয়মানুসারে পর্য্যায় বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, উদ্যানকগণ পর্য্যায় পদ্ধতির অনুসরণ না করিলেও, তাহারা স্বস্ব

ক্ষেত্রকে বরাবর সমভাবে উর্ব্বরাবস্থায় রাখে বলিয়া তজ্জাত ফসল বরাবর সমভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষকের অবলম্বন যেরূপ পর্য্যায়, সেইরূপ উদ্যানকের ভরসা—সার। উদ্যানক সারের ভরসা ত করেই, তাহা ব্যতীত জমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করে, মাটির যথেষ্ট পরিচর্য্যা করে। উদ্যানকের ক্ষেত্রের আরও বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে জল সেচিত হয়, ভূমি প্রায় নিস্তৃণতার অধীন থাকে, এবং ফসলের যে কিছু ফল, ফুল, পাতা, মূল, কন্দ, প্রভৃতি স্খলিত হইয়া ভূমি সংযুক্ত হয়, তৎসমুদায় পচিয়া মাটির অঙ্গ পরিপুষ্ট ও উর্ব্বরা করে। এইরূপ নানা কারণে উদ্যানক ও সব্‌জী-জীবীর ক্ষেত্র এত উর্ব্বরা ও লাভজনক। কৃষকের ক্ষেত্র হইতে ফসলের প্রায় সকল অংশই সংগৃহিত হইয়া স্থানান্তরিত হয়, কেবল মাত্র গাছের মূলগুলি মাটির মধ্যে থাকিয়া যায়। আমাদিগের কৃষকের সারের মধ্যে—ছাই। ছাই—যবক্ষারজান-বর্জ্জিত বলিয়া তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের সকল অভাব পূরণ হয় না।

স্বাভাবিক সার

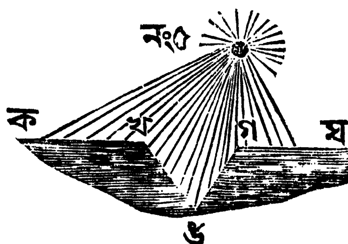
যাহারা দীর্ঘকালস্থায়ী ফসলের আবাদ করে, তাহারা না পারে ক্ষেত্রকে বিরাম দিতে বা উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে, না পারে সার প্রদান করিতে বা পর্য্যায়ের অনুসরণ করিতে। ইহাদিগের ফসল সমুহ পাঁচ সাত বৎসর হইতে ততোধিক কাল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, কাজেই উল্লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করা তাহাদিগের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। দুই চারি বা পাঁচ দশ সহস্র বিঘা ভূমিতে সার প্রদান করা কত ব্যয়সম্ভব ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। স্থায়ী উদ্ভিদে সুবিধা এই যে, তাহাদিগের মূল ভূগভ মধ্যে অধিকদূর প্রবেশ করে, মূলের সংখ্যা অধিক হয়। তন্নিবন্ধন তাহারা ভূগর্ভের বহু দূর হইতে নিজ নিজ ব্যবহার্য্য পদার্থ আহরণ করিয়া জীবিত থাকে। অনন্তর মৃত্তিকাস্থিত যে সকল

পদার্থ উহারা আহরণ করিয়া অঙ্গ পরিপুষ্ট করে, মালিকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা অংশ—ফল ফুল হউক বা পত্র বা নির্যাস হউক—মালিক গ্রহণ করিয়া থাকে, অবশিষ্ট ধরিত্রীতেই স্থান পায়। এই জন্য দীর্ঘাবাদী ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট হইতে পায় না। চা-গাছ প্রতিবৎসর শীতকালে ছাঁটা হইয়া থাকে এবং কর্ত্তিতাংশ—পাতা ও শাখা প্রশাখা—মাটিতে পতিত থাকে ও পচিয়া মাটির সহিত মিলিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে যে আদৌ সার দেওয়া হয় না তাহা নহে কিন্তু সে সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই, কেহ ইচ্ছা করিলে দুই চারি বৎসর অন্তর সার দিয়া থাকে, কেহ বা না দিয়া থাকে। অপরাপর সার অপেক্ষা গাছের স্বীয় অঙ্গচ্যুত পদার্থ তাহার পক্ষে উত্তম সার। আম্রগাছের সার আম্রগাছের পত্রাদি, কারণ যে যে পদার্থে উহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য আবশ্যক তৎসমুদায়, উহা মাটি হইতে আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় তৎসমুদায় পদার্থই বৃক্ষচ্যুত ফল, ফুল, ও পত্রে অবরুদ্ধ থাকে। ভূমিতে পতিত হইলে তৎসমুদায় পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মে বিগলিত হইয়া মূলের ভিতর দিয়া পুনরায় সেই উদ্ভিদেই প্রবেশ লাভ করে। গাছের তলা হইতে পত্রাদি সংগৃহিত হইতে না দিলে তাহাতে সার দিবার তত প্রয়োজন হয় না। পল্লীগ্রামে প্রায় দেখা যায় যে লোকে গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় এবং জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করে। অনেক স্থলে টিকা তৈয়ার করিবার জন্য ও পাতা ব্যবহৃত হয়। অনেক উদ্যানস্বামী গাছের পাতা জমা দিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ আয় হয়, তাহাপেক্ষা গাছের বহুগুণ ক্ষতি হইয়া থাকে। নানা উপায়ে উদ্ভিদগণ আপনাপন অভাব মোচন করিবার সুযোগ পায় বলিয়া সে সকল ক্ষতি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। মৃত্তিকার সামগ্রী মৃত্তিকাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে—এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা

উচিত। ঠিক সেই জিনিষটী ফেরত দেওয়া ঘটিয়া উঠে না বলিয়া সার দিয়া ও সুচাষের দ্বারা সে অভাব মোচন করিতে হইবে। ঈদৃশ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে জমির উর্ব্বরতা যে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বুভুক্ষু ফসল

ইক্ষু, দেব-ধান্য বা গহমা প্রভৃতি কতকগুলি বুভুক্ষু ফসল ভূমি হইতে অত্যধিক পরিমাণে সার পদার্থ ও রস আহরণ করিয়া থাকে! যে ক্ষেত্রে উহাদিগের পুনঃ পুনঃ আবাদ হয়, তাহার উর্ব্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সার অধিক আহরিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না কিন্তু রস আহরিত অধিক হইলে তাহা হইয়া থাকে। কদলী-বৃক্ষ অতিশয় রস-শোষক উদ্ভিদ। উৎকৃষ্ট ও নূতন মৃত্তিকায় রোপিত হইলেও এক বৎসর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে উহারা ভূমিকে একবারে যে ক্ষীণ করিয়া ফেলে তাহা উহাদিগের রসালতা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম বৎসর উহারা যেরূপ তেজাল হইয়া উঠে, পরবর্ত্তী বৎসরে উহাদের আর তত তেজ থাকিতে দেখা যায় না, এইজন্য কদলী-বৃক্ষে পাঁক-মাটি দিবার ব্যবস্থা আছে। শোষণ-শক্তি অধিক বলিয়া উহারা মৃত্তিকা হইতে বহু রস শোষণ করে, ইহাতে মৃত্তিকার রসাভাব হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নীরস মাটি যতই সারবান হউক। উদ্ভিদ তাহাতে ভাল থাকিতে পারে না। এইরূপে মৃত্তিকার যাহাতে বলক্ষয় না হয়, সেজন্য পর্য্যায় অবলম্বন করা উচিত। যে কোন ফসল হউক কেবল যে তাহারা রস-শোষণ করিয়া মৃত্তিকার শক্তি হরণ করে তাহা নহে। ফসল সমূলে কর্ত্তিত হইয়া স্থানান্তরে



গেয়া পড়িলে ক্ষেত্রস্থিত অনেক পদার্থ তাহার সহিত বহির্গত হইয়া যায়। বারিপ্রধান দেশে ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। ক্ষেত্র হইতে যতই সার সামগ্রী চলিয়া যাউক, বারিপাতের সহিত সমূহ পরিমাণে সোরাজান আসিয়া পড়ে। অতঃপর বৃষ্টির জল মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইলে মৃত্তিকান্তর্গত গলনীয় পদার্থ বিগলিত হইবার সুবিধা পায়। বর্ষাকালে উদ্ভিদে নবজীবন সঞ্চারিত হইবার ইহা মূল কারণ। বর্ষাকালে অনেক গাছ মরিয়া যায় কিম্বা জন্মে না বলিয়া এরূপ মনে করা ভ্রম যে, বর্ষাই তাহার কারণ। উদ্ভিদের প্রকৃতিভেদে তাহা হইয়া থাকে।

সঞ্চয়ী ফসল

একদিকে যেরূপ কতকগুলি ফসল দ্বারা মৃত্তিকার শক্তি বিনষ্ট হয়, অন্য দিকে আবার সিম্বী জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ দ্বারা নবশক্তি সংগৃহিত হয়। সিম্বী (Leguminosaea) জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষত্ব এই যে, উহাদিগের মূলে এক জাতীয় উদ্ভিদাণু আশ্রয় লইয়া বাস-স্থান নির্ম্মাণ করে ও তথায় অবস্থান করিয়া মৃত্তিকামধ্যস্থিত বায়ু হইতে যবক্ষারজান আহরণ করে। একটী সিম্বী জাতীয় গাছ—দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছোলা বা মটর গাছ—সমূলে উৎপাটিত হইলে তাহার মূলের স্থানে স্থানে রাই বা সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উহা উদ্ভিদের কোন রোগ বলিয়া লোকের ধারণা ছিল কিন্তু এক্ষণে সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদাণুর আবাস বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত গুলি সমূহের কোনটী সর্ষপবৎ আবার কোনটী মটরের ন্যায় হইয়া থাকে। সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদগণ মূলসংযুক্ত গুলির ভিতর হইতে যবক্ষারজান আহরণ করিয়া থাকে। উক্ত গুলি সমূহকে ইংরাজিতে nodules কহে। এই সকল উদ্ভিদ যবক্ষারজানপ্রধান। অপরাপর উদ্ভিদগণ মৃত্তিকান্তর্গত

হিউমস্ (humus) নামক জৈব পদার্থ হইতে যবক্ষারজান আহরণ করে; সেইজন্য ইহাদিগের আবাদে মৃত্তিকার যবক্ষারজান অধিক ব্যয়িত হয়। জৈব পদার্থ মাত্রেই যবক্ষারজানের আধার, কারণ উক্ত পদার্থ উদ্ভিদই আহরণ করে, কিন্তু সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদগণ ভূগর্ভস্থ বায়ু হইতে উহা আহরণ করে বলিয়া ভূমির নাইট্রোজেন ভূমিতে থাকিয়া যায়, উপরন্তু সেই সকল উদ্ভিদ যাহা আহরণ করে, তাহাও মাটিতে স্থান প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সিম্বীক উদ্ভিদ বিশেষ উপযোগী এবং এইজন্য ইহাদিগকে সঞ্চয়ী বলিতে হয়।

সিম্বীক উদ্ভিদ

উদ্ভিদাণু সহজ চক্ষে দৃষ্টির অগোচর। ইহারা এতই ক্ষুদ্র যে, এক সারিতে রাখিলে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ইহাদিগের দশ সহস্রকে স্থান দিতে পারা যায়। এত নগন্য ও দৃষ্টির আগোচর হইলেও ইহাদিগের কার্য্যকারিতা অপরিসীম। যে জমিতে যবক্ষারজানের অভাব বা অল্পতা অনুভূত হয়, তাহাতে সিম্বী-জাতীয় ফসলের আবাদ করিবার এইজন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। একেইত সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ যবক্ষারজানপূর্ণ, তাহার উপর মূল-সংযুক্ত-গুলিসমেত সেই সকল গাছকে ভূশায়ী করিয়া দিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। পর্য্যায়ের জন্য সিম্বী জাতীয় গাছের প্রসিদ্ধি যথেষ্ঠ। কতকগুলি সিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের নাম এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

মুগ	আতুসী
মসুরি	অপরাজিতা
খেঁসারি	নীল
ভিরিঙ্গী	শণ

বুট বা ছোলা	ধঞ্চে
অড়হর	শোলা
মাষকলাই	মোহন চূড়া (Gold mohur tree)
মাট কলাই বা চীনের বাদাম	কৃষ্ণ চূঁড়া
সীম	বাব্ল বা বারলা
নানা জাতীয় মটর	পলাস
লীম	কাঞ্চন
মাখন সীম	তিঁন্তিড় বা তেঁতুল
বাক্‌লা	সজনা
বরবটী	

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সিম্বী-জাতীয় উদ্ভিদ আছে। যে গাছে সুঁটি হয়, তাহাই যে সিম্বী জাতির অন্তর্গত—তাহা নহে; এই জাতীয় ফুলের গঠন এবং সুঁটীর মধ্যে দানা সমূহের অবস্থান মধ্যে বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগের পুষ্পের গঠন অনেকটা প্রজাপতি সদৃশ। • ইহাদিগের পত্র নিচয় সন্ধ্যা সমাগমে মুদিত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভূমির তল ভেদ

ভূপৃষ্ঠের যতদূর নিম্ন অবধি কর্ষণাধীন, তাহাকে পৃষ্ঠ-ভূমি (Surface Soil) এবং তন্নিম্নস্থিত মৃত্তিকাকে অন্তভূমি (Sub-Soil) বলা যায়। কর্ষণের গভী-

রতানুসারে পৃষ্ঠ-ভূমির গভীরতার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। এ দেশের কর্ষণ প্রায় লঘু বা ভাসা (Shallow) হইয়া থাকে—কদাচ চারি ইঞ্চ অপেক্ষা গভীর হয়। পাশ্চাত্য দেশের কৃষকেরা প্রায় গুরু বা গভীর চাষের (deep) পক্ষপাতী বলিয়া তাহাদিগের জমি ৮।৯ ইঞ্চ গভীর করিয়া কর্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের জমির পৃষ্ঠ-ভূমি সচরাচর প্রায় ৯ ইঞ্চ বা এক বিতস্তি, আর আমাদিগের জমির পৃষ্ঠ-ভূমি ৪।৫ ইঞ্চ বা অর্দ্ধ বিতস্তি হইয়া থাকে। দেশ ভেদে মৃত্তিকা ভেদে, কৃষকের অবস্থা ভেদে কিম্বা প্রয়োজন ভেদে—কর্ষণ লঘু বা গুরু করিতে হয়। যে মাটি রৌদ্রে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিম্বা বারি শোষণ করিতে তাদৃশ সক্ষম নহে, তাদৃশ জমিতে গুরু বা গভীর কর্ষণ দিলে উপকার আছে। যে জমি সহজেই উত্তপ্ত হয় তাহাতে গভীর চাষ দিলে তজ্জাত উদ্ভিদগণের মূল ভূগর্ভ মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করে তন্নিবন্ধন মূলে অধিক উত্তাপ লাগিতে পারে না,—উদ্ভিদেরও রসাভাব হয় না। নদী বা অপর জলাশয়ের সন্নিহিত ভূমি ও বেলে-ভূমি স্বভাবতঃ নীরস হইয়া থাকে কিন্তু সে ক্ষেত্রকে গভীর কর্ষণ দিলে পূর্ব্বমত উদ্ভিদের মূলগণ মাটির ভিতর অধিক দূর প্রবেশের পথ পায়,—রসাভাবের দায় হইতে রক্ষা পায়। অতঃপর আবশ্যক বোধ করিলেও অবস্থার সঙ্কীর্ণতা হেতু কৃষকগণ ভাল লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারে না—ক্ষুদ্র-ফাল লাঙ্গলেই তাহাকে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। কেবল দীর্ঘকাল লাঙ্গল হইলেই হয় না। সেরূপ লাঙ্গল টানিবার উপযোগী বলিষ্ঠ বলদও এদেশে প্রায় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল হলচালনা করিতে হইলে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন এবং বলদকে ভাল করিয়া জাব দেওয়া আবশ্যক।

গরীব কৃষকের সে সব করিবার সংস্থান না থাকায় হেলে-গরু ও পিলে-লাঙ্গল দ্বারা তাহাকে আবাদ করিতে হয়। *

পৃষ্ঠ-ভূমির মৃত্তিকা ঝূরা, সারবান ও রসশোষক হইয়া থাকে। পৃষ্ঠ-ভূমি সর্ব্বদা কর্ষণের অধীন থাকে, তন্নিবন্ধন উপরের মাটি তাদৃশ কঠিন হইতে না পাওয়ায় বায়বীয় পদার্থ তন্মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পায়: বায়ু, বৃষ্টি ও শিশির দ্বারা মাটি নিরন্তর পরিবর্ত্তনের অধীন বলিয়া অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা থাকে। পৃষ্ঠ-মৃত্তিকার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, বহির্ভাগ হইতে যে কিছু জৈব-সার তাহাতে প্রদত্ত হয় বা বায়ু সংযোগে আসিয়া পতিত হয়, তত্তাবৎ উপরিভাগেই স্থান প্রাপ্ত হয়। সারসঙ্কুল হিউমস্ (humus) নামক ত্রৈবাষ্পিক পদার্থ যে কি তাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। পুষ্পের আকার আছে কিন্তু সৌরভের আকার নাই অথচ সৌরভ যে কিছুই নহে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ত্রৈবাষ্পিক (humus) পদার্থ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। জৈব পদার্থ অবয়ববিশিষ্ট, কিন্তু তাহার যাহা সত্ত্ব বা সার তাহা নিরবয়ব। তাহা হইলেও পুষ্পের সৌরভের ন্যায় ইহারও অস্তিত্ব আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পৃষ্ঠ-ভূমির কর্ষিত অংশেই ইহার স্থান বলিয়া উদ্ভিদগণ অধিক নিম্নভূমিতে সহজে আহারের অন্বেষণ করে না।

পৃষ্ঠ-ভূমি

---

* যে গরুতে লাঙ্গল টানে তাহাকে হেলে-গরু কহে। হালের গরু হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ কিম্বা ক্ষীণকায় হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর শেষোক্ত প্রকারের গরু দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া হেলে-গরু বলিলেই আমরা সেই চলচ্ছক্তিহীন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-কায় পশু বুঝি। এস্থলে সেই 'হেলে' শব্দ ব্যবহৃত হইল। 'পিলে' শব্দ ক্ষুদ্র ভাব-ব্যঞ্জক।

উদ্ভিদের আহারান্বেষী সূত্রবৎ মূল সমূহ (fibrovs roots) ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নভাগেই প্রায় বিস্তৃত হয় ও তথা হইতে আহার সঞ্চয় করে। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকার এই অংশে উদ্ভিদাণুগণ বাস করিয়া থাকে। উদ্ভিদাণুগণ ত্রৈবাষ্পিক পদার্থ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে।

অন্তর্ভূমি

অন্তর্ভূমি (Sub-soil) মধ্যে এত সুবিধা নাই। জমির পৃষ্ঠ-দেশ যেরূপ বিস্তারিত ও সমতলবৎ অন্তর্ভূমির পৃষ্ঠ-দেশও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন। অন্তর্ভূমি সার শূন্য—একথা বলি না! উহার মধ্যে যে সারাংশ থাকে তাহা রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টি প্রভৃতির সাক্ষাৎ অধীন নহে। উহার মধ্যে বায়ু বা রৌদ্র সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই হেতু সেখানে উদ্ভিদাণু জন্মিতে পারে না। ঈদৃশ কারণে অন্তর্ভূমি উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থ হইতে বঞ্চিত। উহার মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রায় একেবারেই অভাব, তবে উপরিভাগের মৃত্তিকাস্থিত সারের গলিত কিয়দংশ উহার মধ্যে গিয়া স্থান পায়, কিন্তু উত্তাপাদির অভাবে তদবস্থাতেই থাকে। পৃষ্ঠ-ভূমি কর্ষিত হইবার কালে লাঙ্গলের ফাল ততদূর নিম্নদেশ অবধি প্রবেশ করিলে পূর্ব্ব-সংস্থিত সার বিচলিত হইয়া ক্রমে উপরিভাগের মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও বলি যে, অন্তর্ভূমি উদ্ভিদের ভাণ্ডারস্বরূপ। জলের অতিরিক্তাংশ ও সারাংশের অব্যবহৃতাংশ ক্রমাগত সেইখানেই গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্তর্ভূমি প্রস্তরবৎ কঠিন হইলে, তাহাতে জল বা সার প্রবেশ করিতে পারে না তাহা ব্যতীত পতিত জল উপরিভাগের মৃত্তিকাকে সিক্ত করিয়া জল বহির্গত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে অনেক সার পদার্থও চলিয়া যায়। অন্তর্ভূমির শোষণ শক্তি না থাকিলে এইরূপই ঘটে। পৃষ্ঠ-ভূমির নানাবিধ সুযোগ আছে।

বহু গাছ পালা জন্মে, তাহাদিগের যত মূল, গোড়া, পাতা, ফুল, ফল পড়িয়া পৃষ্ঠদেশের মৃত্তিকাকে উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রাখে। অতঃপর এই সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থজনিত অম্ল দ্বারা উহারা আপনারা দ্রবীভূত হয়, উপরন্তু মৃত্তিকার অগলিত জৈব ও বায়বীয় পদার্থ সমূহও বিশ্লেষিত হইতে থাকে। নিম্ন ভূমিতে এ সকল পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে না। কোন ক্রমে প্রবিষ্ট হইলেও উত্তাপাদির অভাবেও বিগলিত হইতে পারে না। ভূগর্ভমধ্যে গাছের একটি পাতাকে দৃঢ়রূপে পুতিয়া রাখিলে বহুদিন তদবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠোপরি থাকিলে কয়েকদিন মধ্যে তাহার আর অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না।

পৃষ্ঠ-ভূমির গভীরতা

ভূমির উপরিতল বা পৃষ্ঠ-ভূমি শীতপ্রধান অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত গভীর হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—রৌদ্রের প্রখরতা হেতু—গভীর চাষ দিতে হয়। গভীর কর্ষণের ফলে পৃষ্ঠ-ভূমির গভীরতা বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গভীর কর্ষণ দ্বারা উদ্ভিদের মূল সমূহকে অপেক্ষাকৃত অধিক দূর নিম্নে প্রবিষ্ট হইবার উপায় করিয়া দেওয়া হয়। অতিরিক্ত উত্তাপে মূলের রস শুকাইয়া যায়। অনন্তর মৃত্তিকার নিরসতা হেতু মূলগন সমূহ পরিমাণে রস আহরণ করিতে পারে না, অন্যদিকে উদ্ভিদের অঙ্গ-সৌষ্টব দ্বারা মৃত্তিকার রস বহু পরিমাণে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, কিন্তু উপরিতল গভীর হইলে মুলগণ নিম্নদেশে অধিকদূর প্রবেশ করিতে ও সেখান হইতে অধিক পরিমাণে রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত তথাকার উত্তাপের ন্যূনতা হেতু মূলও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে ঠিক ইহার বিপরীত, কারণ তথায় শীতের প্রাদুর্ভাব

হেতু সূর্য্যের প্রখরতা একবারেই থাকে না, বরং যে সামান্য উত্তাপ থাকে তদ্দ্বারা উদ্ভিদের উপকারই হইয়া থাকে। ভূগর্ভের শৈত্যাতাধিক্য হেতু মূলগণ তন্মধ্যে অধিক দূর নিম্নে না গিয়া উপরিভাগেই বিচরণ করে। শীতপ্রধান স্থানে গভীর পৃষ্ঠতল হওয়ায় লাভ নাই বরং ক্ষতিই হয়। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান ও সমতল দেশবাসী, সুতরাং আমাদের পক্ষে ছয় ইঞ্চ হইতে আট ইঞ্চ গভীর উপরিতলের মাটি চাষ-আবাদের জন্য উপযোগী। গরীব কৃষকদিগের পক্ষে এত গভীর কর্ষণের সুবিধা হইবে না জানি, কিন্তু যতটা হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক ফসল গভীর মাটিতে মূল প্রসারিত করে, কিন্তু মাটি আল্‌গা না পাইলে অধিক নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না।

অন্তর্ভূমির গভীরতা

অন্তর্ভূমির গভীরতার কিছু নির্দ্দেশ নাই। উপরিস্তরের নিম্নে যতদূর মৃত্তিকা আছে তাহাই অন্তর্ভূমির গভীরতা। অন্তর্ভূমি গভীর না হইলে কোন জমিতেই বারমেসে উদ্ভিদ ও বৃহৎ বৃক্ষাদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না। উপরিতলের মৃত্তিকা ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তি—ক্ষয়ের অধীন। অনেক সময় মৃত্তিকার শুষ্কবস্থায় ক্ষেত্র হলচালিত বা কুদ্দালিত হইলে কিম্বা তাহাতে খুরপি বা নিড়েন করিলে মৃদু সমীরণেও ভূমি হইতে ধুলারূপে অনেক সার পদার্থ উড়িয়া যায়, প্রবল বৃষ্টিতে ধুইয়া যায় এবং আরও কত কারণে ক্ষেত্রের মাটি ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। অন্তর্ভূমির এ সকল আপদের কারণ নাই। অতঃপর, উপরিতলের মৃত্তিকা রৌদ্র ও বাতাসের সাক্ষাৎ অধীন বলিয়া বারমাস তাহাতে রসের সমতা থাকে না। বর্ষাকালে উহা রসাল বা পঙ্কিল হয়, গ্রীষ্মকালে তেমনই নীরস ও ঝুরা হইয়া পড়ে। অধিক দিন বারিপাত না হইলে ভূ-পৃষ্ঠের ৪।৫ অঙ্গুলি মাটি এত শুষ্ক

হইয়া যায় যে, সে সময় মৃত্তিকা বিচলিত হইলে ক্ষেত্র হইতে অনেক ব্যবহারোপযোগী মাটি ধূলাকারে দিঙ্মণ্ডলে উড়িয়া যায়। এইজন্য অধিক বাতাসের সময় মৃত্তিকাকে বিচলিত করা উচিত নহে। বৃষ্টির সময় ক্ষেত্রের ধোয়াট রোধ করিবার জন্য চাষীগণ আপনাপন জমির চারিদিকে আল দিয়া থাকে। জমি বন্ধুর বা গড়েন হইলে থাকবন্দী করিয়া স্থানে স্থানে আল দিতে হয় নতুবা বৃষ্টির সময় ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম বা লঘু মাটি ও সার বিধৌত হইয়া ক্ষেত্রান্তরে গিয়া পড়ে। এইরূপে জমি ধুইয়া গেলে কেবল যে তাহার সার হ্রাস হয় তাহা নহে, সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ চলিয়া গেলে তাহার উপরিভাগ স্থূল দানাময় হয়। বৃষ্টিতে বা বায়ুতে স্থূল দানা অধিক অপসারিত হইতে পারে না কিন্তু সূক্ষ্ম লঘু দানার উপরেই বায়ু ও বৃষ্টির প্রতিপত্তি অধিক! এইরূপে লঘু-কণিকা বিবর্জ্জিত হইলে ক্ষেত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং উর্ব্বরতার ইতর বিশেষ হয়। উক্ত পরিবর্ত্তন এতই অলক্ষিতভাবে হয় যে, এক আধ বৎসরে তাহা সহজে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না৷ কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি বিচক্ষণ ব্যক্তি চেষ্টা বা লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারেন। মৃত্তিকার লঘুভাগ স্থানান্তরিত হইলে বালুকার প্রাধান্য হয় সুতরাং তাহার প্রকৃতি বালুকাভূমিসদৃশ হইয়া পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু—

অন্তস্থল পৃষ্ঠভূমির দ্বারা আবৃত ও সুরক্ষিত থাকায় উহা হইতে মৃত্তিকার সূক্ষ্ম পদার্থরাশি স্থানান্তরিত হইতে পায় না,—মৃত্তিকা জলপূর্ণ হয় না,—শোষিত জল ক্রমশ নিম্ন দেশে গিয়া আশ্রয় লয় এবং পয়ঃপ্রণালী বা নয়ানুলির সুব্যবস্থা থাকিলে কতক জল বহির্গত হইয়া যায়। নিম্নস্থল অগভীর হইলে অর্থাৎ তাহার অদূর নিম্নে কঙ্কর বা মোটা বালুকাস্তর থাকিলে শোষিত জল তাহার ভিতর দিয়া বহু নিম্নে

গিয়া পড়ে তন্নিবন্ধন উভয় স্তরেই রসের ভাগ কমিয়া যায়। মাটিতে রসাভাব হইলে উদ্ভিদের কত অসুবিধা হয়, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভূগর্ভ উদ্ভিদের অক্ষয় ভাণ্ডার ও রন্ধনাগার স্বরূপ এবং ভূ-পৃষ্ঠ ভোজনশালা স্বরূপ। উক্ত ভাণ্ডার মধ্যে উদ্ভিদের ব্যবহার্য্য প্রায় তাবৎপদার্থই বিদ্যমান থাকিয়া প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হইয়া উদ্ধাভিমুখী হইতেছে। উপরিতলের সামগ্রী সদ্য ব্যবহারোপযোগী, এজন্য তাহাকে উদ্ভিদের ভোজনশালারূপে নির্দ্দেশ করা গেল। উপরিতলের সুপরিচর্য্যা না হইলে নিম্নতলের মৃত্তিকা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না। নিম্নতলের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য উপরিভাগের মৃত্তিকাকে সুকর্ষিত ও সম্বদ্ধ রাখিত হইবে। মৃত্তিকা ঘন বা সম্বদ্ধ থাকিলে ছিদ্রপথের উদ্ভব হয়, তন্নিবন্ধন নিম্নতলের সহিত উপরিতলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। উপরের মাটি অতিশয় ঝুরা ও আলগা থাকিলে নিম্নতল হইতে অতি অল্প রস উপরে উঠে তাহাও শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কিন্তু ভূকর্ষণের পর যথা নিয়মে মদিকা বা চৌকী পরিচালিত হইলে মাটি বসিয়া যায়,—মাটি সম্বদ্ধ ও দৃঢ় হয়। মৃত্তিকার ঘনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য মদিকা অপেক্ষা চৌকী দিবার পর কাষ্ঠ নির্ম্মিত রুল (Roller) দিতে পারিলে আরও উপকার দর্শিয়া থাকে। মদিকা নিতান্ত হালকা বলিয়া তদ্দ্বারা মাটি তত ঘনরূপে বসে না কিন্তু চৌকী তদপেক্ষা গুরুভার সুতরাং তদ্দ্বারা মাটি অপেক্ষাকৃত অধিক চাপিয়া যায়। রুল,—চৌকী অপেক্ষা ভারি ও সর্ব্বস্থানে সমভাবে ভার ক্ষেপন করে, এজন্য রুল দ্বারা মাটি অধিক ও সমভাবে চাপিয়া যায়। মাটি যত অধিক বসিয়া যায় ছিদ্রপথ সমূহ তত সূক্ষ্ম হয় সুতরাং সূর্য্যাকর্ষণে নিম্নদেশস্থ রস অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উপরিভাগে আসে অথচ অপচয় হইতে পায় না এবং সেই জন্য তাদৃশ

মাটিতে গাছের রসাভাব হয় না। এতদ্দ্বারা কাহারও না মনে হয় যে, মাটিকে যৎপরোনাস্তি চাপিয়া দিলে আরও অধিক সুফল দর্শিতে পারে। কর্ষিত মৃত্তিকার উপরিতলেও ঘনতার আবশ্যক, কারণ কর্ষণ-কালে উহার ছিদ্র ও ছিদ্রপথ সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, কিন্তু নিম্নতলের মৃত্তিকা বিচলিত হইতে পায় না, তন্নিবন্ধন ছিদ্রপথ সমুদায় ঠিক থাকে। সেই সকল ছিদ্রপথ নিম্নভাগের জলস্তর অবধি সংযুক্ত। নিম্নতল যত গভীর ও ছিদ্রপথ সমন্বিত হয়, মৃত্তিকা তত রসধারণক্ষম হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভূ-কর্ষণ

ভূ-কর্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মত—গভীর চাষ ভাল, আবার অনেকের মত তাহা নহে, কিন্তু উভয় পক্ষেরই মত যে, উৎপাদিকা-শক্তিকে বজায় কিম্বা বর্দ্ধিত করিবার একমাত্র উপায়—সুকর্ষণ। ভূমি যতই সারবান হউক, তাহাতে যতই সার প্রদান করা হউক, আবাদ করিবার যতই সুবিধা থাক—সুকর্ষণ সকলের মূলাধার। অসম্পূর্ণ চাষ এ দেশে বিরল নহে। প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষেত্রের সকল স্থান সমভাবে কর্ষিত হয় না, মৃত্তিকা ভালরূপ চূর্ণ হয় না, যথানিয়মে চৌকী পড়ে না। এবম্প্রকারের চাষকে নিকৃষ্ট কর্ষণ বলিতে হইবে। সুকর্ষিত ক্ষেত্র সমভাবে কর্ষিত হইবে,—মৃত্তিকা আবীরের ন্যায় চূর্ণ হইবে, কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি—তিন চারি অঙ্গুলি বা ততোধিক স্থান ব্যবধানে হলচালিত হয় ও তাহাতে এক অঙ্গুলি হইতে দুই অঙ্গুলি মাত্র নিম্নের মাটি বিচলিত হয়। সম্মার্জ্জনী দ্বারা তথাকার মাটিকে অপসারিত করিলে দেখা যায়,

স্থানটাকে যেন আঁচড়ান হইয়াছে। বহু কৃষক এইরূপ চাষেই পরিতৃপ্ত হয়। ভূমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করা যে বিশেষ প্রয়োজন, সুচাষের উপরেই যে আবাদের ফলাফল নির্ভরপর, তাহা অনেক কৃষকই অবগত নহে। গভীর-অগভীর চাষের কথা তাহাদিগের নিকট বলা আপাততঃ বাতুলতা বলিয়া মনে হয়। যতই হল্কা বা ভাসা চাষ হউক, সর্ব্বত্র সমভাবে কর্ষিত হইলে তাহা সুচাষের অন্তর্গত হইতে পারে। আঁছড়ান-চাষে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ৪ নং চিত্র দেখিলে তাহাতেই সম্যক উপলব্ধি হইবে। 'ক'-চিহ্নিত স্থান সমূহের উপর দিয়া হলপ্রবাহিত হওয়ায় সেই সকল স্থান ঈষৎ গভীর হইয়াছে। 'ক-ক' পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী খ-চিহ্নিত স্থান আদৌ হলস্পর্শিত না হওয়ায় ভূমি যথাযথ থাকিয়া গিয়াছে। কর্ষণকালে কর্ষিত 'ক' স্থানের কতক মাটি অকর্ষিত 'খ' স্থানে আসিয়া পড়ায় উভয় স্থানকে এককার দেখাইতে পারে কিন্তু এতদ্বারা কোন ফলই হয় না। 'ক'-স্থানের মাটি 'খ'-স্থানে আসিলে 'ক'-স্থানের মাটি কমিয়া যায় অথচ এই অল্প পরিমাণ মাটি 'খ'-স্থানে আসায় শেষোক্ত স্থানে কোনই উপকার হয় না! ঈদৃশ কর্ষণের ফলে অকর্ষিত সমতল খ-স্থানে যে বীজ পতিত হয়, তাহা আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পারে না কিম্বা অঙ্কুরিত হইলেও গাছ বাড়ন্ত বা ফলন্ত হয় না। অতঃপর কর্ষিত 'ক'-স্থানে যে সকল বীজ পতিত হয় তাহা অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু মাটির অল্পতা ও কর্ষণের লঘুতা হেতু গাছ তেজাল হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত কর্ষিত স্থানের মাটিতে অধিক রৌদ্র লাগায় মাটি অপেক্ষাকৃত অধিক শুকাইয়া যায়—ইহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। সমতল ভূমি অপেক্ষা গড়েন, বন্ধুর বা অসমতল ভূমি হইতে যে অধিক রস শুকাইয়া যায়, তাহার কারণ শেষোক্ত জমির উচ্চতা বা গভীরতানুসারে মৃত্তিকার ছিদ্রগণ (Pores)

সূর্য্যের কিরণাভিমুখে থাকে। ৫ম·চিত্রদ্বারা বিশেষ বুঝিতে পারা যায় যে, ক-খ ওগ-ঘ স্থানে যত রৌদ্র ও বাতাস লাগে খ-ঙ-গ-স্থানে তাহাপেক্ষা অধিক রৌদ্রাদি লাগে। ক-খ, খ-গ, গ-ঘ-সমদীর্ঘ, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্থান কর্ষিত হওয়ায় এক্ষণে উহার সীমা খ-গ'র পরিবর্ত্তে খ-ঙ-গ হইয়াছে। অতঃপর ক-খ ও গ-ঘ'র ব্যাপ্তির সহিত খ-ঙ-গ'র ব্যাপ্তির পরিমাণ করিলে শেষোক্ত স্থানের ব্যাপ্তির যে অধিক, তাহা অঙ্কশাস্ত্র-সঙ্গত সত্য। খ-ঙ-গ-স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ থাকিলেও তথাকার মৃত্তিকা কর্ষিত, তন্নিবন্ধন তাহাতে রৌদ্র ও বাতাসের যত অধিক প্রকোপ, 'ক-খ' বা 'ঘ'-স্থানের তত নহে। অতঃপর—

এইরূপ জঘন্যরূপে যে জমি কর্ষিত হয়, তাহাতে অধিক গাছের স্থান হইতে পারে না। বীজ বপিত হইবামাত্র কঠিন সমতল মাটি হইতে প্রতিঘাতে ঠিক্‌রাইয়া নিকটস্থ কোমল স্থানে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এস্থলে কোমল স্থান বলিলে কর্ষিতাংশকে বুঝিতে হইবে। কর্ষিত স্থানে পতিত হইলে প্রতিঘাতভাবে বীজ স্থানান্তরিত হইতে পারে না এইরূপে পতিত হইলে অধিকাংশ বীজই ভাঁওরের মধ্যে গিয়া পড়ে ও সেই স্থানে অঙ্কুরিত হয়, আর উভয় ভাঁওরের মধ্যবর্ত্তী শিরালা অকর্ষিত ও অনুদ্ভিদ অবস্থায় পতিত থাকে। ভাঁওরের মধ্যে যে সকল গাছ জন্মে, স্থানের অপ্রতুলতা হেতু তাহারা সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইতে পায় না, অনেক গাছ লম্বা হইয়া যায়, অনেক গাছ আওতায় পড়িয়া মড়াঞ্চে দশা প্রাপ্ত হয়।*

* কর্ষণকালে যে স্থান কর্ষিত হইয়া যায়, তাহাকে ভাঁওর' কহে। হলপ্রবাহে ভাঁওরের মাটি উভয় পার্শ্বে সরিয়া যায়। যে যে স্থানের উপর দিয়া ফাল প্রবাহিত হয় তাহার উভয় পর্শ্বাস্থ রেখাকে 'শিয়াল' এবং ফালের শেষাগ্রভাগস্পর্শিত রেখাকে 'হাল কহে।

মোটের উপর মাটি সুকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। চারি পাঁচ অঙ্গুলি মাটি সমভাবে সুকর্ষিত হইলে আবাদোপযোগী হইতে পারে। এইরূপ সুকর্ষণের ফলে নিম্নতলস্থ ভূমি সমতলাপন্ন হইয়া উপরিভাগের তাবৎ মাটিকে সমভাবে রস সরবরাহ করিতে পারে। নিম্নতলের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ কোমল অথচ ঘন ও দৃঢ় এবং বিচলিত হইতে না পাওয়ায় বারমাস সমভাবে থাকে। তাবৎ ভাদুই ও রবিখন্দের উদ্ভিদগণ প্রায় অদীর্ঘমূলক হইয়া থাকে। ৪।৫ অঙ্গুলি গভীর মাটি পাইলে তাহাদিগের সকল অভাব মিটিতে পারে। আমন ধান্য জলজ উদ্ভিদ সুতরাং তৎসমন্ধে এ নিয়মখাটে না। যে জমিতে আমন ধান্য রোপিত হয়, তাহা প্রায় অল্পাধিক জলমগ্ন থাকে, তন্নিবন্ধন তথাকার মাটি খুবই কোমল থাকে এবং উদ্ভিদগণ অনায়াসে ভূগর্ভমধ্যে মূল প্রবিষ্ট করিতে সক্ষম হয়। দীর্ঘমূল উদ্ভিদগণের মূল কর্ষিত ভূমির নিম্নতল পাইলে ক্রমে নিম্নদেশে প্রবেশ করিতে পারে। নিম্নতলের মৃত্তিকাকে কর্ষণ করিতে হয় না, তাহাতে সার দিতে হয় না, কিম্বা তাহার অপর কোনরূপ পরিচর্য্যাই করিতে হয় না। ভূপৃষ্ঠের মাটিকে সুকর্ষিতাবস্থায় রাখিবার অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য—নিম্নতলের মাটিকে সজীব বা ক্রিয়াশীল রাখা। ভূপৃষ্ঠের মাটি কঠিন ও 'লাল-চিটে' হইয়া থাকিলে, কিম্বা আগছা দ্বারা পরিবৃত থাকিলে নিম্নতলের মৃত্তিকা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না। ভূগর্ভ উদ্ভিদের খাদ্য খাদ্য-ভাণ্ডার। তথায় উহাদিগের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পদার্থই পাওয়া যায়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, উদ্ভিদের উহা রসায়নাগার স্বরূপ। সকল পদার্থেরই তথায় নিরন্তর বিশ্লেষণ হইতেছে। দুনিয়ার কাহারও নিষ্কর্ম্মা থাকিবার যো নাই, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে নিরত। ভূতগণও নিরন্তর আপনাপন কার্য্যে ব্যাপৃত।

সুচাষ।

সেই ভূতগণই ভূগর্ভ মধ্যে এক জিনিষ ভাঙ্গিয়া অপর জিনিষ গড়িতেছে আসলকে ভাঙ্গিয়া তদন্তর্গত পদার্থ সমূহকে মুক্তি দান করিতেছে, আবার তন্মুহূর্ত্তে তাহাদিগেরই দুই চারি দশটীকে লইয়া নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে প্রতিনিয়ত সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্য না চলিলে মৃত্তিকা মধ্যে সর্ব্বদা সদ্য আহরণোপযোগী পদার্থ কোথা হইতে আসিতে পারে? ভূতগণের একত্র সমাবেশ হইলেই বিশ্লেষণ বা সংযোজন ক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়া থাকে। জমির সুচাষ হইলে উল্লিখিত সুবিধা সকল আপনা হইতে আবির্ভূত হয়। অতিশয় গভীর কর্ষণ হইলে বর্ষাকলে মাটি শুষ্ক হইতে অধিক বিলম্ব হয়, ভূগর্ভের উত্তাপ কমিয়া যায়, সাময়িক পরিচর্য্যারও বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অতঃপর, গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে চারিদিক যেন দগ্ধ হইতে থাকে। সে সময় গভীরকর্ষিত ভূমি হইতে সহজে ও সমধিক পরিমাণে রস শুকাইয়া যায়, তন্নিবন্ধন ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত নীরস হইয়া পড়ে। কেবল যে গ্রীষ্মকালেই এরূপ ঘটে, তাহা নহে। ভূমির অবস্থানী ও মৃত্তিকার উপকরণ ভেদে বর্ষার অব্যবহিত পরে তদ্রূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করা সকল স্থলে শুভকর কিনা? ভূমি ও মৃত্তিকা বিশেষে—কর্ষণের গভীরতা ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। গভীর বা ভাসা চাষে সকল স্থলে যে শুভ ফল হইবে তাহা অনিশ্চিত। সাধারণ চাষের পক্ষে ছয় হইতে আট অঙ্গুলি গভীর করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে কিন্তু প্রতি বৎসর একই প্রকার গভীর করিয়া চাষ করিলে একটী বিশেষ দোষ ঘটে এই যে, নিম্নতল কঠিন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক ঋতু বা এক

বৎসর গভীর, পর ঋতু বা পর বৎসর লঘু চাষ দিলে নিম্নে একটী পাত বা তলা উৎপন্ন হইতে পারে না। সমভাবে, বারম্বার চাষ দিলে কর্ষণাধীন মাটির সহিত পাত-ভূমি ঘনরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে না কারণ প্রতিবারই কর্ষণাধীন মাটি কর্ষিত হওয়ায় তন্নিম্নস্থ পাত ঘর-দালানের মেজের মত কঠিন হইয়া পড়ে,—বৃষ্টির জল তাহার মধ্যে অধিক প্রবেশ করিতে পারে না, উপরন্তু উপরিভাগ যে জল চুয়াইয়া তাহাতে গিয়া প্রবেশ করে তাহা পাতের উপরিভাগ দিয়া ক্ষেত্রান্তরে বা অন্যত্র বহির্গত হইয়া যায়। নিম্নতলের মাটি এঁটেল হইলে আরও বিষম কথা। এঁটেল মাটির পাত কঠিন হইলে তাহাতে বিন্দুমাত্র জল শোষিত হইবে না। উপরের যতই জল নামিয়া যাউক তৎসমুদায়ই হয় চুয়াইয়া নিকাশ হইয়া যাইবে, না হয় অর্থাৎ বহির্গত হইতে না পারিলে উপরিভাগের কর্ষিত মাটিকেও জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সামান্য বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে যে জল দাঁড়ায়, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। পর্য্যায়ক্রমে ক্ষেত্রে গভীর ও লঘু চাষ দিলে কর্ষণাধীন মৃত্তিকার সহিত পাত-ভূমির অতি নিকট সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, এতদুভয়ের ছিদ্রপথ সমূহ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং তখন তাবৎ জলই নিম্নতল মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, কর্ষিত মাটি কর্দ্দমাক্ত হয় না, জমিতে জলও দাঁড়াইতে পারে না। বর্ত্তমান প্রণালীতে কৃষকগণ যে চাষ দিয়া থাকে তাহা নিতান্ত লঘু এবং বরাবর সেইরূপ লঘু করিয়া চাষ দেয় বলিয়া নিম্নের মাটি অধিক রস শোষণ করিতে পারে না, উদ্ভিদের মূল অধিক নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না ফলতঃ সামান্য জলাভাবে উদ্ভিদগণ শীর্ণ হইয়া পড়ে।

ভারতীয় কৃষককুলের ন্যায় পৃথিবীতে আর দরিদ্র কৃষক আছে

কিনা জানি না। ইহারা ভাল লাঙ্গল বা বলিষ্ঠ পশু রাখিতে পারে না, ক্ষেত্রে সার দিবার সঙ্গতি ইহাদের নাই, ক্ষেত্রে জল সেচন করা ইহাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত ব্যাপার। আমাদিগের অধিকাংশ আবাদই শুষ্ক-আবাদের অন্তর্গত। কৃষি বিষয়ে আমাদিগের এত অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও যে এদেশে বিবিধ প্রকারের ও এত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সে কেবল ধরিত্রীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা ও প্রাকৃতিক আনুকুল্যতা হেতু। ইহার উপর সুচাষ হইলে উত্তমই হয়। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে সুচাষই মহামূল্য বা অমূল্য এবং একমাত্র সার। ক্ষেত্রে সার দিব না, সুচাষও দিব না—ইহা বড় সাংঘাতিক কথা। কৃষকগণ ও কৃষি-লিপ্তগণ যাহাতে সুকর্ষণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীর একান্ত কর্ত্তব্য। কৃষির প্রথম ও বিশিষ্ট সোপান—সুকর্ষণ। বিদ্যা বিষয়ে কবি বলিয়াছেন,—

"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

উক্ত অমূল্য সত্যটী সুকর্ষণ সম্বন্ধেও বর্ণে বর্ণে সত্য। ক্ষেত্রকে যত ভাল করিয়া চাষ দিবে, তত তাহার উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হইবে।

নিজ নিজ ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনেকে নানারূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন। অনেকের এরূপ বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, বহুকাল হইতে চাষ-বাস হইতে থাকায় তাবৎ জমি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্রের ফলন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এই ভ্রান্তি বিশ্বাসে তাঁহারা নিজে নিজে নিরাশাভাব ধারণ করিয়াছেন এবং সেই কথা প্রচার করিয়া দশজনকেও সেই পথে আনিতেছেন,—লোকের উদ্যম-উৎসাহকে নষ্ট করিতেছেন। ঈদৃশ

ভ্রান্তিবশে লোকে 'সার' 'সার' করিয়া উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদিগের সামর্থ্য আছে তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া সার দ্বারা ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিতেছেন, অপরে ভগবানের দোহাই দিতেছেন। ধরিত্রীর নিঃস্বতা একবারেই অসম্ভব। শস্য প্রসব করিয়া ধারিত্রীর নিঃস্ব হওয়া সম্ভব হইলে আমাদিগকে বহুকাল পূর্ব্বে এ পৃথিবী ছাড়িয়া চন্দ্রলোক, সূর্য্যালোক দেবলোক বা অপর কোন লোকে গিয়া নূতন ক্ষেত্রের অন্বেষণ করিতে হইত। সার ব্যবহার করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র কর্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া চাই। আবাদ অনাবাদ নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থায় ক্ষেত্রকে সুকর্ষিতাবস্থায় রাখিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎকৃষ্ট কৃষির মূলমন্ত্র—সুকর্ষণ।

মৃত্তিকার যবক্ষারকতা

আলস্য বা ঔদাস্যবশে লোকে সুকর্ষণের পক্ষপাতী হইতে চাহে না বা পারে না। সুচাষের অভাবে কোথাও ক্ষেত্রে রসাভাব হয় কোথাও ক্ষেত্র রসা হয়, ক্ষেত্র আগাছার শান্তিময় আলয় হয়। অসম্পূর্ণ কর্ষণ,ফলে উচ্চ ও বন্ধুর ভূমিতে অধিক জল প্রবৃষ্ট হইতে না পারিয়া অধিকাংশ বহির্গত হইয়া যায়। আকর্ষণ ও অসম্পূর্ণ কর্ষণ ফলে ভূমির রস অধিক শুকাইতে না পাইয়া তাহা সর্দ্দিগ্রস্থ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত আরও কত অনিষ্ট হয় তাহা স্থানান্তরে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে ভূমিকে যতই কর্ষণ করা যায়, ততই উহা নূতন হয়, ততই উহাতে নব শক্তির সঞ্চার হয়। কর্ষণ ফলে মৃত্তিকা মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হইলে তাহাতে যে একটী শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে উৎপাদিকা শক্তি বলিতে পারি, কিন্তু তাহা ভূমির উর্ব্বরতা নহে। উর্ব্বরতা—মৃত্তিকার গুণ বিশেষ। উল্লিখিত শক্তি হইতে উর্ব্বরতা

বিচ্ছিন্ন হইলে মৃত্তিকা নির্ব্বিকার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু নির্ব্বিকার হইলে মৃত্তিকার দ্বারা কৃষির কোন উপকার হয় না। উর্ব্বরতার অন্তরালে একটী জিনিষ আছে তাহাকে যবক্ষার-ক্রিয়া (nitrification) কহে। মৃত্তিকা সঞ্চালিত ও বায়ু সংস্পর্শিত হইলে তাহাতে উদ্ভিদাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর উদ্ভিদাণুগণ মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিজ্জ পদার্থকে যবক্ষারজানে পরিণত করিয়া দেয়। উদ্ভিদাণুর উক্ত শক্তির যবক্ষারকতা মূল। সুকর্ষণাধীন ভূমিতে যত অধিক যবক্ষারকতা দেখা যায়, আচট, অকর্ষিত, বা হেলায় কর্ষিত ভূমিতে তত দেখা যায় না। যবক্ষারকতার ন্যূনাধিক্যানুসারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অল্প বা অধিক হয়। সুকর্ষিত ভূমির যবক্ষারকতা এত অধিক যে, প্রচুর ফসল উৎপন্ন করিয়াও তাহা নিঃশেষিত হয় না। কর্ষণাধীন ভূমিতে যবক্ষারসঙ্কুল পদার্থ স্বভাবতঃই বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা তাহাকে আমাদের কার্য্য সাধনে নিয়োজিত না করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হই,—ঘরে জিনিষ থাকিতে আমরা সার সংগ্রহার্থে অর্থব্যয় করিয়া থাকি। অকর্ষিতক্ষেত্রে যবক্ষারদ প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব নাই কিন্তু কর্ষণাভাবে তৎসমুদায় অকর্ম্মণ্য বা অসাড় অবস্থায় থাকে। ভূমি কর্ষিত হইলে উদ্ভিদাণুগণ সেই সকল স্থূল ও সম্বদ্ধ পদার্থকে চূর্ণ করতঃ যবক্ষারজানসম্ভূত লবণে পরিণত করে। উক্ত লবণ রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদাঙ্গে প্রবেশ লাভ করে।

কর্ষণারম্ভ

গোধুম, সর্ষপ, তিসি, বুট ও অন্যান্য রবি ফসল সংগৃহিত হইবার পর, অর্থাৎ ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে কুদ্দালের প্রথম আঘাত পড়ে। পর বর্ষে আবাদের এই সূত্রপাত। রবি ও ভাদুই ফসলের মধ্যে ইহা অতি

দীর্ঘকাল। ভাদুই ও রবি ফসলের মধ্যে ক্ষেত্র পরিচর্য্যা করিবার এত অধিক সময় পাওয়া যায় না। এই জন্য কোন কোন কৃষক রবি ফসলের ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কোপাইয়া দেয়। এ সময়ে জমি বড় কঠিন হইয়া থাকে সুতরাং হলচালনা করা আদৌ চলে না। এ সময়ে জমি কোপাইয়া দিলে ঘাস জঙ্গলাদি সমূলে মরিয়া যায়। তাহা ব্যতীত সে সময়ে মধ্যে মধ্যে যে বৃষ্টি হয়, তাহার সমুদায় জল ভূগর্ভে স্থান পায়। এ সকল ক্ষেত্রে আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে প্রায় কোন ফসলের আবাদ হয় না। এজন্য কৃষকগণ কুদ্দালিত মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দিতে ব্যস্ত হয় না, কারণ তাহারা জানে যে, সেই সকল চাপ বৃষ্টিতে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইবে, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভাঙ্গিয়া হলচালনা করে। যাহা হউক, কৃষকগণ যে এতদিন পূর্ব্বে চাপ ভাঙ্গে না বা হলচালনা করে না, তাহা একটি মঙ্গলের বিষয়। এ সময়ে মাটি ভাঙ্গিয়া ভূকর্ষণ করিলে মাটি চৌরস হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়া আরব্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে যবক্ষারক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ফসলহীন ক্ষেত্রে যবক্ষারজান উৎপন্ন হইতে থাকিলে তাহা কোনই কাজে আসে না, উপরন্তু যোগা-কর্ষণ বাষ্পের সহিত বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। ক্ষেত্রের জিনিষ এরূপে অপব্যয় হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কর্ষণ ও বপন

বীজ বপন করিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে ঢেলা ভাঙ্গিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে বড় ক্ষতি হয় না, তবে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৈবক্রমে সে সময় বৃষ্টি হইয়া মাটি কাদাটে হইয়া গেলে 'যো'-কালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহা হউক, এ সময়ে, ক্ষেত্রে সাধ্যমত সুচাষ দিতে হইবে, এবং ঢেলা যত ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মদিকা বা চৌকী দিলে জমি চৌরস হয়, উপরি-

ভাগের মাটিকে ধুলার ন্যায় দেখায় কিন্তু তদবস্থায় একবার হলচালনা করিলে শত শত ছোট বড় ঢেলা দেখা দেয়। চোয়া-ঢেলা তদপেক্ষা অধিক বিপদজ্জনক। কুদ্দালিত ক্ষেত্রের ঢেলা-ভাঙ্গা একটি বিশেষ কার্য্য। খুদ্দালিত ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে, ঢেলা সমুদায়কে কোদাল দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিবার পরে যে সকল ছোট ঢেলা থাকিয়া যায়, তাহা-দিগকে মুদ্গর সাহায্যে চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এক্ষণে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিলে ক্ষতি নাই। সচরাচর দীর্ঘে ও প্রস্থে হলচালিত হইয়া থাকে। মাটিকে আবীরের ন্যায় করিতে হইলে, সেই সঙ্গে কোণা-কোণী চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। যত অধিক চাষ দেওয়া যায়, মাটি তত ধুলায় পরিণত হয়, মাটির জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, প্রত্যেক দানার ক্লতিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভূমির যবক্ষারকতা বৃদ্ধি করিবার ইহাই অমোঘ উপায়, কিন্তু সকল কৃষক এত কষ্ট স্বীকার করে না। অতি অল্প কৃষকেই জমি কোপাইয়া থাকে। ইহারা বারিপাতের জন্য অপেক্ষা করে এবং বীজ বপনের দিন সন্নিকট হইলে যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করিয়া ক্ষেত্রের কর্ষণকার্য্য সমাধা করে। সে প্রণালী এ মহার্ঘের দিনে চলিবে না। দুষ্ট গাভী নিজ বৎসকেও সহজে দুগ্ধদান করে না। ধরিত্রী প্রায় তদনুরূপ। দুগ্ধবতী হইয়াও ধরিত্রীমাতা সন্তানদিগকে সহজে দুগ্ধ দিতে চাহেন না, এজন্য পীড়ন করিয়া দুগ্ধ আদায় করিতে হইবে—ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে ধরিত্রী আর দুগ্ধ লুকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কর্ষণকার্য্য অবি-চ্ছিন্নভাবে ও যথারীতি করা কর্ত্তব্য। একদিন হলচালনা করিয়া কিছু দিন ক্ষেত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় কর্ষণ করিতে গেলে নূতন ভাবেই কর্ষণ করিতে হয়। উপর্য্যুপরি কর্ষণাদির দ্বারা ক্ষেত্রের কর্ষণকার্য্য শেষ করা ও শেষ চাষের অব্যবহিত পরেই বীজ বপন করা উৎকৃষ্ট

আবাদের প্রধান অঙ্গ। বিচ্ছিন্নভাবে ও অনর্থক বিলম্ব করিয়া মধ্যে মধ্যে চাষ দিলে পূর্ব্ব চাষের উপকারিতা নষ্ট হয়,—জমির 'হাল' কাটিয়া যায়।* জমিতে 'হাল' থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় না এবং ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানে সমভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়। বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করা যে দোষাবহ ও ক্ষতিকর তাহা ভারতবাসী প্রাচীন কাল হইতে অবগত আছে। মহামুনি পরাশর মহাশয়ের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়ঃ—

"ছিন্নরেখা ন কর্ত্তব্যা যথা প্রাহ পরাশরঃ।
একা তিস্রস্তথা পঞ্চ হলরেখা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখা (চাষ) ছিন্নভাবে (মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়া) করিবে না। এক, তিন ও পাঁচটী হলরেখা কথিত হইয়াছে।

অধিক চাষ দিলে অধিক ফসল হয়, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"একা জয়করী রেখা তৃতীয়া চার্থসিদ্ধিদা।
পঞ্চমাখ্যা তু যা রেখা বহু শস্য প্রদায়িনী॥"

অর্থাৎ একটী রেখা বা চাষ জয়যুক্ত, তিনটী রেখা প্রয়োজনসিদ্ধি, আর পাঁচটী রেখা বহু শস্য প্রদায়িনী।

সাধারণতঃ কৃষকগণ—ভদ্র ক্ষেত্রস্বামীগণও—পাঁচ চাষ দূরের কথা, তিন চাষ ও দিতে পারে না। ইহাই হইল আমাদিগের কৃষির অবনতির মূল কারণ। প্যাটের আবাদ বৃদ্ধি—দেশের দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের কারণ নহে; ক্ষেত্রের ফলন কমিয়া যাওয়া প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। অতএব ফলন বাড়াইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

* 'সরসতা' শব্দ গ্রাম্য ভাষায় 'হাল' শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

—:০:—

ভূপৃষ্ঠের সমতলতা, উচ্চতা, নিম্নতলতা, বা গড়েন স্বভাবের উপরেও মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সচরাচর সমতল ভূমি সকলের প্রিয়। ইহাতে যে বারিপাত হয়, তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত হয় ও শোষিত হয়,—অধিক বৃষ্টি হইলে জলের টানে মাটি ধুইয়া যাইতে পারে না এবং ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানে সমভাবে বায়ু সঞ্চালিত ও সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারে। উল্লিখিত নানা স্থবিধা হেতু সমতল ভূমির সর্ব্বস্থানে রস ও উত্তাপের সামঞ্জস্য থাকে, সর্ব্বস্থানের মৃত্তিকা সলশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত সমতল ভূমিকে কর্ষণ করিতে কৃষাণের ও হলবাহী পশুগণের বড় কষ্ট হয় না, স্থতরাং তাহরা অধিকক্ষণ ও ভাল রূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

সমতল ভূমি

পারিপার্শ্বিক জমি অপেক্ষা যে জমি উচ্চ, তাহা অনেক ফসলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোল-আলু, রাঙ্গা-আলু, পটোল, তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, কার্পাস, মান প্রভৃতি তাহাদিগের মধ্যে গণ্য। রসা জমিতে ঈদৃশ ফসলের আবাদ করিলে ফসলের প্রকৃতি ও ফলনের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। আশু ও বোরো ধান্য, পাট, মাড়ুয়া, ভুট্টা প্রভৃতি রসাল জমিতে ভাল থাকে, উচ্চ জমি তাহাদিগের পক্ষে তত স্থবিধাজনক নহে। উচ্চ জমিতে যে সকল ফসলের আবাদ করিতে হয়, তাহারা দীর্ঘ মূলক হইলে ভাল, কারণ

উচ্চ-ভূমি

দীর্ঘতা হেতু মূলগণ ভূগর্ভ মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। উচ্চভূমিজাত উদ্ভিদগণের মূল পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের সাধারণ পৃষ্ঠভাগ কিম্বা পৃষ্ঠভাগের কর্ষিত মৃত্তিকার নিম্নতল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলে যথোচিত পরিমাণে রস প্রাপ্ত হয় না। উচ্চ ভূমির জল চুয়াইয়া ক্ষেত্রান্তরে নামিয়া যায় এবং উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ দিয়া সূর্য্যাকর্ষণে রস শুকাইয়া যায়। এই দুই কারণে উচ্চ ভূমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া থাকে। সমতল ভূমিতে সূর্য্যের কিরণ কেবল উপরিভাগে (Surface) পতিত হয় এবং উপরিভাগ দিয়াই রস শুকায়, কিন্তু উচ্চ ভূমির রস পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব—উভয় দিক দিয়া শুকাইয়া যায়। সমতল ভূমির রস পার্শ্ব ভাগ দিয়া অধিক নিকাশ হইতে পায় না। তাহা ব্যতীত উপরিভাগ ভিন্ন অপর কোন দিক দিয়া তাহার রস শোষিত হইতে পারে না, কাজেই সমতল জমির রসালতা অধিক ও সমভাবাপন্ন। ঈদৃশ জমিতে স্বভাবত যে সকল আগাছা জন্মে তাহারা প্রায় দীর্ঘ মূল হয় এবং মৃত্তিকা মধ্যে অধিক দূর পর্য্যন্ত মূল প্রবিষ্ট হইয়া রস ও খাদ্য আহরণ করিতে পারে। উদ্যানের পক্ষে এ প্রকারের জমি স্পৃহনীয়। ঈদৃশ জমিতে বার মাস রস রাখিতে হইলে উদ্ভিজ-সারের বিশেষ প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জ পদার্থ রস শোষণ ও ধারণ করিতে বিশেষ সক্ষম। পৃষ্ঠভাগের মৃত্তিকা ঝুরা রাখিতে পারিলে উচ্চ শুষ্ক জমিতেও রসাভাব হয় না।

নিম্নভূমি

উচ্চভূমি-পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে চারিদিক হইতে জল আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং বহির্গত হইবার উপায়াভাবে বর্ষার তাবৎ জল ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল সঞ্চিত হইয়া থাকে। বর্ষা অতীত না হইলে প্রায় তাহার জল শুকায় না। ইহাকে 'কোল' জমি কহে। কোল-জমির বারি-তর অতি নিকট নিম্নে অবস্থিত। তাহা ব্যতীত পারিপার্শ্বিক উচ্চ জমির জল নামিয়া সেই বারিস্তরে গিয়া

আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু বারিস্তরের জলাধিক্য হেতু তদুপরিস্থ মৃত্তিকা সর্দ্দিময় হইয়া থাকে। উক্ত অতিরিক্ত বারি নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না, ফলতঃ বায়ু ও সূর্য্যাকর্ষণে না শুকাইলে অন্য রকমে সে জল নিঃশেষিত হয় না। জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হইলে, উহা অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেত হইয়া থাকে। ঈদৃশ জমি আমন ও জলি ধান্যের বিশেষ উপযোগী। যে সকল নিচু ক্ষেতের জল কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শুকাইয়া যায়, তাহাতে রবিখন্দ অতি উত্তম জন্মিয়া থাকে। মাটির সরসতা ও সারালতা তাহার বিশেষ কারণ। নিচু জমির এতাদৃশ সারাল হইবার কারণ এই যে, ধোয়াটের সহিত তথায় অনেক সার—উদ্ভিদের সদ্যব্যবহারোপযোগী সার আসিয়া পড়ে। নিম্ন ভূমির জল শুকাইয়া রবিখন্দের উপযোগী হইতে কিছু বিলম্ব হয়। যে জমির জল শুকাইতে পৌষ মাস ও অতীত হইয়া যায় তথায় রবি ফসল করিবার সময় পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ঈদৃশ জমি বিরল নহে। তথায় কেবল একটী মাত্র ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটী মাত্র ফসল হউক, কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা দুই ফসলের আয় হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অনেক স্থানে নৌকারোহণে গিয়া ধান্য কর্ত্তন করিতে হয়। এ সকল জমি ধান্যের জন্য প্রশস্ত এবং তাহাতে ধান্যেরই আবাদ হইয়া থাকে।

বিল

সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে বিল—কোন কোন দেশে 'বিলান'—কহিয়া থাকে। উল্লিখিতরূপে ভরাট হইয়া আবাদোপযোগী হইলে তাহা 'বাদা' নামে অভিহিত হয়। সাগর-সন্নিহিত সৈকত, বাদা ও বিল লাবণিক হইয়া থাকে বিলভূমি বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় ও চারিদিক হইতে ধোয়াট আসিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। বিলে প্রায় একটীর অধিক ফসল হয় না এবং সে ফসল—রবি।

বিলে বহু মৎস্য আসিয়া পড়ে। কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে সুবিস্তীর্ণ বাদা ও বিল আছে তাহাতে রাশি ও বৃহৎ বৃহৎ ভেটকী, গল্‌দা চিংড়ী, পার্শে, পায়রাচাঁদা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মৎস্য জন্মে এবং কলিকাতার সকল বাজারে তাহাদিগের যথেষ্ট আমদানী হয়। যাহা হউক, চারিদিকের ধোয়াট আসিয়া পড়ায় বিলের মাটি এঁটেলের ন্যায় ঘন ও ভারি হইয়া থাকে। বিল-ভূমি স্বভাবতঃ এত সারাল যে, তাহাতে আদৌ সার দিতে হয় না, অধিকন্তু সে মাটি আনিয়া অন্য ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে শেষোক্ত প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। বিল ভূমিতে রবি ফসল এবং শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকালের তরি-তরকারির আবাদ হইতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই তাহাতে জল সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এজন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বিলভূমিকে একবার চষিয়া দিলে তজ্জাত তাবৎ উদ্ভিদ—ডাল-পালা মূল, পাতা প্রভৃতি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা ও কোমলতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। অতঃপর বিলের জল একবারে শুকাইয়া গেলে যথানিয়মে কর্ষণাদি করিয়া আবাদ করিতে হয়।

বাদা

বিল চিরদিন বিল থাকে না, ধোয়াটের জলে ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসে। পরিত্যক্ত বা গভীর বিলে প্রতি বৎসর হিংচে, সুস্নী, কল্মী, শর, শালুক, পদ্ম প্রভৃতি নানা জাতির জলজ উদ্ভিদ জন্মিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ভরাট করিয়া তুলে। ভরাট বিল বা বাদা অতিশয় উর্ব্বরা ভূমি। তাহাতে যে সকল শাক-সব্জী উৎপন্ন হয় তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কলিকাতার সন্নিহিত বিলের অধিকাংশ এক্ষণে বাদায় পরিণত হওয়ায় তাহাতে নানা ফসলের আবাদ হইতেছে। তজ্জাত তরি-তরকারি বাজারে আসিলে অপর তরি-তরকারির দিকে লোকে বড় তাকায় না। একে উহা সারাল

জমি, তাহাতে আবার কলিকাতা সহরে তাবৎ আবর্জ্জনা প্রতিদিন পতিত হইতেছে। এতদুভয় কারণে কলিকাতা-বাদার এত উর্ব্বরতা। উক্ত বাদা Salt Lake নামে অভিহিত। শুদ্ধ তাহাই নহে—

অনেক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের জল বর্ষার পর শুকাইতে থাকিলে তৎ-সন্নিহিত অল্পাধিক জমিতে যাহারা রবি ফসলের কিম্বা শীত বা গ্রীষ্মের ফল মূল বা তরি-তরকারির আবাদ করে তাহারা প্রভূত লাভবান হইয়া থাকে। উল্লিখিত তীরবর্ত্তী স্থান বর্ষাকালে অধিক জলমগ্ন না হইলে আমন ধান্যের পক্ষে বড়ই উপযোগী। মুরসিদাবাদের সুবিখ্যাত মতিঝিল ও আফজালবাগের সম্মুখস্থ বিলে এবং দ্বারভাঙ্গার হাড়াই-ঝিলের পাদদেশে আমন ধান্যের আবাদে বিঘা প্রতি ১৫।২০ মন ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে,—বিচালী ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কিনা-রার জমিতে অধিক দিন জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না অথচ উহা সমধিক সারাল ও রসাল। এই দুই কারণে এবম্প্রকার জমির এত অধিক উর্ব্বরতা। কলিকাতার ৮।১০ ক্রোশ দক্ষিণে জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলে যে বাদা আছে, তাহাতেও সমূহ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে উক্ত বিল সকল নদী গর্ভ ছিল বলিয়া মনে হয়।

কুড়ি ও জোল

যে নিম্নভূমির চতুর্দ্দিক উচ্চভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাকে 'কুড়ি' কহে। কুড়ি বিস্তৃত হইলে 'জোল' নামে অভিহিত হয়। কুড়ি ও জোল—পার্ব্বত্য প্রদেশেই পরিদৃষ্ট হয়। মধুপুর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি পাহাড়ী দেশে অনেক জেলায় দেখা যায়। যে যে কারণে বিলের জমি উর্ব্বরা হয় জোলের জমিও সেই সেই কারণে উর্ব্বরা হয়। জোল অতিশয় গভীর ও আবদ্ধ না হইলে তাহাতে ভাদুই ও রবি—দুই ফসলেরই আবাদ হইতে পারে। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম ২।১ পসলা বৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া রাখিতে

হয় এবং বর্ষার সুত্রপাত হইলেই তাহাতে রোয়া ধান্যের আবাদ করিতে হয়। ইহাতে বপন-আবাদ চলে না, কারণ বপন করিবার পর জোলে ক্রমশঃ জল সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাতে হয় বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, কিম্বা অঙ্কুরিত পোয়ালি সহসা জলবৃদ্ধি হেতু ডুবিয়া যায়।

গড়েন জমি

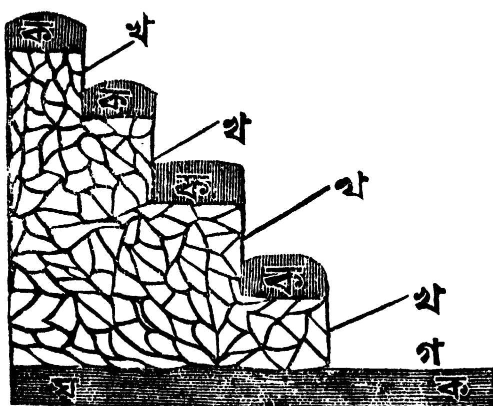
গড়েন জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু জমিতে ফসল থাকিলে কিম্বা তৃণ জঙ্গল থাকিলে অথবা কর্ষিতাবস্থায় থাকিলে অল্পাধিক জল ভূমিতে শোষিত হইতে পারে, কিন্তু কি পরিমাণ জল শোষিত হইতে পারে, তাহা ভূমির ঢালুতা, মৃত্তিকার শোষকতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ঢালু অধিক হইলে জলের বেগ অধিক হয় ফলতঃ জল সবেগে নিম্নাংশে ধাবিত হয় এবং তাহার ফলে মাটি ধুইয়া যায় ও ধোয়াট জলের সঙ্গে মৃত্তিকার সূক্ষ্ম দানা ও গলিত সার পদার্থ সমূহ পরিমাণে নামিয়া যায়, তন্নিবন্ধন তাহাতে মোটা দানা অর্থাৎ বালুকা বা কঙ্করের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং জমি সারহীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে। উচ্চ জমি অপেক্ষা গড়েন জমির উপরে সূর্য্যের প্রকোপ অধিক। গড়েন জমির বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি অধিক এবং তাহার পৃষ্ঠদেশ অধিক পরিণামে প্রকাশিত থাকে। এই দুইটী বিশেষ কারণবশতঃ উহাতে সূর্য্যের কিরণপাত অধিক হয়, ফলতঃ মাটি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ঢালুতাজনিত দোষ নিবারণ কল্পে কৃষকগণ প্রায়ই আপনাপন ক্ষেত্রকে আল দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। ঢালুতা ঈষৎ হইলে ক্ষেত্রকে আল পরিবেষ্টিত করতঃ উচ্চাংশের কতক মাটি কাটিয়া নিম্নাংশ দিয়া সমতল করিতে পারিলে চলিতে পারে, কিন্তু অধিক গড়েন হইলে কেবল আল দ্বারা সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে জমিকে 'থাকবন্দী' করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রকে সোপানাবলীর ন্যায় 'থাক্‌বন্দী' করিবার প্রথাকে Terracing কহে। 'থাক্‌বন্দ' প্রবর্ত্তন করিলে ঢালুতা দোষ বিদূরিত হয় এবং ক্ষেতের জল উচ্ছলিত হইতে অথবা বেগে পবাহিত পারে না। 'থাক্‌বন্দ' ভূমির প্রতি থাক্ বা সোপানের পৃষ্ঠভাগ সমতল এবং থাকের পার্শ্বদেশ আল ও প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত থাকে, সুতরাং জল তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাহাতেই শোষিত হয়। উপরে যে প্রাচীর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সোপানের উর্দ্ধতা মাত্র। এক সোপানের বহির্ভাগস্থ উর্দ্ধতা অপর সোপানের প্রাচীরের কাজ করে। ইহার ভিতরাংশ উক্ত প্রাচীর এবং বহির্ভাগ ঈষদুচ্চ আল দ্বারা সংরক্ষিত। উহাতে বৃষ্টির জল পতিত হইলে একদিকে যেরূপ তাহা সত্বর পরিশোষিত হয়, অন্যদিকে সেইরূপ বহির্ভাগস্থ পার্শ্বদেশ দিয়া চুয়াইয়া নিম্নবর্ত্তী সোপানে গিয়া পড়ে, আবার কতক জল ভূগর্ভমধ্যেও প্রবিষ্ট হয়। থাক্‌বন্দী ভূমির জল উক্ত দুই প্রকারে ভূপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া গিয়া মাটিকে রসহীন করিয়া দেয় অনন্তর উপরিভাগ দিয়া ও দুই প্রকারে রস বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায় :—১ম,—সোপানাবলীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া ; ২য়,—বহিষ্পার্শ্বদেশ দিয়া। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, থাকবন্দী জমির রস চারি প্রকারে বহির্গত হইয়া যায়। কৃষকের পক্ষে ইহা বিশেষ ভয়ের কথা। সকল বিষয়েই অন্যদিক আছে। ভূপৃষ্ঠের জল যতই ভূগর্ভে নামিয়া যাউক বা পার্শ্বদেশ দিয়া চুকাইয়া বাহির হউক, অথবা ভূপৃষ্ঠ ও সোপান পার্শ্ব দিয়া বাষ্পাকারে চলিয়া যাউক, মাটি একবারে নীরস হইতে পায় না। জমি আবাদী অবস্থায় পৃষ্ঠতলস্থ মাটির লঘুতা হেতু যোগাকর্ষণ দ্বারা নিম্নতল হইতে রস ক্রমাগত উপরে উঠিতে থাকে এবং সেই রস মাটিকে সর্ব্বদা সরস রাখে। রস যত শুকায় তত তাহার যোগান হয়। অতঃপর

থাকবন্দী

সোপান হইতে জল মাটির মধ্যে নামিবার অথবা ভূগর্ভ হইতে রস উপরে উঠিবার কালে সমগ্র মাটিকে সিক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে মাটি সবল থাকিলে সোপানের পার্শ্বদেশ দিয়া রস, বহির্গত বা আকর্ষিত হইবার কালে সোপানান্তর্গত মাটিকে সরস করিয়া দেয়, ফলতঃ মাটি কিছুতেই শুকাইতে পায় না। নিম্নে 'থাকবন্দ' জমির একটি চিত্র দেওয়া গেল।

৬ নং চিত্র



চিত্রস্থিত 'ক' চিহ্নিত সমতল স্থানগুলি থাক বা সোপনের উপরিভাগ; 'খ' চিহ্নিত স্থানগুলি প্রাচীর; 'গ' সর্ব্বনিম্নস্থিত স্বাভাবিক সমতল; 'ঘ' বারিস্তর। চিত্রস্থিত যে সকল আঁকা বাঁকা জালবৎ রেখা দেখা যাইতেছে উহারা মৃত্তিকার ছিদ্রপথ। ছিদ্রপথ সমূহ ভূপৃষ্ঠ হইতে বারিস্তর পর্য্যন্ত কোন না কোন রকমে সংযুক্ত। অনেক ছিদ্রপথ প্রাচীর দিকে লম্বিত। বৃষ্টির জল সেই সকল ছিদ্রপথ অবলম্বন করিয়া বারিস্তরাভিমুখী হয়। সে সকল ছিদ্রপথ সোপানের প্রাচীরাভি-

মুখী, তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী রস রসাকারে বা বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া থাকে।

অসমতল ও গড়েন জমি প্রায় পার্ব্বত্য দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সকল দেশেই জমিকে থাকবন্দী করিয়া লোকে চাষ আবাদ করে। থাকবন্দী জমি সরস থাকিলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। সোপানাবলী সোপানের ন্যায় প্রকৃতই সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাতে হলচালনা করিতে ও চৌকি বা মদিকা পরিচালিত করিতে বড় অসুবিধা হইয়া থাকে। হলচালনাদির সুবিধার্থ 'থাক' সমূহকে বিস্তৃত করিতে পারা যায় না, কারণ তাহা ভূমির স্বাভাবিক ঢালুতার উপর নির্ভর করে। ঢালুতা যত অধিক হয়, সোপানের পরিসর বা প্রশস্ততা তত অল্প হইয়া থাকে। ক্রম-ঢালু জমির সোপান প্রশস্ত হইতে পারে।

থাকের বহিস্পার্শ্ব ঈষৎ ঢালু থাকা ভাল, নতুবা পার্শ্বদেশ ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায় ও সর্ব্বদা মেরামত করিতে হয়।

তরাই

পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশস্থ ভূভাগকে 'তরাই' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তরাই প্রদেশে প্রতি বৎসর পাহাড়ের ধোয়াট আসিয়া পড়ে। সেই জন্য তরাইয়ের মাটি অতিশয় উর্ব্বরা। তরাই ভূমি উর্ব্বরা ত বটেই তাহা ব্যতীত রসাল। তরাই জমি প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ থাকে, তন্নিবন্ধন তথাকার মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ-পদার্থের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তরাই প্রদেশ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর স্থান। হিমালয় পদপ্রান্তে জলপাইগুড়ি জেলার তরাই বিস্তীর্ণ ভূভাগ এবং তাহাতে চা'র আবাদ হয়।

চর

বর্ষাকালে জল নামিয়া গেলে নদীগর্ভের স্থানে স্থানে চর দেখা দেয়। উক্ত চর ক্রমশঃ উচ্চ ও বিস্তীর্ণ হয় এবং যত পুরাতন হইতে থাকে, তত আবাদের উপযোগী

হয়। চর জমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা কিন্তু প্রথমাবস্থায় সকল ফসলের উপযোগী নহে। চরের মাটি খুব সূক্ষ্ম হইলেও তাহাতে জৈব-পদার্থের অল্পতা বা অভাবহেতু আপততঃ বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। পুরাতন চরে যে সকল ফসলের আবাদ হইয়া থাকে তৎসমুদায় প্রায় ঔদ্যানিক ফসলের অন্তর্গত। ধান্য গোধূমাদি কৃষিফসলের পক্ষে বালুকাপূর্ণ চর জমি বড় সুবিধা জনক নহে। চর জমির মাটি—বালি বা বালি প্রধান। প্রথমাবস্থায় উহাতে ফুটি, কাঁকুড়, তরমূজ, রাঙ্গা-আলু প্রভৃতির আবাদ হয়। ইহাদিগের উদ্ভিজ্জাবিশিষ্ট ও নানাবিধ স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি গলিত হইয়া মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের সমাবেশ করিয়া দেয়। এইরূপে যত দিন যায় তত তাহার কলেবর পরিপুষ্ট হইতে থাকে কিন্তু বর্ষাকালে উহার জলমগ্ন হইবার সময় উত্তীর্ণ না হইলে তৎসমুদায় সঞ্চিত পদার্থ তাহাতে স্থায়ী হইতে পারে না। অপর ঋতুতে যে কিছু সার সঞ্চিত হয়, তাহা বর্ষাকালে বিধৌত হইয়া যায়। অতঃপর উদ্ভিজ্জ পদার্থের অল্পতা বা অভাব হেতু চর অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে কিন্তু তরমূজাদি লতিকা জাতিয় আবাদ করিলে লতিকা প্রসরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে ঢাকিয়া রাখে, ফলতঃ ভূমির পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত হইতে পারে না।

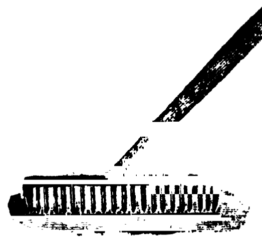
সৈকত

নদীতটস্থ বালুকাময় ভূখণ্ডকে 'সৈকত' কহে। সৈকত ভূমির প্রকৃতি—চর সদৃশ। বর্ষাকালে উহা ডুবিয়া যায় এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে নদীর জল নামিয়া গেলে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। নূতন সৈকত ক্ষেত্রে চরের ন্যায় তরমুজ ফুটি, কাকুড়, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি নগণ্য ফসলের আবাদ হয়, কিন্তু দীর্ঘকালের পুরাতন সৈকত জল উঠিতে না পারায় উহা আবাদী জমিতে পরিগণিত হইতে পারে। তাহা হইলেও বালুকতা

হেতু উহাতে মেঠো ফসলের আবাদ হইতে পারে না। বালুকতা হেতু একেই ত উহার মাটি নীরস, উত্তাপহীন ও বাঁধনহীন, তাহার উপর নদীভাগস্থিত ভাঙ্গড়ের * গাত্র দিয়া ক্ষেত্রের বহু পরিমাণ রস চুয়াইয়া বহির্গত হইয়া যায়। এ প্রকার জমির ধারকতা বড় কম বা নাই বলিলেও চলে।

ষোড়শ অধ্যায়

—:o:—



দিক সম্বন্ধ

পাহাড় ও পাহাড়িয়া জমির ঢালু নানাদিকে কিন্তু যে সকল পার্শ্ব পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তৎসমুদায় উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক অপেক্ষা অধিকক্ষণ ও অধিক পরিমাণ রৌদ্র পায় বলিয়া অধিক উর্ব্বরা হইয়া থাকে। পাহাড়ের অনেক ঢালুতে আদ্রৌ রৌদ্র পৌছে না। এই সকল স্থানের স্বাভাবিক উষ্ণতা কম হইয়া থাকে। ভূমির উচ্চতা ও সম্মুখতা বা সদর দিগ্বিশেষের প্রাকৃতিকতার

সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে স্থানীয় ভূমির প্রকৃতি মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা দারজিলিং, শিলং, মসুরী বা সিমলা পাহাড়ে গিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিলে নিশ্চিত দেখিয়া থাকিবেন যে, উত্তরাভিমুখী ঢালু দিকে কত জাতীয় ফার্ণ, মস্ লাইকোপোডিয়াম, বিগোনিয়া, অর্কিড প্রভৃতি গুল্ম প্রচুর জন্মিয়া থাকে কিন্তু দক্ষিণাভিমুখী ঢালু ভাগে তৎসমুদায়ের বড়ই অভাব। অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ততদূর না গিয়া নিজ নিজ বাটীতে থাকিয়াও উদ্ভিজ্জতার বৈষম্য দেখা যাইতে পারে। ঘর বাড়ীর সন্নিহিত পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগের উদ্ভিদ হইতে উত্তর দিগের উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি ও শ্রী সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র। কালের প্রখর রৌদ্রে প্রথমোক্ত দিক সমূহের উদ্ভিদগণ—বিশেষতঃ কোমল প্রকৃতি উদ্ভিদগণ—যেন ম্রিয়মাণ ও লাবণ্যহীন হইয়া থাকে কিন্তু উত্তরভাগের সেই সেই গাছ কিরূপ বৃদ্ধিশীল ও লাবণ্যময় তাহা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, ভূমির বন্ধুরতার সহিত দিগ্বিশেষের কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সমতল ভূমির সকল স্থানে সমভাবে সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি পতিত হইয়া থাকে কিন্তু বন্ধুর স্থানে তাহা হয় না। বন্ধুরতার যে ভাগ সূর্য্যমুখীভাবে (at right angles) অবস্থিত তাহাতে যত অধিক রৌদ্র লাগে, অপরভাগে তাহা হয় না। এই জন্য বন্ধুর জমির সকল স্থান সমভাবে রৌদ্র পায় না, সকল স্থানের মৃত্তিকা সমভাবে উত্তপ্ত হয় না। জীব শরীরে যেরূপ তাপ আছে। ভূমির মধ্যে তাপমান যন্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহার উষ্ণতা (temperature) বুঝিতে পারা যায়। উষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র তাপমান যন্ত্র (Thermometer) ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। দিগ্বিশেষে যে কেবল ভূমির ভিতরে উত্তাপের ইতরবিশেষ হয় তাহা নহে, ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু মণ্ডলের অবস্থারও ইতর

বিশেষ হইয়া থাকে। অনেক উদ্ভিদই দিগ্‌বিশেষের আলোক ও উত্তাপ যে ভালবাসে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দিক হেতু মৃত্তিকায় উত্তাপ ও ভূপৃষ্ঠে আলোকের ইতরবিশেষ হইলে উদ্ভিদগণকে তাহার ফলভোগী হইতে হয়। বন্ধুর ভূমির উত্তরমুখী ক্ষেত্রে আলোক ও উত্তাপ কম বলিয়া তজ্জাত উদ্ভিদ আওতাজাত গাছের ন্যায় লম্বা হয়, অবয়ব পলকা হয় এবং শক্ত ও পরিপক্ক হইতে যেরূপ বিলম্ব হয়, তাহাতে ফুল ফল জন্মিতে ও বীজ সুপক্ক হইতে সমূহ বিলম্ব হয় কিন্তু রো-পিঠে স্থানের উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকার ও ঝাড়াল হয়, তাহার শাখা-প্রশাখা পরিপুষ্ট ও শক্ত হয়, উপরন্তু ফল ফুল শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র পরিপক্ক হয়।

সৌর শক্তি

সূর্য্যকিরণ মধ্যে উত্তাপ ও আলোক—এই দুইটী জিনিষ আমরা দেখি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত উহাতে একটী শক্তি বিশেষ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সংসারের বহু কার্য্য সমাধা করিতেছে। উক্ত ছৌর-শক্তি (Actinism) আলোক ও উত্তাপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৌর-শক্তি বৈদ্যুতিকতার মূল। উহা হইতেই বৈদ্যুতিকতা উৎপন্ন হইয়া বায়ুমণ্ডল ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং বায়ুমণ্ডল হইতে ভূগর্ভে বিস্তৃত হইতেছে। সৌর-শক্তির বৈদ্যুতিকতা দশম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সৌরিকতার অপরাপর গুণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—

আকর্ষণ

আকর্ষণ বা শোষণ শক্তি। পৃথিবীতে যতই রসের সঞ্চার হউক, যতই বারিপাত হউক, সূর্য্যের উক্ত শক্তি দ্বারা তাহা পরিশোষিত হইতে পারে। একদিকে যেরূপ পরিশোষণ কার্য্য চলিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ জলের সংস্থান

হইতেছে বলিয়া পৃথিবী শুষ্ক ধূলায় পরিণত হয় নাই। সৌরশক্তির আকর্ষণ গুণে রসের অতিরিক্তাংশ আকর্ষিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে গিয়া পৌছিতেছে এবং বায়ু সাহায্যে নানাদিকে ও নানা দেশে গিয়া শিশির বা বারিরূপে পুনরায় ভূমিতে আসিয়া স্থান পাইতেছে। সূর্য্যের উক্ত অপহৃত হইলে কোন দেশ জলাকীর্ণ, আবার কোন দেশ রসাভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইবে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পৃথিবীতে যত বারিপাত হয় কিম্বা পৃথিবীতে যত জল আছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে এবং সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলই চিরদিন চক্রবৎ দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে।

রৌদ্র ও মৃত্তিকা

ছায়া ও আলোক, শৈত্যতা ও উত্তাপ, ইহারা মৃত্তিকার কার্য্যকারিতার অনুকূলে বা প্রতিকূলে নিরন্তর কর্য্যে করিতেছে। জগৎসংসারের এমনই নিয়ম যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রই স্থানীয় আবহাওয়া ও প্রাকৃতির অবস্থানুসারে পরিচালিত হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও আবহাওয়া বিশেষে বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা ও গুল্ম সৃজিত হইয়াছে। যেখানে যে উদ্ভিদ নিজ বাসোপযোগী স্থান পাইতেছে সেইখানে সে আপনা হইতে জন্মিতেছে। আমরা তাহাদিগের স্থিতি, বৃদ্ধি ও ফলন-ফুলন দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি। ছায়া বা আওতায় গাছ দীর্ঘ ও কোমল হয় কিন্তু রোদ পীঠে যায়গার উদ্ভিদগণ সেরূপ না হইয়া অপেক্ষাকৃত ছোট ও কঠিন হয়, ইহার দৃষ্টান্ত অবিরল নহে। বড় বড় বৃক্ষের নিম্নে যে তৃণ জন্মে তাহা কত দীর্ঘ ও কোমল হয়, কিন্তু মাঠ-ময়দানে তৃণ কি সেরূপ হয়? আবার বহু জাতীয় উদ্ভিদ অল্পাধিক ছায়ায় বা আওতায় ভাল থাকে; তাহারা সূর্য্যের তীব্র আলোক ও প্রখর কিরণ সহ্য করিতে পারে না। বারমাস ক্ষেত্র সমুদায়কে শষ্যশালিনী অবস্থায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি-

দেবী বৎসরের মধ্যে কয়েকবার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন—ইহাই ঋতুভেদের কারণ। সমগ্র গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্য ও পৃথিবীরও একটী নির্দ্দিষ্ট গতি আছে। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, কখন উত্তরায়ন হইয়া থাকে।* সূর্য্য যখন দক্ষিণভাগে থাকেন, তখন পৃথিবীতে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এবং যখন উত্তরভাগে থাকেন, তখন শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালের আবির্ভাব হয়। দক্ষিণায়নকালে পৃথিবীর অতি নিকটেই সূর্য্যদেব থাকেন বলিয়া এ সময়ে পৃথিবীতে রৌদ্রের প্রখরতা ও আলোকের বৃদ্ধি পায় এবং অধিকক্ষণ থাকেন বলিয়া উত্তাপের পরিমাণ অধিক হয় ও রাত্রিকাল ছোট হয়; কিন্তু উওরায়ণ কালে পৃথিবী হইতে সূর্য্য দূরে থাকেন, ও পৃথিবীতে অল্পক্ষণ প্রকাশিত থাকিতে পারেন। এই দুই কারণবশতঃ সে সময় দিবাভাগ সমধিক ছোট হয়, এবং রৌদ্রের তেজ ও স্থায়ীত্ব কম হয়। সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তনের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর আবহাওয়া (climate) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে—ইহাই প্রদর্শন করা। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কি বায়ুমণ্ডল, কি ভূগর্ভ,—এতদুভয়ই সূর্য্যের গতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যে স্থানে যত অধিক রৌদ্র সে স্থানের উত্তাপ তত অধিক। সূর্য্যের গতির সহিত পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে পৃথিবীতে একমাত্র ঋতু বিদ্যমান থাকিত, অধিক কি, তাহা হইলে

* বিষুব-রেখার (Equator) দক্ষিভাগে সূর্য্যের যখন গতি হয়, তখন দক্ষিণায়ন, এবং বিষুব-রেখার উত্তর ভাগে যখন গতি হয়, তখন উত্তরায়ন হয়। প্রতি নয় মাস অন্তর (২৩শে মার্চ্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) সূর্য্য একবার বিষুব-রেখা অতিক্রম করেন। উক্ত দুই তারিখে দিবারাত্র সমান হয়। ২৪শে মার্চ্চ হইতে ক্রমে দিন বড়, ও রাত্রি ছোট হইতে থাকে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ক্রমে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হইতে থাকে।

হয়ত ঋতু শব্দেরও সৃষ্টি হইত না, জীবগণকে শীত গ্রীষ্মের অধীন হইতে হইত না এবং এত প্রকার উদ্ভিদেরও সৃষ্টি হইত না। পৃথিবীর অবস্থা বার মাস এক ভাবাপন্ন হইলে হয়ত সকল দেশে বার মাস ধান্যাদি বর্ষার ফসল কিম্বা গোধূমাদি রবি ফসল উৎপন্ন হইতে পারিত। এ স্থলে—

ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা

দেশের স্বাভাবিক উচ্চতা (altitude) বিবেচনার বিষয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে। দেশ বিশেষের আবহাওয়ার বিভিন্নতার ইহাও একটী বিশেষ কারণ। সমুচ্চ পর্ব্বতোপরি স্বভাবজাত শত শত জাতির উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে কিন্তু সে সকল উদ্ভিদ সমতল দেশে (Plains) ভাল থাকে না কিম্বা আদৌ বাঁচে না। দারজিলিং, শিলং, মসুরী প্রভৃতি সমুচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে শীত অধিক বলিয়া গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের গাছ-পালাকে তথায় রাখিতে হইলে নানাবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারা দারজিলিং ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, তথাকার বোটানিক গার্ডেন মধ্যে সাসিনির্ম্মিত সুবৃহৎ গৃহ মধ্যে নানাবিধ সুরম্য পুষ্পাদির মনোহর উদ্ভিদ সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং তথায় থাকিয়া সেই সকল উদ্ভিদ সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে ও পুষ্প প্রদান করিতেছে। আজকাল সমতল দেশের অনেক বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্যানে দুই একটী তাদৃশ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গৃহ মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই নির্দ্দিষ্ট আবৃত স্থান মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে পালন করা। যাহা হউক, সমুদয় পর্ব্বতোপরি যে এত শীতের প্রাদুর্ভাব,—উচ্চতা তাহার অন্যতম কারণ। ভূতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভূতল হইতে যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ু তত লঘু ও বায়ুমণ্ডলের অবস্থা তত

শীতময়। ব্যোমযান আরোহীগণও একথা বলিয়া থাকেন, এবং সেই জন্য ব্যোমযানে আরোহণ করিবার সময় আরোহীগণ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া থাকেন। ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক উচ্চতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভৌগলিকগণ সমুদ্রের বারিপৃষ্ঠকে (Sea level) ভিত্তি-স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবীর—কি সমুদ্র, কি ভূগর্ভ—সকল স্থানের জল সমতল। হিমালয় হইতে গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদী নানা দেশ, অরণ্য, অধিত্যকা ভেদ করিয়া দিবারাত্র হু-হু করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—কেবল সমতল পাইবার জন্য। যে মুহূর্ত্তে প্রবাহিনী গিয়া সমুদ্রের জলে মিশিবে, সেইক্ষণ হইতেই উহার আর বেগ দেখা যাইবে না। কূপ বা পুষ্করিণী খননকালে আমরা পাতাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা করি, তাহার কারণও সমুদ্র পৃষ্ঠের অনুসরণ করা। এই স্থান স্পর্শ করিতে পারিলে আর জলের অভাব হয় না। বঙ্গভূমি সমুদ্রের অতি সন্নিকটে ও অতি নিম্ন ভূমি বলিয়া সচরাচর কূপ খননকালে ৮।১০ হাত বা তদপেক্ষা কম নিম্নে জল পাইয়া থাকি, কিন্তু সমুদ্রকূল হইতে যত দূর উচ্চ দেশে যাই, দেখিতে পাওয়া যায়, তত আধক গভীর করিয়া খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না। সকল জলাশয় যে, অত গভীর করিয়া খোদিত হয়, তাহা নহে। অগভীর জলাশয়ের জল চতুর্দ্দিকস্থিত ভূমির চোয়ান জল কিম্বা বৃষ্টির জল। ভূগর্ভ মধ্যে বৃষ্টির জল শোষিত হইয়া ধীরে চুয়াইয়া এই সকল জলাশয়ে আসিয়া পড়ে এবং সঞ্চিত জল ভূগর্ভস্থ বারিস্তরের (water level) সহিত সমতল হইবার পর আর উচ্চ হইতে পারে না। সময় বিশেষে অধিক জল খরচ করিলে ঈদৃশ জলাশয়ের জল নিঃশেষিত হইয়া যায়, পরে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলে পুনরায় চারিপার্শ্ব হইতে জল চুয়াইয়া আসিয়া সেই শূন্য স্থানকে পূর্ণ

করে। এইরূপে চুয়ানকে percolation কহে। ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে যখন পাতাল স্পর্শিত হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের সমতলে কিম্বা, সমুদ্র সুদূর হইলে, নিকটস্থ নদ নদী বা দীর্ঘ জলাশয়ের বারি-পৃষ্ঠের সমতলে পৌছিয়াছি। ভূমির উচ্চতা কিরূপে বুঝিতে পারা যায় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এ সকল কথা বলিতে হইল। এক্ষণে দেখা যাউক—

ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার সহিত মৃত্তিকার কি সম্বন্ধ। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার সহিত আবহাওয়ায় যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অতঃপর আবহাওয়ার সহিত মৃত্তিকার যে সম্বন্ধ তাহাও আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, উচ্চতায় যেরূপ আব-হাওয়ার পার্থক্য হয়, সেইরূপ মৃত্তিকা মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়ারও তার-তম্য হয়। পাহাড়ের জমি বর্ষা মাত্রেই অল্লাধিক ধুইয়া যায়, সেই সঙ্গে সমূহ সূক্ষ্ম সার পদার্থ ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়। শৈল প্রদেশে বারিপাত অধিক, তুষারপাতও প্রচুর, এমন কি, কোন কোন বৎসর তথায় ২।৪ বা ততোধিক দিন সমগ্র স্থানই তুষারে আবৃত হইয়া থাকে। অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ প্রায় বার মাস তুষারাবৃতাবস্থায় থাকে—কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলাগিরি তাহার নিদর্শন। শীতের প্রাধান্য হেতু তথায় কোন ফসলের আবাদ হইতে পারে না। এরূপ স্থান প্রণী ও উদ্ভিদ বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। সেই সকল দেশে শীতের প্রকোপ বশতঃ মৃত্তিকান্তর্গত দ্রব্যনীয় পদার্থ বিগলিত হইতে বিলম্ব হয়। মৃত্তিকা মধ্যে উত্তাপের অল্পতা ইহার কারণ। ভূমির উচ্চতা হেতু তথাকার বায়ু মণ্ডলের অবস্থাও স্বতন্ত্র। স্থানীয় বা বিশেষ ফসল ভিন্ন অপর ফসল তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, সমতল বা নিম্নতল ভাগে মৃত্তিকা মধ্যে যথেষ্ট উত্তাপ থাকায়

তথায় বীজ যত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং বায়ুমণ্ডল সুখকর বলিয়া অঙ্কুরিত উদ্ভিদ যত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, শৈল প্রদেশের গাছ তত হয় না। উচ্চদেশের মাটি ও বাতাস শুষ্ক প্রায় সুতরাং সে সকল দেশে উদ্ভিদকে নিরন্তর আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। উদ্ভিদসমাকীর্ণ প্রদেশ হইলে মাটি ও বাতাস নীরস হইতে পায় না, কারণ তথাকার মাটি উদ্ভিজ্জ পদার্থপূর্ণ। মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযুক্ত থাকিলে তাহাতে অধিক রস থাকিতে পারে। উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে রস আহরণ করিয়া নিজ অবয়বের কোমলাংশ—পত্র ও অপরিপক্ক ডাল-পালা দিয়া বাষ্পকারে বাহির করিয়া দিয়া থাকে, তাহারই ফলে বায়ুমণ্ডল সরস থাকে। তরুহীন দেশের বায়ুমণ্ডল শুষ্ক বলিয়া তথাকার বায়ু এতই শুষ্ক যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষের কষ্ট হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

—— * ——

ধরিত্রীর তলভেদের সহিত প্রাকৃতিক যে সম্বন্ধ, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই সম্যকরূপে আলোচনা করিয়াছি। উহার সহিত আবহাওয়ায় কি সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও সুবিধার্থ স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করা গেল।

আবহাওয়ায়

শৈলমণ্ডলে যত বারিপাত হয়, তৎসমুদায়ই নিম্নতলাভিমুখে প্রবাহিত হয়। মাটিতে সমধিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকায় অনেক জল-তদ্দ্বারা শোষিত হয়, কিন্তু তথায় স্থায়ী হইতে না পারিয়া পাহাড়ের কোন

স্থান ভেদ করিয়া নির্ঝরিণীরূপে উদ্ভূত হইয়া কোন নদী বা হ্রদে গিয়া পড়ে। যে স্থান ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রস্রবন (spring) কহে। আমরা যে নদ নদী দেখিতে পাই তৎসমুদায় প্রসবণ-নিসৃত বহু নির্ঝরিণীর সম্মিলনে উৎপন্ন। বৃহৎ হ্রদ হইতে নির্ঝরিণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাতাল-প্রদেশ হইতে উর্দ্ধভাগে জল উঠিয়া প্রস্রবণ উৎপন্ন হয় না। পর্ব্বতমণ্ডলে সমধিক বারিপাত হইয়া থাকে। নিবিড় অরণ্যপ্রদেশেও বারিপাতের অপ্রতুল হয় না। যেখানে এতদুভয়ের সমাবেশ সে স্থানের বারিপাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। গগণস্পর্শী গিরিসমূহে উদ্ভিদ না থাকিলেও তুষারের প্রদুর্ভাব হেতু জলের অভাব নাই সুতরাং সে প্রদেশ সমধিক সর্দ্দিময়! ঈদৃশ দেশের বায়ুমণ্ডল স্বভাবতঃই সিক্ত। সুতরাং অপর স্থানাপেক্ষা তথায় অধিক বারপাত হইয়া থাকে। সিক্ততা ও বারিপাতের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এতদুর্ভয়ের সহিত উদ্ভিজ্জ-গতেরও সেইরূপ ঘন সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তিনই পরস্পরের অধীন, পরস্পরে যেন একতা সূত্রে আবদ্ধ। বারিহীন দেশে কোন উদ্ভিদ জন্মে না, উদ্ভিদহীন দেশেও বৃষ্টি হয় না। অনেক বারিহীন দেশে উদ্ভিদ রোপিত হওয়ায় বৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে সেই সঙ্গে স্থানীয় আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর যে দেশ যত অরণ্যময়, সে দেশে তত অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। গাছপালা বন-জঙ্গল যত নির্ম্মুলিত হয়, বারিপাত তত কমিয়া যায়, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা তত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গত ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্রদেশে যত অরণ্য ছিল, এক্ষণে তত নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গলা দেশের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। যখন সুন্দরবন সুবিস্তির্ণ অরণ্য

ছিল, তখন বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া একরূপ ছিল, এখন অন্য রূপ হইয়াছে। সুন্দরবন কাটিয়া তথায় এখন আবাদ হইতেছে, গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই সঙ্গে বারিপাত ক্রমে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রতিদিন অপরাহ্নে 'কাল-বৈশাখী' হইত সুতরাং অপরাহ্নে কেহ সচরাচর গৃহত্যাগ করিয়া দূর স্থানে যাইত না। সুন্দরবন ছাড়াও অনেক স্থানের গাছ-পালা কাটা গিয়াছে, সেইজন্য বৃষ্টি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণকার বর্ষাকাল প্রায় অল্প দিন স্থায়ী হয় এবং যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। বাঙ্গালা দেশের উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে আসাম, দক্ষিণে সুন্দরবন। এই কয় স্থানই অরণ্যময় এবং বঙ্গদেশ ইহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার উহারাই মালিক, ইহা বলিতে পারা যায়। *

ইংরাজি ১৯০০ সালে আমি আসামের পূর্ব্ব সীমান্ত-প্রদেশান্তর্গত নাগা পাহাড়ে গিয়া মার্গেরেটা সহরে মাসাধিককাল অবস্থান করিয়াছিলাম। তথায় অবস্থানকালে স্থানীয় অধিবাসী ও দীর্ঘ প্রবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে স্থানে অগম্য জঙ্গল ছিল, তখন দিবারাত্রি বৃষ্টি হইত, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হইতে স্থানীয় জঙ্গল কর্ত্তিত হইয়া চা-বাগান, জনপদ, নগর প্রভৃতি সৃষ্টি

* আজ কালের ছেলেরা 'কাল-বৈশাখী কাহাকে বলে তাহা জানে না। পরবর্ত্তী বংশধরগণ ইহার নামও হয় ত শুনিতে পাইবে না। তাহাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে 'কাল-বৈশাখী' শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বৈকালে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রবল বাতাস উঠিত, মেঘ গর্জ্জিত, বিজলী চমকিত; ধূলায় আকাশ অন্ধকার ও ঘর-দুয়ার আচ্ছন্ন হইত, বড় বড় গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া যাইত। অবশেষে মুসলধারায় বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইত। কোন কোন বৎসর শীলাবৃষ্টি হয়।

হইতে আরম্ভ হওয়ায় বৃষ্টির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে। তাঁহাদিগের পক্ষে কম হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু সেই কম অবস্থাতেই যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা বড় কম নহে! আমি তথায় ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে ছিলাম। সে সময়ে এরূপ একদিনও যায় নাই, যে দিন ২।৪ পসলা বৃষ্টি না হইয়াছে! তথা হইতে ৫০।৬০ মাইল দূরে ডুম-ডুমায় কিছুদিন থাকিয়াছি কিন্তু সেখানে তত বৃষ্টি বা শীত নাই! দারজিলিঙ্গে গিয়া তথাকার দীর্ঘ প্রবাসীদিগের নিকট ঠিক ঐরূপ কথাই শুনিয়াছিলাম।

ফসলের প্রকৃতি ভেদ

প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হেতু অনেক ফসল অনেক দেশে জন্মে না। অত্যধিক বারিপাত-সমন্বয়-স্থানের মাটিতে এতই অধিক রস যে, ফসলের মধ্যে সারাংশ খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। মার্গেরেটা, ডিব্রুগড়, তেজপুর প্রভৃতি রসা জেলায় যে সুদীর্ঘ ও সুস্পৃষ্ট ইক্ষু জন্মে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সেখানকার সাধারণ ইক্ষুদণ্ড ৭।৮ হাত দীর্ঘ ও ২ ইঞ্চ ব্যাসের ন্যায় হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে শর্করার ভাগ নিতান্ত সামান্য। হরিদ্রা প্রচুর উৎপন্ন হয়, মূল তাজা ও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে হরিদ্রাত্বের অর্থাৎ বর্ণের বড়ই অভাব পরিদৃষ্ট হয়। বেগুণ সুবৃহৎ ও নয়নানন্দকর কিন্তু সারাংশের অভাব হেতু মিষ্টতা বা স্বাদবিহীন। বেহারে যে সকল ফল-পাকুড় বা তরিতরকারি উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় যেমন সারাল তেমনই মধুরাস্বাদ। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতা হইতে পটোল, বেগুণ, ইক্ষু প্রভৃতি অনেক জিনিসের বীজ আনাইয়া আবাদ করিয়াছি কিন্তু এক্ষণে দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত রাজনগরে সেই বীজোৎপন্ন ফসল যেমন পরিপুষ্ট, শাঁসাল ও মুখরোচক হয়, বাঙ্গালায় তেমন হয় না। আমার যে সকল আত্মীয়

বা বন্ধুবান্ধব এখানে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সেই সকল জিনিসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আবহাওয়ার দোষ গুণে মৃত্তিকারও শক্তি যে পরিচালিত হয়, পদে পদে তাহা দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা দেশে যে সকল আম্র, পেয়ারা, তরমুজ, খরমুজা জন্মে তৎসমুদয়ের স্বাদ পান্‌সে বা স্বাদহীন এবং সৌরভ (flavor) ক্ষীণ হইতে দেখা যায় কিন্তু বেহারে বা আরও পশ্চিমাঞ্চলে যে জিনিস জন্মে তাহাদিগের স্বাদ যেমন রসনা তৃপ্তিকর, ঘ্রাণও সেইরূপ মনমুগ্ধকর। একটী পেয়ারা খরমুজা ঘরে থাকিলে ঘর আমোদ করিয়া দেয়। নানাবিধ পুষ্প সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে বেল-ফুল জন্মে, বেহারেও জন্মে, কিন্তু শেষোক্ত স্থানের ফুলে যেমন প্রাণহারিণী সৌরভ বাঙ্গালা দেশের ফুলে তাহা কই? বাঙ্গালা দেশের গোলাপ ফুলটীকে নাসারন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করাইলে তবে হয়ত একটু ঘ্রাণ পাওয়া যায় কিন্তু দ্বারবঙ্গের গোলাপ গাছের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র এমন চিত্তবিমোহিণী সৌরভ প্রাণকে মাতোয়ারা করিয়া দেয় যে সেদিকে ফিরিয়া চাহিতেই হয়, তথায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইতেও হয়। এ সকল আবহাওয়ার কার্য্য জানিতে হইবে। সুতরাং আবহাওয়াকে ওরফে তাহার নিয়ামক বারিপাতকে উপেক্ষা করিবার নহে।

বারিপাত

কৃষির সহিত বারিপাতের বা আবহাওয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা ভারতবাসী বহু পূর্ব্বকাল হইতে জানিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে ইংরাজের আমলে আমরা স্বস্ব ঘরে বসিয়া সমগ্র ভারতের আবহাওয়া-তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি। এক্ষণে সমগ্র ভারতের প্রত্যেক জেলার সদরে প্রতিদিন বারিপাতের পরিমাণ লিখিত ও সপ্তাহে সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের গেজেটে

প্রকাশিত হইতেছে। সেই হিসাব দেখিলে কোন্ জেলার কত বারিপাত হইয়া থাকে তাহার একটার আন্দাজ পাওয়া যায়। স্থানান্তরে বাঙ্গালার জেলা কয়টীর বার্ষিক বারিপাতের একটি তালিকা দেওয়া গেল।* পৃথিবীর স্থাণ বিশেষের উচ্চতা ও নিম্নতা, বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব, অরণ্যের প্রাদুর্ভাব বা অভাব, বারিপাতের ইতরবিশেষ প্রভৃতির সমাবেশ ফলে আবহাওয়া সম্বন্ধে একটি নিময় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই নিয়মবশে উহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতাস্থ মানমন্দির (Observatory) হইতে প্রতিদিন আবহাওয়ার তালিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে কোন দেশীয় পরিচালিত সংবাদ পত্রে প্রায় তাহা স্থান পায় না। আকাশের জলের উপর যে দেশের কৃষিকার্য্য নির্ভর করে, সে দেশের লোক আবহাওয়ার সংবাদ রাখে না, ইহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় কি আছে?

বায়ু পরিবর্ত্তন

ভারতে দুইবার বায়ু পরিবর্ত্তিত হয়, ইংরাজিতে তাহাকে Monsoon কহে। যে দুইটী বাতাসে এদেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাদিগের একের নাম দক্ষিণে-বাতাস (South-west monsoon), অপরের নাম পূর্ব্ব বা পূবে-বাতাস (North-East Monsoon)। দক্ষিণে-বাতাস ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত আরব্য-উপসাগর হইতে সচরাচর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্থিত হইয়া বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি ভেদ করিয়া বঙ্গদেশ চীন প্রভৃতির ভিতর দিয়া কামস্কাট্‌কায় গিয়া মিলিত হয়। উক্ত বাতাসের স্বাভাবিক গতি— দক্ষিন-পশ্চিম হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে। পথিমধ্যে সমুচ্চ পর্ব্বতাদি

---

* উক্ত তালিকা স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Hand-book of Indian Agriculture" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল।

থাকায় উহার স্বাভাবিক গতি বিঘ্ন পাইয়া দিগান্তর দিয়া প্রবাহিত হয়। দক্ষিণে-বাতাসের সূত্রপাত হইলে অল্পাধিক বৃষ্টির সূত্রপাত হয়। পূবে-বাতাস—ভাদ্র মাসের শেষ বা আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হইয়া বঙ্গদেশের ভিতর দিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইলে, শীতকালের সূত্র-পাত হয়। উল্লিখিত বাতাস দ্বয়ের সূত্রপাত-কালে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। হাওয়া পরিবর্ত্তনের সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারিলে কৃষিকার্য্যের অনেক সহায়তা হইতে পারে। দক্ষিণে-বাতাসের সূত্রপাত হইলে মধ্যে মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়; এক আধ পশলা বৃষ্টিও হয়, বায়ুমণ্ডল স্থির ভাব ধারণ করে! কৃষকগণ যদি জানিতে পারে যে অমুক তারিখ হইতে বর্ষা আরাম্ভ হইবে, তাহা হইলে তাহারা চাষ-বাসের অনেক কাজ পূর্ব্বাহ্ণে ঠিক করিয়া রাখিতে পারে। এখন যে কৃষকগণ তাহা করে না এমন কথা বলি না, তবে যাহা করে তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও চির পদ্ধতি অনুসারে কোন কোন বৎসর ঋতু পরিবর্ত্তন কিছু পূর্ব্বে বা পরে হয়। বর্ষারম্ভের এইরূপ অনিশ্চয়তা হেতু কৃষককে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। বর্ষা আরদ্ধ হইয়া গেলে পর মৃত্তিকা বিচলিত হইলে অনেকসময় জমি খারাপ হইয়া যায়—মাটি ঢেলা বাঁধিয়া যায়।' ইহাকে 'চেঙ্গটা-ধরা' কহে। চেঙ্গটা-ধরা জমিতে ফসলের শ্রীবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অধোগতি হইয়া থাকে। এইজন্য মাটি সিক্ত থাকিতে ক্ষেত্র কর্ষণের কোন কার্য্যই করিতে নিষেধ, অধিক কি নিড়ানি বা খুরপী করাও নিষেধ। বৃষ্টির পর পুনরায় 'যো' না পাইলে ক্ষেত্রের মাটিকে আদৌ বিচলিত করিতে নাই, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেও নাই। ভূমির সিক্তাবস্থায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা মাটি কোনরূপে বিচলিত হইলে অনেক স্থানের মাটি চাপিয়া বসিয়া যায়, অনেক ঢেলা

সমূহ প্রস্তরবৎ এত কঠিন হইয়া যায় যে হাল চৌকীতে তাহা সংশোধিত হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতানুসারে কাজ করা অনেকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর্ষারম্ভ হইবে জানিতে পারিলে তাহার পূর্ব্বে কৃষক বীজ বুনিয়া রাখিতে পারে। ধান্য রোপণের জন্য ইহা বিশেষ আবশ্যক। আষাঢ় মাসের প্রথমে বর্ষারম্ভ হয় ভাবিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি কৃষক পাটের বীজ বপন করে, আর যদি আষাঢ়ের শেষ ভাগে বৃষ্টির সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে সে আবাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। বিলম্বে বর্ষারম্ভ হইবে জ্ঞাত থাকিলে কৃষকগণ বিলম্বে বীজ বুনিতে পারে। বর্ষারম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় অবগত না থাকিলে এইরূপ অনেক সময় অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে। বাতাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভূগর্ভ মধ্যেও উত্তাপ, রস-সঞ্চালনী ক্রিয়া, মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ রাশির বিশ্লেষণ-ক্রিয়া প্রভৃতির গতি ভিন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক,—

বারিপাত নির্দ্ধারণ

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে, যে আকাশব্যাপ্ত বারি পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সে বারির পরিমাণ করিবার উপায় কি? কথাটা যত গুরুতর কার্য্যতঃ তত নহে। বারিপাতের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে দেশ বিদেশের বারিপাতের পরিমাণ স্বতন্ত্র। কোন স্থানে অধিক, কোন স্থানে অল্প বারিপাত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, মাস বিশেষেও বারিপাতের তারতম্য হয়। বৃষ্টির পরিমাণ করিবার জন্য তুলাদণ্ডের আবশ্যক হয় না, ইঞ্চ হিসাবে পরিমাণ করা হইয়া থাকে। বৃষ্টি পরিমাণ করিবার এক প্রকার যন্ত্র আছে—তাহাকে Rain gauge, কহে। ইহার মূল্য ৫।৬ টাকার মধ্যে। বিনা খরচায় বৃষ্টি মাপিবার একটী সহজ কৌশল এস্থলে লিখিত হইল:—কোন উন্মুক্ত স্থানে বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি ধাতু পত্র—কাঁশি বা থালা রাখিয়া দিতে

সম্বৎসরের বারিপাতের তালিকা*

	North Latitude.	East Longitude.	উচ্চতা	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ্চ	এপ্রেল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	বার্ষিক গড়ে।
			ফুট	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ	ইঞ্চ
কলিকাতা ...	২২।৩৩	৮৮।২১	২১	০।৪৪	০।৯৭	১।৩১	২।৩৭	৫।৪৮	১১।৭৭	১২।৯৬	১৩।৯৪	৯।৯২	৫।৪২	০।৬০	০।৩২	৬৫।৫০
কটক ...	২০।২০	৮৫।৫৪	৮০	০।৪০	০।৪৭	০।৯৩	১।৪৪	৩।১৯	১০।৩০	১২।৭৭	১১।৪১	৯।৭১	৫।৭৯	১।০৩	০।৪৮	৫৭।৮২
দারজিলিং ...	২৭।৩	৮৮।১৮	৭৪২১	০।৭৪	১।১১	২।৩৫	৩।৭২	৭।১০	২৫।২৫	২৯।৮৬	২৬।১৯	১৭।৬৬	৬।৫০	০।২১	০।১৬	১২০।৮৫
দ্বারভাঙ্গা ...	২৬।১০	৮৬।০	১৬৬	০।৬৭	০।৫৭	০।২৮	০।৬১	২।২৩	৮।২০	১১।৯০	১১।৩২	৮।৯২	২।৭০	০।০৮	০।১১	৪৭।৩৯
ঢাকা ...	২৩।৪৩	৯০।২৭	৩৫	০।২৯	০।৯৭	২।৪৫	৫।৮৪	৯।২৫	১৩।২৫	১২।৯৩	১২।৩৮	১০।১৯	৫।৪০	০.৬৮	০।৩	৭৩।৮৬
পাটনা ...	২৫।৩৭	৮৫।১৪	১৮২	০।৭০	০।৫২	০।৩৫	০।৩১	১।৬০	৭।২৪	৯।৮৭	৭।৭৯	২।৮২	০।২২	০।১৩	০।৪২	[illegible]
বৰ্দ্ধমান ...	২৩।১৪	৮৭।৫৪	৯৯	০।৩০	০।৮৭	১।২৭	২।৫৯	৪।৯৯	১০.০৪	১২।৪২	১২।৩	৩৭।৯০	৪।৯২	০।৫৮	০।১৭	৫৮।৩৫

হয়। পসলা শেষ হইয়া গেলে সঞ্চিত জলে সরল ভাবে একটী কাঠি দণ্ডায়মান করিলে পাত্রে যতটা জল থাকে কাঠি ততটা ভিজিয়া যায়। অতঃপর কাঠির ভিজা অংশকে গজ দ্বারা মাপিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কয় ইঞ্চ জল হইল। জল মাপিবার সরঞ্জাম যতই সামান্য হউক, কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক নতুবা সঠিক ও প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে না। (১) যে স্থানে পাত্র স্থাপন করিতে হয়, তাহা চৌরস ও সম্পূর্ণ সমতল হইবে। (২) উক্ত স্থান—ঘর বাড়ী, গাছ-পালা প্রভৃতি হইতে এত দূরে হওয়া আবশ্যক যে বৃষ্টির সময় ঐ সকলের টোপানি জলের এক ফোটাও সে পাত্রে না পড়ে, কিম্বা উহাদিগের অবস্থান হেতু এক বিন্দুমাত্র জলও যেন বাধা না পায়। অনেক সময় বারিধারা কোন দিকে হেলিয়া পতিত হয়—তাহাকে 'ছাট' কহে। নির্ব্বাচিত স্থান এত দূরে থাকা আবশ্যক, যেন ছাটের সময় তথায় বারিপাতের ব্যাঘাত না হয়। এই সকল হইতে পাছে না কোন্ বিঘ্ন ঘটে, এই জন্য ঘর বাড়ী বা গাছ-পালা হইতে অন্ততঃ ৮।১০ হাত দূরে, কিম্বা মাঠে বা ছাদের উপরে উহার ব্যবস্থা করা উচিত (৩) পাত্র আলবিশিষ্ট হওয়া উচিত। পাত্র সম্পূর্ণ সমতল হইবে—কোথাও ছিদ্র বা টোল বা ডোবর থাকিবে না। এত সাবধানতার উদ্দেশ্য এই যে, সঞ্চিত জল পাত্রের সর্ব্বস্থানে সমপরিমাণে পতিত হইতে পারে। মৃৎ পাত্রে জল শুকাইয়া যায় সুতরাং সঠিক পরিমাণ হয় না। গজে মাপিয়া সঞ্চিত জল যত ইঞ্চ হইল তত ইঞ্চ জল এক বিঘা ভূমির উপর হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে লইবে। এক্ষণে এক বিঘা জমিতে কত মণ জল দেখিতে হইবে। অঙ্ক কষিবার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

এক ইঞ্চ বৃষ্টি বলিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রতি বিঘা ভূমির উপর

৯১১।৮।/$\frac{৩}{৪}$ (নয় শত এগার মণ, আঠার সের পাঁচ ছটাক) এবং ইংরাজি হিসাব ধরিলে প্রতি একারে (৬০॥০ কাঠা জমি) ১০০ টন (২৭২১॥০ মণ) জল হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিয়মিতরূপে জল মাপিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে একটী রেন্-গজ (Rain Gange). রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা ঘরে নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত উপায় লিখিত হইল :—

টীনের একটী এক ফুট লম্বা ও ৩$\frac{১}{৬}$ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট নল তৈয়ার করিতে হইবে। নলের ভিতর তলা হইতে মুখ পর্য্যন্ত কোন রং দ্বারা একটী সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। অতঃপর উক্ত সরল রেখাকে ৬৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভক্ত স্থানে একটী দাগ ও নম্বর দিতে হয়। বৃষ্টির সময় যে জল উক্ত নলের মধ্যে সঞ্চিত হয় তাহা নলের মুখ পর্য্যন্ত উঠিলে বুঝিতে হইবে যে এক ইঞ্চ জল হইল। নল পরিপূর্ণ না হইলে, নলের ভিতরের সরল রেখায় যতদূর জল উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া জলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। প্রত্যেক দাগ এক ইঞ্চের ৬৪ ভাগের এক ভাগ। বত্রিশ দাগ পর্য্যন্ত হইলে $\frac{৩২}{৬৪}$ অর্থাৎ আধ ইঞ্চ ১৬ অবধি উঠিলে $\frac{১৬}{৬৪}$ সিকি ইঞ্চ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। প্রতি পসল বৃষ্টির মরই মাপ নির্দ্দেশ করিয়া জল ফেলিয়া দিতে হয়। মাপ দেখিতে বিলম্ব হইলে বাতাসে বা রৌদ্রে জল শুকাইয়া যাইবে,ফলতঃ সঠিক মাপ পাওয়া যাইবে না। কেবল বৃষ্টির পরিমাণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না কারণ—

বৃষ্টি নানা প্রকারের হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে মুসল-ধারা, ধীর-ধারা ও টিপ্-টিপে—এই তিনটী প্রধান। মুষলধারার বৃষ্টি বিশেষ কাজের নহে। উহা যেমন মুষল ধারায় পতিত হয়, তেমনি ভূমি হইতে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া

মুষলধারা

চলিয়া যায়। উহাতে ভূগর্ভের মৃত্তিকা অধিক দূর ভিজেনা। মৃত্তিকার পোষণ-শক্তি অপেক্ষা জলের প্রবাহ (velocity) অধিক হইলে উক্ত জল মৃত্তিকায় শোষিত হইবার অবসর পায় না। একেই মৃত্তিকার ছিদ্র ও ছিদ্র পথ সূক্ষ্ম, তাহাতে জল অধিক সুতরাং তাহার গতি দ্রুত হইলে সমগ্র জল শোষণ করা ভূমির পক্ষে অসম্ভব। অনেক দিন বৃষ্টি না হইলে ক্ষেত পাথার তৃষ্ণার্ত্তপ্রায় হইয়া থাকে। এ সময়ে মুষল বা প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইলে অল্পক্ষণ মধ্যে মাটি ভিজিয়া যায়, তখন ধীর বৃষ্টি হইলে ভাল হয়, কিন্তু অধিকক্ষণ মুসল বৃষ্টি ভাল নহে। বারিধারা যত ধীর হয়, ভূমি তত অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারে। মুষল ধারা বৃষ্টিতে জলের প্রবাহ হেতু ভূপৃষ্ঠস্থ উদ্ভিজ্জ অনুদ্ভিজ্জ—তাবৎ লঘু পদার্থ জলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়, ইহাতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় হয়। সমতল ক্ষেত্রে তত ক্ষতি হয় না কিন্তু গড়েন জমিতে বড় ক্ষতি হয়। পার্ব্বত্য বন্ধুর জমিতে আরও অধিক ক্ষতি হয় কারণ পার্ব্বত্য ভূমি স্বভাবতঃ কঙ্করসঙ্কুল, সুতরাং মুষল বৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের সূক্ষ্ম মাটি ধুইয়া গেলে উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী কঙ্কর সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, পরে রৌদ্রে ভূমি অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ক্ষেত্রে ফসল থাকিলে গাছের গোড়া হইতে মাটি সরিয়া যাওয়ায়—কিম্বা বৃষ্টির ভারে ও দাপটে—গাছ ভূশায়ী হইয়া পড়ে, অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া যায়। এ সকল সত্ত্বেও ঝাড়া অর্থাৎ মুষল বৃষ্টিতে একটি বিশেষ উপকার হয় এই যে, লোকের ঘর বাড়ী, অঙ্গিনা, আঁস্তাকুড় ও অপরাপর অপরিষ্কৃত স্থান বিধৌত হইয়া যায়, জলাশয় সমূহে জল বৃদ্ধি হয় পুরাতন জলের দোষ কাটিয়া যায়, পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল হয়। আলবেষ্টিত সমভূমিতে উহার দ্বারা জল দাঁড়াইলে ক্ষেত্রস্থিত সার পদার্থ—মানুষ্য, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ

প্রভৃতির পুরিষাদি গলিয়া জলের সহিত মিসিয়া ক্ষেত্রময় সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে সেই সার সমন্বিত জল ভূমিতে শোষিত হইলে ক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়।

কৃষিকার্য্যের পক্ষে ধীর ভাবে ও ঘন বর্ষণ হওয়া বিশেষ স্পৃহনীয় ধীর বর্ষণে ভূমিতে অধিক জল শোষিত হয়, সে কারণ মাটি বহুদিন সরস থাকে, ভূমি হইতে অধিক বাষ্প উদ্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে শীতল রাখে। এই সকল কারণে ধীর বর্ষণের পর পুনরায় শীঘ্র বৃষ্টি হইবার আশা থাকে। চাষ আবাদের সৌকর্য্যার্থে ভূমির সরসতা ও বায়ুমণ্ডলের সিক্ততা একাধারে একান্ত প্রয়োজন।

ধীরধারা

টিপ্ টিপে বৃষ্টি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সে জন্য জমির জল শুকাইতে বিলম্ব হয় ও জমিতে কাদা হয়। সৌভাগ্য ক্রমে টিপ্ টিপে বৃষ্টি বর্ষার প্রারম্ভকালে বড় একটা হয় না। টিপ্ টিপে বৃষ্টি দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর টিপ্ টিপে বৃষ্টি হইলে মাটি সহজে ভিজে না, ভূগর্ভে জল প্রবেশ করে না, অন্য দিকে ভূ-পতিত জল ও শীঘ্র শুকাইয়া যাইতে থাকে। টিপ্ টিপে বৃষ্টিতে আমন-ধান্য রোপন করিবার সময়। টিপ্ টিপে বৃষ্টি অধিকক্ষণ, এমন কি দুই তিন দিবসও স্থায়ী হয়, সুতরাং মাটি অতিশয় কাদাটে হইয়া যায় ও শীঘ্র শুষ্ক হয় না। এ সময়ে অপর কোন ফসল রোপণ করিতে গেলে পদ-দলনে ও রোপন কালে মাটি জমাট বাঁধিয়া যায়, পরে জল শুকাইলে ভূমি অভেদ্য প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায়। ইহাকে 'চেপ্টাধরা' কহে। চেপ্টাধরা ক্ষেত্রের ফসল সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হয় না, তাহার ফলনও ভাল হয় না মাটিতে যাহাতে চেপ্টা না ধরে, এজন্য মাটির সিক্তাবস্থায় ক্ষেত্রে গমন

টিপ টিপে বৃষ্টি

পর্য্যন্ত নিষেধ। মৃত্তিকার এ অবস্থায় ক্ষেত্রের কোন পাট-পরিচর্য্যা বা রোপনাদি কার্য্যের জন্ত ব্যস্ত না হইয়া যাবৎ 'যে' না হয়, তাবৎকাল অপেক্ষা করা বহু গুণে শ্রেয়। পূর্ণযোয়ে কাজ করিলে যেমন ভাল ফল পাওয়া যায়—অপর সময়ে সেরূপ পাওয়া যায় না।

অবিশ্রান্ত ও দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইতে থাকিলে জলে জলে মাটি পাঁকের মত হইয়া যায়। ইহাকে কাঁচল-ধরা কহে। যে সকল এঁটেল মাটির জমি হইতে জল নিকাশ হইতে পারে না, তাহাতেই কাঁচল ধরে। কাঁচল-ধরা জমি শুকাইলে চেঙ্গটা জমির স্থায় কঠিন হইয়া ফাটিয়া যায়। পুনরায় না হইলে তাহাতে হলচালনা করা চলে না। এতদবস্থায় জমির ফাটাল দিয়া ভূগর্ভের রস বহু নিম্ন অবধি শুকাইয়া যায়। কাঁচল হইতে রক্ষা করিতে হইলে মৃত্তিকায় দো-রস অবস্থা বা যো আসিলেই ভূমিকে কর্ষণ করা উচিত। অধিক বিলম্ব করিলে যো অবস্থা কাটিয়া যায়, তখন আর চাষ চলে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

—:০:—

গ্রহের প্রবাহ

সূর্য্যের সহিত আবহাওয়া ও ভূমির যে সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপরাপর গ্রহের সহিত ও যে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ নহে। কোন কোন বৎসর সূর্য্যের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়, অসহনীয় গ্রীষ্ম হয়, অথবা অতিরিক্ত বর্ষা বা শীত হয়, তাহার নানাবিধ কারণ থাকিলেও

ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের কার্য্য দ্বারা তাহা কতক পরিমাণে পরিচালিত হয়। ঈদৃশ কারণবশতঃ অনেক সময় শীঘ্রই বর্ষা আরম্ভ হয়, কোন বৎসর অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হয় আবার কখন কোন কোন ঋতু স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে ভূগর্ভ মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়ার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। চন্দ্রের গতিবিধির সহিত সমুদ্র ও নদ-নদী কখন স্ফীত, কখন বা কুঞ্চিত হইয়া যায়, তদ্ধেতু নিকটবর্ত্তী ভূমিতে কখন রস সমধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হয়, কখন বা ভূমি নীরস হইয়া যায়। বর্ষাকালে পাহাড় পর্ব্বত হইতে জল নামিয়া নদীতে আসিয়া পড়ে, নিম্নতল ভূমির জলও গড়াইয়া সদ্য অথবা ক্রমে নদীতে গিয়া স্থান প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নদী সকল তখন পূর্ণতোয়া ও প্রকাণ্ড হয়। ইহাই নদীগণের ঢল-ঢল অবস্থা। নদী-গণের পূর্ণতোয়াবস্থায় তৎসন্নিহিত স্থানের মৃত্তিকাশোষিত জলরাশি বহির্গমনের পথ পায় না, ফলতঃ মৃত্তিকা খুব রসাল থাকে। বর্ষা যত কমিয়া আসিতে থাকে, পাহাড়ের জল কত কমিয়া আসে, নদীও ক্রমে নামিয়া যায়। নদীর জল হটিয়া যাইবার সঙ্গে ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যায়—মৃত্তিকার রসাধিক্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। নদীকূলবর্ত্তী যে সকল জমির মৃত্তিকা লঘু বা বেলে বা দোঁআঁশ, নদী জলের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের মধ্যেও রসের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্ষাকাল না হইলেও মৃত্তিকার গঠন বিশেষে নদীর জোয়ার ভাঁটার সহিত নদ-নদী সন্নিহিত ভূমি ও ভূগর্ভ মধ্যে বহু জলের সমাবেশ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বরিশালে থাকিতে দেখিতাম—জোয়ারের সময় বরিশাল নদীর জল বৃদ্ধি হইলে সহরের তাবৎ পুষ্করিণী ও ডোবা জলে পূর্ণ হইয়া যাইত, অধিক কি—রন্ধনশালার উনানেও জল উঠিত। বলা বাহুল্য—

এই জল ভূমির উপর দিয়া না আসিয়া ভূগর্ভ ভেদ করিয়া আসিত এবং নদীতে ভাঁটা পড়িলে তৎসমুদায় জল স্বতঃই নামিয়া যাইত। অধ্যায়ান্তরে যে ছিদ্রপথের (capillary tubes) কথা বলা হইয়াছে, উক্ত জল তাহারই ভিতর দিয়া যাতায়াত করিত। উনানের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা দেখিয়া বাস্তবিকই আমার কৌতুহলের উদ্রেক হইয়াছিল। মাটির ভিতর দিয়া জল চলাচলের সহজ উপায় থাকাতে ভূগর্ভস্থিত সূক্ষ্ম ও সার পদার্থ নদীর জলের বেগ বশতঃ উপরে উঠিয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত নদীর নূতন সারপূর্ণ জল পাইয়া ভূমি প্রতিনিয়ত উর্ব্বরতা লাভ করিত। এই কারণেই বরিশালের ক্ষেত্র সমূহ এত উর্ব্বরা এবং তথাকার গাছ-পালা সম্বন্ধে অধিকতর তেজাল ও শ্রী সম্পন্ন। তথাকার গাছ-পালা সম্বন্ধে অধিক কি বলিব! এক একটি ভোজো-খাড়া ৭।৮ হাত লম্বা! অনেক স্থানে পাট গাছও তত দীর্ঘ হয় না।

নদী জলের মধ্যে উদ্ভিদাহারোপযোগী অনেক পদার্থ থাকে।

নদীজল

অপরাপর ঋতু অপেক্ষা বর্ষকালের ঘোলা জল অধিক সারবান। বর্ষাকালে ক্ষেত-পাথর-বিধৌত জল আসিয়া নদীতে মিলিত হয়। ক্ষেত-পাথর ও মাঠ-ঘাটে কত প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পতিত থাকে তাহার সীমা নাই। সেই সকল আবর্জ্জনা,—মানুষ, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির পুরীষ, মৃত-জীবদেহাবিশিষ্ট, গাছের ডালপালা, পাতা, ফল-ফুল, শিকড় প্রভৃতি—ক্ষেত্র বিধৌত হইয়া নদীতে গিয়া সম্মিলিত হয়। নদী জলের উর্ব্বরতার ইহা একটী বিশেষ কারণ। জোয়ারের সময় সমুদ্রের অনেক সার পদার্থ নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই জল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। লবণাক্ত জল আসিলে ক্ষেত্রের ক্ষতি হইয়া থাকে। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের জন্য নদীর জল

বন্ধন মৃত্তিকা মধ্যে রস সঞ্চিত থাকিতে পারে। মৃত্তিকা সরস থাকিলে উত্তাপ দ্বারা তাহার বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে। বেলে মাটির বর্ণ শুভ্র বলিয়া উহার উত্তাপ আহরণ করিবার শক্তি আদৌ নাই বলিলেই হয়, সুতরাং উহাতে যতই কিরণপাত হউক, ভূগর্ভে উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না, ভূগর্ভ মধ্যে উত্তাপেরও অধিক সঞ্চার হয় না, তবে যে ঈদৃশ মাটিতে বৃক্ষাদি জন্মে তাহার কারণ, উহা একেবারেই বালুকা নহে। মৃত্তিকায় আরণ্য উপকরণ যৎসামান্যও থাকে, তন্নিবন্ধন রস ও থাকে। ভূমিতে বালুকা ভাগের অল্পাধিক্যহেতু মৃত্তিকা অল্পাধিক শুভ্র হইয়া থাকে। লালাভ মাটিতে যথারীতি আবাদ হয়। ইহাকে ধূসর বা মশি বর্ণের করিতে -হইলে জমিতে যথেষ্ট উদ্ভিজ্জ সার প্রদান করা উচিত।

মৃত্তিকার বর্ণ সংস্কার

ক্ষেত্রে কাঁচা উদ্ভিদের পাড়ন দিলে মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। পাড়ন দিতে হইলে ক্ষেত্রকে যথানিয়মে কর্ষণাদি করিয়া অতিশয় ঘন করিয়া কোন ফসল বুনিতে হয়। অতঃপর অঙ্কুরিত গাছগুলির গোড়া হরিদ্বর্ণ থাকিলে পুনরায় জমিকে কর্ষণ করিয়া তাবৎ গাছকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ক্রমে সেই সকল গাছ পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়। উক্ত পাড়নকে হরিৎসার (green manuring) দেওয়া কহে। মৃত্তিকার অভাব বুঝিয়া একাধিক বার পাড়ন দিতে পারা যায়। হরিৎসারের উদ্দেশ্যে যে কোন ফসলের বা আগাছার আবাদ করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামে 'চকোর' নামক আগাছা চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রভূত পরিমাণে আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদিগের বীজ হয়। উক্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া মাঘ-ফাল্গুন মাসে বপন করিলে বৈশাখ মাস মধ্যে তজ্জাত গাছ সমূহকে হলচালনা দ্বারা

ভূশায়ী করিতে পারা যায়। অতঃপর দুই চারি পসলা বৃষ্টি পাইলেই তৎসমুদায় বিগলিত হইয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়। চাকুন্দে, হাকুচ, শণ, নীল, বুট, আতুসী, মাট কলাই প্রভৃতিও বুনিতে পারা যায়। কেবল যে মৃত্তিকার বর্ণকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য হরিৎসারের ব্যবস্থা আছে তাহা নহে। উদ্ভিজ্জ-হীন তাবৎ জমিতেই উল্লিখিত প্রণালীতে সার দিতে পারা যায়। মৃত্তিকা কৃষ্ণাভ হইলে তজ্জাত উদ্ভিদগণ আরামে থাকে। শুভ্র বা শ্বেতাভ বর্ণের মাটিতে যে সকল ফসল জন্মে তাহারা রৌদ্রের সময় সহজে বিমর্ষ ভাব ধারণ করে, বহু গাছে ঝমাইয়া পড়ে। ঈদৃশ শ্বেত মৃত্তিকার মাটির উপরে যে উত্তাপ পতিত হয়, তাহা শোষিত হইতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দূর হইতে প্রত্যাখ্যাত উত্তাপকে কম্পমান বলিয়া মনে হয়। উক্ত প্রত্যাখ্যাত উত্তাপে উদ্ভিদ ঝান্ খাইয়া যায়, উদ্ভিদের রস শুষ্ক হইয়া যায়। কৃষ্ণাভ মৃত্তিকায় ইহা দেখা যায় না। প্রখর রৌদ্রের দিনে বাগান-বাগিচায় কোমল প্রকৃতি উদ্ভিদের গোড়াকে সার দিয়া ঢাকিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে গোড়া ঢাকিয়া দেওয়াকে 'আবৃতি' Mulching) কহে। উক্ত আবৃতির জন্য অর্দ্ধবিগলিত পাতাসার কিম্বা গোবরাদি প্রাণীজ-সার সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবৃতি দ্বারা আরও অনেক ও বিশিষ্ট উপকার পাওয়া যায়—অধ্যায়ান্তরে তাহা বলিব।

ঊনবিংশ অধ্যায়

——:০:——

ভূমির জলমগ্নতা, শৈত্যতা প্রভৃতি দূরীকরণার্থ পয়ঃপ্রণালী, পুষ্করিণী বা কূপ খনন করা যেরূপ প্রয়োজন, ভূমিকে সরস রাখিবার জন্য ক্ষেত্রে জল আনিবার বা সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা করা ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক আবশ্যক। মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকিলে উদ্ভিদগণ যে সুচারুরূপে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না তাহা বারম্বার বলিয়াছি সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আর প্রয়োজন দেখা যায় না। ভূমিতে যথা পরিমাণ রস না থাকিলেই কৃত্রিম উপায়ে মাটিকে সরস করিতে হয়। জলের সুবন্দোবস্ত না থাকায় ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূমি অনাবাদে পতিত আছে, ইহাতে প্রজাসাধারণের ক্ষতি—গবর্ণমেণ্টের ও ক্ষতি। এই সকল পতিত জমি আবাদে পরিণত হইলে স্থানীয় অপর জমির খাজনার হার কমিয়া যাইতে পারে, অনেকে জমি গ্রহণ করিতে পারে এবং যাহাদিগের ক্ষেত-খামার আছে, তাহারা আবাদ বাড়াইতে পারে। যে দেশে জল সেচনের সুবন্দোবস্ত আছে তথাকার নীরস জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। আবাদী ক্ষেত্রেও সময় বিশেষে ও ফসল বিশেষের জন্য জল সেচন করিতে হয়। সুবৃষ্টির বৎসর হইলে আমাদিগকে ধান্য, মাড়ুয়া, প্রভৃতি বর্ষাকালের ফসলের জন্য ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু অল্প বর্ষার অভাব হইলে বর্ষাকালেও ক্ষেত্রে জলসেচন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে জলসেচনের কোন বন্দোবস্ত নাই সেখানে বৃষ্টির অভাব হইলেই ফসল নষ্ট হইয়া যায়,—অনেক বৎসর কৃষকগণ চারা রোপণ করিতেও

সেচন সংজ্ঞা

পারে না, কিন্তু সুখের বিষয়,—আজকাল গবর্ণমেণ্টের স্থানে স্থানে দীর্ঘ খাল খনন করিয়া কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতেছেন, এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতে ন্যূন কল্পে প্রায় চারি লক্ষ্য কূপ আছে এবং তদ্দ্বারা ষাট লক্ষ বিঘায় জলের সরবরাহ হইয়া থাকে। ইটালি দেশে যত নদী আছে তৎসমুদায়ই প্রায় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্যই তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিশর দেশে এতই অধিক খাল যে নীল নদের এক দশমাংশ জলও ভূমধ্যে সাগরে গিয়া পৌঁছিতে পারে না। স্পেন, জার্ম্মনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আর্জেণ্টিনা, বেলজিয়ম, সুইজর্লণ্ড, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে কৃষিকার্য্যোপলক্ষে খাল-বিলের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। জাপানে যে নাই তাহা নহে। ভারতবর্ষ, ইটালি ও মিশরে সেচিত জলে কত ভূমি আবাদ হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষ...............	৭৫,০০০,০০০ বিঘা
ইটালি....................	১০,১০০,০০০ ঐ
মিশর	১৮,০০০,০০০ ঐ

বিঘার হিসাব ধরিলে ভারতবর্ষ প্রথম, মিশর দ্বিতীয়, এবং ইটালি তৃতীয় স্থান পাইয়া থাকে কিন্তু ইটালি ও মিশরের তুলনায় ভারতবর্ষ বহুগুণ বৃহদায়তন দেশ, সুতরাং ভারতবর্ষে উহার চতুর্গুণ কূপ হইলেও কুলায় না।

সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে কেবল দুইটী খাল আছে,—একটী উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে, অন্য কলিকাতার বাগবাজার হইতে ভাঙ্গোড়

অঞ্চলে গিয়াছে। বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, ভাগলপুর, পাটনা, প্রভৃতি জেলায় খালের আদৌ কোন বন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া প্রতিনিয়ত যেরূপ জলাভাব হইতেছে, তাহাতে দৈবের উপর নির্ভর করিলে আর চলে না, এজন্য দেশের মধ্যে নানা স্থানে খাল খনন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। খাল খনন করিতে বিপুল ব্যয় আছে সত্য, কিন্তু সে ব্যয়ের ফলে গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর প্রজাদিগের নিকট হইতে জলের মূল্য ও নৌকাদি যাতায়াতের মাসুল বাবতে বহু অর্থ আদায় করিতে পারেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বহু দিকে লাভ হইবে। প্রথম লাভ—উল্লিখিত বাবতে, দ্বিতীয় লাভ,—দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্ট ও তাহাদের নিত্য সহচর বিসূচিকা, মহামারী প্রভৃতি বিরল হইবে,—গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবৎসর অন্নসত্র খুলিতে হইবে না,—রাজস্ব রেহাই দিতে হইবে না ইত্যাদি। প্রজাপক্ষের লাভ,—বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না, ক্ষেত্র শস্যশালিনী হইবে; প্রজার সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইবে, প্রজার ঋণদায় হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর, সমগ্র জন সমাজের লাভ—দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে।

মৃত্তিকাকে সরস করিবার জন্য ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়।

সেচনের উদ্দেশ্য

ভূগর্ভে যথেষ্ট রস আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে রস দ্বারা সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয় না। বাঙ্গালা, আসাম প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে সমধিক বারিপাত হইয়া থাকে, তথায় বর্ষাকালের ফসলের জন্য বহু জেলাতেই জল সেচনের প্রায় আবশ্যক হয় না কিন্তু রবি বা হৈমন্তিক ফসলের সময় মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি না হইলে উপরিভাগের মাটি বড়ই রসহীন হইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় ক্ষেত্রে সেচন করা আবশ্যক হয়। মৃত্তিকার ঈষৎ সিক্ত বর্ণ দেখিয়াই সন্তুষ্ট

হইলে চলিবে না, মৃত্তিকা যথেষ্ট সরস না হইলে উদ্ভিদকে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতে হয়। যে মানুষ প্রতিদিন এক সের সামগ্রী ভক্ষণ করিতে পারে, তাহাকে এক পোয়া দিলে সে জীবিত থাকে—মরে না, কিন্তু তাহার সে জীবন অতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে এবং সে নানা রোগের আধারস্বরূপ হইয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদের পক্ষেও তাহাই। নাম মাত্র রসে উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে ও জীবিত থাকে কিন্তু তাহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মাটিতে প্রচুর রস থাকা আবশ্যক। শুষ্ক ভূমিস্থ কোন একটি গাছের গোড়ায় এক দিনও যদি প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া যায়, তাহার ফল হাতে-হাতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর—

জল-সেচন দ্বারা মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থকে আহরণের উপযোগী করিয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদগণ প্রাণ ধারণের জন্য জলই অধিক পরিমাণে আহরণ করে। জল বা রস যতই নির্ম্মল হউক, তাহার সহিত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ থাকিবেই। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, উদ্ভিদগণ সচ্ছ জলই আহরণ করে। মূলস্থিত ছিদ্র সমূহ এতই ক্ষুদ্র যে তাহাতে ঘোলা জল প্রবেশ করিতে পারে না। জলের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম অবিভাজ্য পদার্থ থাকে তাহাই উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে পারে, তদপেক্ষা সামান্য হইলে পড়িয়া থাকে। অতঃপর ক্রমে বিগলিত, বিশ্লেষিত ও বিচূর্ণীত হইয়া উল্লিখিত অবস্থায় পরিণত হইলে, তবে ভবিষ্যতে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয়। কিয়ৎ পরিমাণ ঘোলা জলকে বারম্বার উত্তমরূপে মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া একটী শিশি বা বোতল মধ্যে রাখিয়া তাহাতে একটী গাছ বা গাছের ডাল বসাইয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জল কমিয়া যাইতেছে। উক্ত পাত্র একবারে জলহীন হইলে তাহার তলায় মাটি পড়িয়া আছে

দেখা যায়। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ স্থূল মাটি বর্জ্জন করিয়া কেবল সূক্ষাদপিসূক্ষ্ম পদার্থ আহরণ করিয়াছে। সুতরাং অধিক জল আহরিত হইলে, সেই সঙ্গে অধিক পরিমাণে আহার্য্য পদার্থ ও আহরিত হইবে—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উদ্ভিদ যতই রস আহরণ করুক তৎসমুদায়ই পত্র দ্বারা বর্জ্জন করে। তবে উদ্ভিদের এরূপ বেগার খাটিয়া লাভ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদগণ ভূগর্ভ হইতে জল উত্তোলন করিবার পম্প (Pump) নামক যন্ত্রস্বরূর। মৃত্তিকা হইতে রস আহরণ করিয়া বায়ুমণ্ডলকে প্রদান করা উহাদিগের পক্ষে বদান্যতা হইতে পারে, কিন্তু স্বকীয় জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নহে। এই জন্য রসের সহিত আহার্য্য পদার্থও উদ্ভিদ-শরীরে প্রবেশ করে এবং তাহাই উদ্ভিদ-শরীরে থাকিয়া যায় এবং জল বা রস বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। নীরস ভূমির গাছ যে বাড়ন্ত হয় না—রসের অপ্রাচুর্য্য তাহার কারণ।

সেচিত জল, না তরল সার

সেচিত জল দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন জলাশয়ের জল লবণাক্ত বা কষা বা অন্য আস্বাদের হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা উদ্ভিদের ক্ষতি হইতে পারে। এস্থলে তাদৃশ জলের কথা বলিতেছি না। উল্লিখিত প্রকারে দূষিত জল তাহা আদৌ সেচন করা উচিত নহে। যাহা হউক, এইরূপে সেচিত জলের সহিত যে সকল পদার্থ আসিয়া পড়ে তদ্দ্বারা ক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়। সেচিত জলকে কিম্বা জল মাত্রাকেই তরল সার (Liquid manure) বলা যাইতে পারে। নদীর জল আরও অধিক সারবান, কারণ তাহাতে ক্ষুদ্র পরমাণু ও উদ্ভিদাহার বহু পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যে সকল ক্ষেত্র নদী বা খালের জল দ্বারা সেচিত হয় কিম্বা জমি বন্যায় প্লাবিত হয়, তৎসমুদয় সাধারণ জমি অপেক্ষা সারবান

হইয়া থাকে। পূর্ব্বাধ্যায়ে 'নদী-জল' প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

নীরস জমি সারবান হইলেও কোন ফল নাই। জলসেচন করিলে ভূগর্ভস্থ অবিশ্লিষ্ট ও অগলিত পদার্থ সমূহ শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়। শুষ্ক ভূমিতে জলসেচনের ইহাও একটী বিশেষ ফল—ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষার একটী বিশেষ উপায়। জলসেচনে লবণাক্ত মাটির লবণ ভূমির নিম্ন দেশে নামিয়া যায়। লবণাক্ত ভূমিতে গ্রীষ্ম কালেই লবণ ফুটিয়া থাকে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠোপরি প্রকাশ পায়। ঈদৃশ অবস্থায় তজ্জাত ফসলের অনিষ্ট হয়। যে সকল জমিতে লবণ, সোরা বা সাজিমাটি থাকে, তাহাতে জলসেচন করিলে এই জন্য বিশেষ উপকার হয়।

উর্ব্বরতা রক্ষা

জলসেচন করিবার পক্ষে পড়ন্ত বেলা উৎকৃষ্ট সময়;—তখন রৌদ্রের প্রখরতা কম থাকে এবং তাহাও ক্রমশঃ সন্ধ্যা সমাগমে অন্তর্হিত হয়। এ সময়ে জলসেচন করিলে সেচিত জল অধিক শুকাইয়া যাইতে পারে না, তন্নিবন্ধন প্রায় সমগ্র জলই ভূমিতে শোষিত হইতে পায়। সকালে সেচন করিলে বহু পরিমাণ জল রৌদ্রে ও বাতাসে শুকাইয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়,—অনেক সময়ও নষ্ট হয়। সকল স্থলে ও সকল সময়ে এ নিয়মে কাজ চলে না, কাজেই সুবিধানুসারে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। আর এক কথা। বর্ষাকালে কোন কোন বৎসর যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেত্রে ছেঁচ দিতে হয়। আশু বৃষ্টির আশা থাকিলে কিম্বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে আপাততঃ সেচন কার্য্য স্থগিত রাখা ভাল। জল সেচিত হইবার পর বৃষ্টি হইলে ভূমি অতিশয় আর্দ্র হইয়া যায়, মাটি শুকাইতে বিলম্ব হয়, ভূগর্ভের উত্তাপ কমিয়া যায়, ও তন্মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়াদির ব্যাঘাত হয়, সুতরাং সে সময়ে সেচন না করিয়া বৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত

সেচনের সময়

অপেক্ষা করিতে হয়। বৃষ্টির পরেও মাটিকে শুষ্ক মনে হইলে জলসেচন করিতে পারা যায় কিন্তু সেচনের পূর্ব্বে জমিকে উস্কাইয়া না লইয়া ভূমিতে অধিক জল শোষিত হয় না,—ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়া থাকে। ইতোমধ্যে রৌদ্রে বা বায়ুতে অনেক জল শুকাইয়া যায়। যাহাতে শ্রম ও অর্থ ব্যয় পণ্ড না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মাটিতে রস থাকা প্রয়োজন বলিয়া অপরিমিত জলসেচন করা কর্ত্তব্য নহে। যে পরিমাণ জল ভূমিতে শোষিত হইতে পারে ঠিক সেই মত সেচন করাই বিধেয়। মাটি ঝুরা থাকিলে সহজেই রস শোষিত হয়, নতুবা ক্ষেত্রের কোন অংশে অধিক—আবার কোন অংশে অল্প—জল ভূমিতে প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্রের সকল স্থানের মাটি সমভাবে রসাল হয় না—তজ্জাত উদ্ভিদগণ সকল স্থানে সমভাবে বৰ্দ্ধিত হয় না। প্রতিবার জলসেচনের পর মাটিতে 'যো' হইলে পৃষ্ঠদেশের মাটিকে উত্তমরূপে উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সেচনের পর জল শুকাইতে থাকে, ভূমির পৃষ্ঠদেশ তত ফাটিয়া যায় কিন্তু ভূমিকে অধিক ফাটিতে না দিয়া 'যো' পাইবামাত্র মাটি উস্কাইয়া ঝুরা করিয়া দেওয়া অপেক্ষা জলসেচন করা অনেক সহজ ও অল্প ব্যয়সার্থক, কিন্তু তাহা বলিয়া ক্ষেত্রকে সরস রাখিবার জন্য অপরিমিত বা ঘন ঘন জলসেচন করা উচিত নহে। জলসেচন দ্বারা মাটিকে ভিজা রাখিয়া নিড়ানী, খুরপী বা কুদ্দালনের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

সেচনের নিয়ম

জলসেচন একটী বিশেষ কাৰ্য্য। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন্ জমিতে কত জল দেওয়া উচিত, একবার জল সেচন করিলে পুনরায় কতদিন পরে জলসেচন করা আবশ্যক ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভবনা। অতিরিক্ত

বা ঘন ঘন জল দিলে ভূমির উপর সর পড়ে ও সেওলা ধরে। তাহা ব্যতীত ভূগর্ভে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, ভূগর্ভে উত্তাপ থাকে না এবং উত্তাপের অভাবে জীবাণুগণ মরিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় উদ্ভিদগণের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়, হয়ত পত্র সমূহ বিবর্ণ ও স্খলিত হইয়া পড়ে। জল সেচন দ্বারা ক্ষেত্রের উপরিভাগের এক বিতস্তি মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। পৃষ্ঠদেশের এক বিতস্তি নিম্ন পর্য্যন্ত সরস থাকিলে, উক্ত যে রস নিম্নস্তরের (sub soil) সহিত সংযুক্ত হয়, ফলতঃ ভূগর্ভের রস শুষ্ক হইতে পায় না। বিনা সেচনে আবাদ করিলে ভূগর্ভের ভিতর অনেক দূর পর্য্যন্ত নীরস হইয়া যায়। অনন্তর কর্ষণাভাবে মাটি ফাটিয়া গেলে, ফাটলের মধ্যে বাষ্প ও সূর্য্যোত্তাপ অবাধে প্রবিষ্ট হইয়া ভূগর্ভকে আরও নীরস করিয়া দেয়, মাটীর চাপ সকল কঠিন হইয়া যায়—অবশেষে তদুপরিস্থ গাছ মরিয়া যায়। ধান্য-ক্ষেত্রের জল শুকাইলে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়, তাহাতে যে ফসল থাকে তাহার কোন আশা থাকে না। এ অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে পারিলে ভালই হয়, কিন্তু সে সুবিধা-সুযোগ না থাকিলে শুকনা-আবাদ প্রণালীর অনুসরণ করা উচিত। 'শুষ্ক আবাদ' অধ্যায়ান্তরে আলোচনা করিব। জলসেচনের নিয়ম যখন লোকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে তখন অল্প জল ব্যবহার করিবে, তাহাতে খরচ অনেক হ্রাস পাইবে।

ময়লা জল

বড় বড় অনেক সহরে আজ কাল পাকা ড্রেণ হইয়াছে। সেই সকল ড্রেণ দিয়া সহরের তাবৎ জল নিকাশ হইয়া থাকে। উক্ত জলে বহুবিধ সার পদার্থ থাকায় উহা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। উহার মধ্যে লোকের বাড়ীর রন্ধনশালা, স্নানাগার, পাইখানার আবর্জ্জনা, অশ্বশালা, গো-শালা, নানাবিধ কল-

কারখানা, বাজারের আনাজ-বনাজ, মাছমাংস, মহাজনদিগের গুদামের জঞ্জালাদি কত জিনিস থাকে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাহা ব্যতীত কষাইখানার রক্ত, মৃত মূষিক, গন্ধমূসিক, কত কীট পতঙ্গ সেই জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। এইজন্য সহরের ময়লা জল ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন করিবার পক্ষে অমূল্য সামগ্রী। এই জল যাঁহারা সঞ্চয় করিয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে অন্য সার ব্যবহার করিতে হয় না। পল্লীগ্রামে ড্রেণ নাই বটে কিন্তু সকল বাড়ী হইতে ময়লা জল সংগ্রহ করিতে পারা যায়। যে সকল স্থানে ময়লা জল পতিত হয়, সেই সেই স্থানে এক একটী চৌবাচ্ছা বা বড় গামলা রাখিয়া দিলে সমুদয় জল সেই স্থানে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং পাত্র পরিপূর্ণ হইলে কিম্বা প্রয়োজন-মতে লইয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। এক্ষণে প্রায় সকল ময়লা জলই ঘর বাড়ীর পার্শ্বে বা সন্নিহিত আস্তাকুঁড়ে পতিত হয় ও সেইখানে শোষিত হয়। এই স্থানের মাটি খুব সারাল হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সেই স্থানের মাটি কাটিয়া লইয়া বাগান-বাগিচায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই সকল ময়লা জলকে Sewage কহে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ময়লা জল প্রায় অপচয় হইতে পায় না—চাষবাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সামান্য চেষ্টা ও উদ্যোগাভাবে আমরা কত জিনিষ নষ্ট হইতে দিতেছি। স্ব স্ব বাটীর আবর্জ্জনা,—জলীয় হউক বা শুষ্ক হউক—রক্ষা করিতে কোন ব্যয় নাই, বিশেষ পরিশ্রমও নাই। নগণ্য ও পরিত্যক্ত সামগ্রী দ্বারা কত উপকার পাওয়া যায়, কত আর্থিক লাভ হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে উহাকে কেহ অপচয় হইতে দিবে না—ইহা নিশ্চিত। অস্পৃশ্য পদার্থ রাশিকে ক্ষেত্রে বা উদ্যানে প্রসারিত করিয়া দিলে কত উপকার পাওয়া যায়, সকলের এক বার তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

যে সকল উচ্চ প্রদেশে, ও উচ্চ বা গড়েন অথবা কিম্বা নীরস ভূমিতে জলসেচন করিবার কোন সুযোগ নাই তথাকার রস না অধিক শুকাইতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এতদুপলক্ষে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে দূরে দূরে ঔদ্ভিদিক বেড়া থাকিলে বায়ুর গতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। বায়ুতে ক্ষেত্রের সমূহ রস টানিয়া লয়, তাহাতে ভূগর্ভের অনেক দূর পর্য্যন্ত নীরস হইয়া যায়। ক্ষেত্রের চৌহদ্দিতে ভেরেণ্ডা, জিওল, কাশনী, জিলেবী, চিতা বা অড়হর, এরণ্ড, তুঁত প্রভৃতি অর্থকরী বৃক্ষের বেড়া থাকিলে ক্ষেত্র মধ্যে অধিক বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না অথচ উদ্ভিজ্জ সারেরও সংস্থান হয়। উপরন্তু অর্থকরী উদ্ভিদ হইলে তাহা হইতে ফসল পাওয়া যায়। শীতকাল ব্যতীত প্রায় অপর সকল ঋতুতে বেহার অঞ্চলে প্রবল বাতাস বহে, তাহাতে ক্ষেতের রস বড় শুকাইয়া যায়। সেই জন্য অনেকে ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে ঘন করিয়া শিশু বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। শিশু বৃক্ষ বসন্তকালে তাবৎ পত্র বর্জ্জন করে। উক্ত বর্জ্জিত পত্র দ্বারা ভূমির যথেষ্ট উপকার হয়। তাহা ব্যতীত শিশুগাছকে এদেশে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শাখাহীন করিয়া ছাঁটিয়া দিবার নিয়ম আছে। এই সকল সরু শাখা প্রশাখাকে 'ঝাঁকি' কহে। 'ঝাঁকি' জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার্য্য হয়—ইহাও গৃহস্থের একটী বিশেষ লাভ। অতঃপর সেই সকল গাছ পুরাতন হইলে তাহার কাষ্ঠে নানাবিধ আসবাব নির্ম্মিত হয়। যাহা হউক, যে সকল ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ হয়, তাহাতে এত দীর্ঘ বা শাখাল গাছ পুতিলে জমিতে আওতা হইয়া ফসলের অনিষ্ট করে। বাগান-বাগিচায় এ সকল গাছ পুতিলে ক্ষতি হয় না। আবাদী ক্ষেত্রের পক্ষে অল্প-জীবী গাছই উপ-

রস রক্ষার্থে বায়ুরোধ

যোগী, কিন্তু তাহা হইলেও ৪।৫ হাতের অধিক উচ্চ হইতে দেওয়া উচিত হয়।

মৃত্তিকার রসালতা সম্বন্ধে বাগান-জমি শ্রেষ্ঠ। বাগানে ছোট বড় নানাবিধ উদ্ভিদ রোপিত হয় বলিয়া তথাকার মাটিতে অপেক্ষাকৃত অধিক রস থাকে। চৌ-চাপটে সমস্ত দিন রৌদ্রাধীন থাকিলে যে কোন গাছই হউক, তাহার বৃদ্ধি ও ফলন ফুলন কিছু কম হয়। এ স্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত দিই। চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া বিভিন্ন প্রণালীতে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার বস-বাসের বাংলাতে, বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ রোপণ করিয়া থাকি। দুই একটী কার্পাস বৃক্ষ এমন স্থানে রোপিত আছে, যেখানে দ্বিপ্রহরের পর আর রৌদ্র লাগে না, কোন সময় অবাধে বায়ুও প্রবাহিত হইতে পারে না। ইহাতে দেখিতে পাই, কৃষিক্ষেত্রের সহস্র সহস্র বৃক্ষ অপেক্ষা এই কয়টী গাছের বৃদ্ধিশীলতা যেরূপ অধিক, ফলনও সেইরূপ বা ততোধিক। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে চৌ-চাপট্ রৌদ্র বা অবাধ বায়ু অপেক্ষা ঈষচ্ছায়াযুক্ত ও প্রবল বায়ুহীন স্থান গাছপালার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাঠ ময়দানে এ সকল সুবিধা পাওয়া যায় না বলিয়া স্থানীয় অবস্থার প্রতি নির্ভর করিতে হয়। রৌদ্রের ধর্ম্ম—উদ্ভিদকে কথঞ্চিত খর্ব্ব ও দৃঢ় করা এবং ছায়ার ধর্ম্ম—লম্বিত ও কোমল করা। যথায় এতদুভয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হয়, তথাকার উদ্ভিদ মধ্যবিধ প্রকারের হইয়া তদনুরূপ ফল ফুল প্রদান করে। উদ্যান মধ্যে রৌদ্র ও ছায়া—এতদুভয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষা হয় বলিয়া উদ্যান-ভূমির অপেক্ষাকৃত সরস থাকে এবং তথাকার উদ্ভিদগণকে জীবন্ত মনে হয়।

উদ্যান ভূমির রসালতা

বিংশ অধ্যায়

—:•:—

সকলের ভাগ্যে সকল সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। কাহারও ভূমি নিম্নতা হেতু অতিশয় আর্দ্র, কাহারও বা উচ্চ কিম্বা গড়েন বলিয়া নিতান্ত নীরস। এইরূপ প্রত্যেকেরই একটী না একটী আপদ আছেই, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি আছে এবং তাহারই সাহায্যে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। যাহাদিগের জমি স্বভাবতঃ সিক্ত ও সমূহ বারিপাতের অধীন, তাহাদিগের একান্ত চেষ্টা,—যাহাতে মাটি শুক্‌না অথচ সরস থাকে। আবার যাহাদিগের ভূমি স্বভাবতঃ নীরস, রস-শোষণে অক্ষম তাহারাও চেষ্টা করে—যাহাতে জমি সরস থাকে। কারণবিশেষে ফলের স্বাতন্ত্রহেতু প্রতিষেধের ব্যবস্থাও বিভিন্ন. কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক,—ভূমিকে সরস রাখা। রুক্ষ দেশে বা নীরস ভূমিতে জলসেচন করিবার উপায় না থাকিলে কিম্বা তাহা ব্যয়সাপেক্ষ হইলে জলসেচনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বিনা জলে আবাদ করিতে আমরা অভ্যস্থ আছি। আমাদিগকে বিনা জলে অনেক কিম্বা অধিকাংশ ফসলেরই আবাদ করিতে হয়। উভয় বঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম—এই দুই প্রদেশে অধিক বারিপাত হইয়া থাকে কিন্তু তাহা হইলেও সে বারিপাত প্রতি বৎসর যথানিয়মে পরিচালিত হয় না। বিনা জলে আবাদ করিতে হইলে কৃষককে তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১ম,—সুকর্ষণ; ২য়,—অন্তর্ভূমির পরিচর্য্যা; ৩য়,—স্থানীয় মৃত্তিকা এবং হাওয়া সহনক্ষম ফসলের আবাদ।

শুষ্ক আবাদ

সুকর্ষণ সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইলেও এ স্থলে তৎসম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। ভূপৃষ্ঠকে যতটা গভীর করিয়া কর্ষণ করা যায়, সমগ্র ক্ষেত্রকেই সেইরূপ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া আবশ্যক। অভিজ্ঞ ও মনোযোগী কৃষাণ ভিন্ন তাহা পারে না। কর্ষণকালে উপরিভাগের মাটি ঝুরা ও সমতল হইতে পারে কিন্তু নিম্নতল প্রায় সমতল হয় না। কৃষাণের দোষে প্রায় এরূপ ঘটিয়া থাকে। কৃষাণ যদি লাঙ্গলের 'মুঠ' দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে অর্থাৎ কোন স্থানে 'মুঠ' আল্‌গা বা কোন স্থানে চাপিয়া না ধরে, তাহা হইলে নিম্নতল অনেকটা চৌরস হয়। অবহেলা সহকারে লাঙ্গল ধরিলে আল্‌গা মুঠ স্থলে লাঙ্গলবাহী পশুগণ দ্রুতবেগে চলিয়া থাকে সুতরাং সেখানকার নিম্নতল ফালস্পর্শিত হইতে পায় না, কিম্বা নামমাত্র স্পর্শিত হয়। অতঃপর, যে স্থানে 'মুঠ' চাপিয়া ধরে, তথাকার নিম্নতল গভীরভাবে কর্ষিত হয়। এইরূপ মুঠ ধরিবার দোষে পৃষ্ঠভূমির নিম্নতল আঁচড়ান স্থানের ন্যায় অসমতল হয়। লাঙ্গলের ফাল সুঁচাল হইলে নিম্নতল গভীর ও ঘনরূপে কর্ষিত হয় সুতরাং তাহাতে অল্পই খাঁজ হইতে পায়। খাঁজের অল্পতার উপর নিম্নতলের সমতলতা নির্ভর করে। দুষ্ট বা নূতন বলদে লাঙ্গল টানিলে কর্ষণকালে অনেক স্থান এড়াইয়া যায় এবং তাহাতেও নিম্নতলের অসমতলতা সংঘটিত হয়। ক্ষেত্রের বিস্তৃতি অনুসারে কর্ষণার্থ প্রথম লাঙ্গলের পশ্চাতে একাধিক লাঙ্গল চলিয়া থাকে, তদ্দ্বারা কাজ শীঘ্র হয়, স্থান এড়াইয়া যাইতে পায় না। এতদ্ব্যতীত অনেকজন কৃষাণ একত্রে থাকিলে অধিকক্ষণ কাজ করিতে পারে, উপরন্তু কাজ করিতে কষ্ট অনুভব করে না। পশুগণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা, কারণ দেখা

সুকর্ষণের সরঞ্জাম

যায়, কয়েকটী পশু একত্রে কাজ করিলে যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দে কাজ করে। আমরাও অনেক কাজ পাঁচ জনে মিলিয়া করিলে তত ক্লেশ অনুভব করি না, বরং কাজে যেন সমধিক উৎসাহ হইয়া থাকে। যাহা হউক, শুষ্ক-আবাদের জন্য গভীর কর্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। গভীর শুষ্ক-আবাদে বায়ু ও উত্তাপ অধিক প্রবিষ্ট হইলে অধিক দূর নিম্নের মাটি শুষ্ক হইবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু তাহা রোধ করিবার জন্য কর্ষিত ক্ষেত্রের উপরে ভারী চৌকী বা রুল দিতে পারিলে মাটি চাপিয়া যায়, তখন বাতাস বা রৌদ্র তন্মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে না। শুষ্ক আবাদের জন্য যত ঘন করিয়া কর্ষণ করিতে পারা যায় এবং মাটি যত ঝুরা করিতে পারা যায় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিম্নতলের পরিচর্য্যা

নিম্নতলের কিরূপ পরিচর্য্যা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। উপরিভাগের মৃত্তিকা উল্লিখিত প্রণালীতে কর্ষিত হইলেই নিম্নতলের পরিচর্য্যা স্বতঃই হইয়া থাকে। এতদবস্থায় নিম্নতলই প্রকৃতপক্ষে আবাদ-ভূমি, উপরিভাগের মৃত্তিকা তাহার আবরণ মাত্র। উপরিতলের মাটি সুকর্ষিত ও নিম্নতল সুচৌরস থাকিলে তাবৎ বৃষ্টির জল ভূগর্ভ মধ্যে শোষিত হয় এবং সেই জল তদুপরিস্থ ফসল ক্রমে ক্রমে আহরণ করিয়া থাকে। শুষ্ক আবাদের সুবিধার্থ ভূমি হইতে বিন্দুমাত্র জলও বহির্গত হইতে দিতে নাই। অন্তর্ভূমি যাহাতে তাবৎ জল শোষণ করিয়া লইতে পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ক্ষেত্রে ফসল থাকিতে বৃষ্টি হইলে মাটি বসিয়া ক্রমে ফাটিতে আরম্ভ হয়। এরূপ সংঘটিত হইলে ধান্য গোধূমাদির ক্ষেত্রে বিদে দিবার পদ্ধতি আছে, কিন্তু চারা যখন ছোট থাকে তখনই বিদে দেওয়া হইয়া থাকে, গাছ

বড় হইয়া গেলে আর বিদে চলে না, কারণ সে সময় চারা সমূহের দণ্ড বা কাণ্ড অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়া যায়, তাহাতে বিদের ভার পড়িলে ও বিদের চালক বা বলদের পদ দলনে অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। হাত-বিদে ব্যবহার করিলে তাহা হইতে পারে না। হাত-বিদেকে ইংবাজিতে Rake কহে। হাত-বিদে বড় একটা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, বাগান-বাগিচায় কখন কখন ব্যবহৃত হয়। ফসলপূর্ণ ক্ষেত্রের হাত-বিদে ৫।৬ অঙ্গুলির অধিক চওড়া হইলে পরিচালনাকালে বাধা পড়ে। স্থানান্তরে হাত-বিদের (৭নং) চিত্র দেখুন। মাটি চাপিয়া গেলেই হাত-বিদে ব্যবহার করিতে হইবে কারণ তাহা হইলে মাটি বরাবর সরস থাকিবে।

শুষ্ক-আবাদের ফসল

ফসল বিশেষের জন্য বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। কি প্রকার জমিতে কোন কোন ফসলের আবাদ হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া ফসল নির্ব্বাচন করিতে হয়। অল্প রস ভূমিতে যে সকল ফসল থাকিতে পারে, সেং সকল ফসলই শুক্‌না-আবাদের উপযোগী। রবি ফসল সেই শ্রেণীর উদ্ভিদ। বর্ষাকালের ফসলও অনেক সময় শুষ্ক-আবাদের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সময় তাহাদিগকে শুষ্ক-ফসলের (Dry crops) ন্যায় পাট পরিচর্য্যা করিতে হইবে। জমি নিতান্ত নীরস হইলে, তাহাতে দীর্ঘমূল উদ্ভিদের আবাদ করা উচিত। কার্পাস, অড়হর প্রভৃতি এই শ্রেণীর গাছ। ইহাদিগের মূল প্রথমাবস্থা হইতেই ভূমির গর্ভদেশে প্রবেশ করিতে থাকে, এইজন্য উপরিভাগের রসের জন্য ইহারা বড় অপেক্ষা করে না, কিন্তু তাহা হইলেও উপরিভাগ সরস হইলে যে তাহারা আরও ভাল থাকে, তাহাদিগের বৃদ্ধি অধিক হয়, ফসল অধিক হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুষ্ক আবাদের

পক্ষে ঋতু-জীবী, এবং তদপেক্ষা—দীর্ঘজীবী ফসলই সুবিধাজনক। যে উদ্ভিদের যেরূপ পরমায়ু তাহার মূল সেই মত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এইজন্য দীর্ঘজীবী বৃক্ষগণ মানুষের সেবাকে তত গ্রাহ্য করে না। শুষ্ক ভূমিতে দীর্ঘকালস্থায়ী গাছের আবাদ থাকিলে তাহাদিগের পত্র স্খলনে ভূপৃষ্ঠ উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ক্রমে তাহা মৃত্তিকার আবরণ স্বরূপ হয়। ভূপৃষ্ঠ এইরূপে আবৃত হইয়া পড়িলে উপরিভাগের ছিদ্র (Pores) বন্ধ হইতে পায় না, সুতরাং যোগাকর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ভূগর্ভস্থিত রস ক্রমাগত উপরিভাগে উঠিয়া মূলগণের আয়ত্ব মধ্যে আসিয়া পড়ে।

একবিংশ অধ্যায়

—:•:—

রস-রোধ

ভূমির রস শুকাইয়া যাওয়া কৃষকের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, কিন্তু ক্ষেত্রের বার আনা রসই বাতাসে ও রৌদ্রে শুকাইয়া যায় সুতরাং উহা অপচয় হয় বলিতে হইবে। প্রয়োজনকালে মাথা কুটিলে এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না, অথচ কৃষকদিগের অনবধানতাবশতঃ প্রত্যেক ক্ষেত্র হইতেই শত শত মণ জল বাষ্পকারে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যাইতেছে, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়। বৎসরের বারমাস বর্ষাকাল নহে,—বর্ষাকালেও প্রতিনিয়ত বৃষ্টি হয় না, অথচ বর্ষাকালেও সামান্য সুযোগ পাইলেই রস শুকাইতে থাকে, অপর ঋতুতে আরও অধিক শুকায়। এক ইঞ্চ বারিপাত হইলে

প্রতি বর্গ ইঞ্চ ভূমিতে ১১/১৬ কাঁচ্চা মাত্র জল পতিত হয়। যে সকল প্রদেশে সম্বৎসরে ৫।৭ কিম্বা ১০,১৫ ইঞ্চ বারিপাত হয়, তথাকার জল শুকাইতে কতক্ষণ সময় লাগে? দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে এক ইঞ্চ বা ১১/১৬ কাঁচ্চা জল শুকাইতে এক ঘণ্টায় অধিক সময় লাগে কি না তাহা পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কেবল রৌদ্র নহে, বাতাসেও যে জল শুকাইয়া যায় তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাবকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ভূমিকে আবৃত করিয়া রাখিলে ভূমির সর অপচয় হইতে পায় না বরং ভূগর্ভস্থ রস ও তৎসমন্বিত সার পদার্থ উপরিভাগে আসিয়া উদ্ভিদকে যোগান দিয়া থাকে। ভূমিকে আবৃত করিবার প্রথাকে Mulching কহে, কিন্তু—

আবরণ কি?

এক্ষণে দেখা যাউক মৃত্তিকার আবরণ কি। যে কোন জিনিসের দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহাকেই আবরণ বলিতে পারা যায় কিন্তু এ স্থলে কৃষি-কার্য্যোপযোগী আবরণই আলোচ্য বিষয়। ভূমি হইতে সর্ব্বদা বাষ্পউদ্গত হইতেছে—ইহা পরীক্ষার জন্য অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। ক্ষেত্রোপরি কোন স্থানে ইষ্টক, কাষ্ঠ-খণ্ড বা অপর কোন জিনিস পড়িয়া থাকিলে দেখা যায়, তাহার নিম্নভাগ এবং সেই আবৃত ভূমিখণ্ড অল্পাধিক ভিজা থাকে। ভূমি হইতে যে বাষ্প উঠিতে থাকে, আবরণ হেতু বায়ুমণ্ডলে মিশিতে না পারিয়া সেই খানেই স্থান প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে বাষ্প কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। জলের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মাংশ—বাষ্পের ব্যষ্টি আকার; উহাদিগের সমষ্টি,—বাষ্প, এবং বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা,—জল। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বাষ্পের সহিত জলের কোন প্রভেদ নাই, তবে বাষ্প—বিক্ষিপ্ত, জল,—সংক্ষিপ্ত; বাষ্প,—লঘু, জল,—গুরু; বাষ্প,—উড্ডনশীল, জল,—পতনশীল এ সকল জলের

বা বাষ্পের অবস্থাভেদ মাত্র। যাহা হউক, মৃত্তিকার আবরণ মৃত্তিকা! ভূমি হইতে আবরণের মৃত্তিকা স্বতন্ত্র থাকে। মৃত্তিকার ঘনীভূত বা জমাট আকারকে জমি মনে করিয়া লইলে, তদুপরিস্থ ঝুরা মাটিকেও আবরণ বলা যাইতে পারে। এ স্থলে উপরিভাগস্থ ২।৪ অঙ্গুলি পুরু ঝুরা মাটির স্তরকে নিম্নভাগের মৃত্তিকা বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে কর্ষিত ক্ষেত্রের উপরিভাগস্থ লঘু ও ঝুরা মাটিকে আবরণ বলিতে হইবে। উপরিভাগের মৃত্তিকা ঝুরা থাকিলে তন্নিম্নস্থ মৃত্তিকা সরস থাকে। নিম্নতলস্থ মাটিকে সরস ও ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য ক্ষেত্রে বিদে দেওয়া হয়, কখনও বা খুরপী বা নিড়েন করা হয়। এইরূপে ক্ষেত্রের সরসতা সমভাবে রক্ষা করিতে হইলে ঘন ঘন খুরপী বা নিড়েন করিয়া উপরিভাগের মৃত্তিকাকে সাধ্যমত চূর্ণীত অবস্থায় রাখা উচিত।

আবরণের উপাদান

মৃত্তিকা ব্যতীত আবরণের অন্যান্য বহু উপাদান আছে। আবরণার্থ সার ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার পাওয়া যায়। সার ব্যবহারে প্রথমতঃ আবরণের কার্য্য হয়, দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সার দ্বারা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। আঁশাল ও স্থুল উদ্ভিজ্জ পদার্থ, গবাদি পশুর পুরীষ বা তজ্জাতীয় কোন পদার্থ কিম্বা উদ্ভিজ্জ ভস্ম এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ উপযোগী। এতজ্জাতীয় স্থুল সার দ্বারা গাছের গোড়া বা মাটি ঢাকিয়া রাখিলে দুই চারি পসলা বৃষ্টি হইলেও স্থানীয় মাটি তত দৃঢ়রূপে জমাট বাঁধিতে পারে না, ফলতঃ মাটিকে সর্ব্বদা খুরপী করিবার প্রয়োজন হয় না। মাটি দ্বারা মাটি ঢাকিলে কিন্তু সে ফল পাওয়া যায় না, কারণ একবার জল পড়িলেই নিম্নতলের মৃত্তিকার সহিত উপরের মৃত্তিকা একাঙ্গীভূত হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন আবৃত, আবরণের মধ্যে পার্থক্য থাকে না, অগত্যা সত্বরই আবার খুরপী বা নিড়েন করিয়া মাটিকে ঝুরা

করিতে হয়। বাগানের কার্য্যে প্রতিনিয়ত খুরপী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যথায় আবরণের ব্যবস্থা আছে, তথায় এত অধিক বা ঘন ঘন তাহা করিতে হয় না। আমি নিজে আবরণের বড়ই পক্ষপাতী এজন্য উদ্যান কার্য্যে প্রত্যেক গাছেই আবরণ না দিলে যেন আমার তৃপ্তি হয় না! নীল-সিটী, পাতাসার, গোবরসার—এই তিনটী জিনিষ আমি প্রয়োগ করিয়া থাকি। কৃষিক্ষেত্রে যে ব্যবহার করি না তাহা নহে, তবে ফসল বিশেষ আছে। ঘন-রোপিত ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে সার ছড়াইয়া দিতে হয়। দূরে দূরে যে সকল গাছ রোপিত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকের গোড়ায় 'থালা' বা মাদা বাঁধিয়া সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। নবরোপিত গাছের পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। মৃত্তিকার সিক্তাবস্থায় মাটি চালিতে কিম্বা তাহাতে আবরণ দিতে নাই। এরূপ অবস্থায় আবরণ দিলে নিম্নস্থ মৃত্তিকার সহিত উহা ঘনভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে। 'যো' অবস্থায় খুরপী দ্বারা মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গাছের গোড়ায় মাদা করিয়া পরে তাহাতে সার প্রসারিত করিয়া দেওয়া বিধিসঙ্গত। এক অঙ্গুলি হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি স্থূল করিয়া সার দিতে পারা যায়।

সতর্কতা

আবরণ দিবার পর খুরপী করিলে মৃত্তিকার সহিত উহা মিশিয়া যায়, মাটির ভিতর অধিক রৌদ্র ও বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন মৃত্তিকার যোগাকর্ষণ শক্তি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ভূগর্ভস্থ রস সহজে উপরিভাগে আসিতে পারে না। ইহার প্রতিবিধানার্থ খুরপীকৃত মাটিকে ধীরতা সহকারে উত্তমরূপে চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাটিকে এইরূপে চাপিয়া দিলে ভগ্ন ছিদ্রপথ সমূহ পুনঃ সংস্থাপিত হয় কিম্বা নূতন ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়,

পৃষ্ঠভাগের কূপ (Pores) সমূহের আকার সমভাব ধারণ করে। মাটি আল্‌গা থাকিলে ছিদ্রপথ সংস্থাপিত হইতে কালবিলম্ব হয়, তখন উহাকে আপন ভারে বা শিশির-বৃষ্টির চাপনে ক্রমে ঘন হইতে হয়। আবরণের উপকরণ স্থূল অর্থাৎ খড়, কাঠি, বা ঢেলা সংযুক্ত হইলে এবং তাহা মাটির সহিত মিশিয়া গেলে মাটির ঘনতা আরও নষ্ট হয়। এজন্য ঈদৃশ মোটা সার না দিয়া ঈষৎ আঁশাল সার দেওয়া উচিত। আবরণ-সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কি কৃষক, কি উদ্যানক—সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে, কারণ তদ্দ্বারা জলসেচনের ব্যয় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়,—নিরন্তর খুরপী করিবার দায় হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায় ; তাহা ব্যতীত আবরণ থাকিলে ভূমি ঠাণ্ডা থাকে এবং উদ্ভিদগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীসম্পন্ন হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

—:*:—

আগাছা

কৃষকের পরম শত্রু—আগাছা। আগাছা সকল ক্ষেত্রের রস ও সার অপহরণ করিয়া আবাদী ফসলের অভাব সংঘটিত করে। সচরাচর বন্য উদ্ভিদ মাত্রেই আগাছা নামে অভিহিত কিন্তু কৃষকের নিকট আগাছাশব্দের অর্থ আরও বিস্তৃত। ক্ষেত্র মধ্যে আবাদী ফসল ভিন্ন যে কোন গুল্মলতাদি জন্মে, তৎসমুদাই ভূস্বামীর নিকট আগাছা, এবং বস্তুতঃ তাহাই। ক্ষেত্রে যে ফসল থাকে কিম্বা তাহাতে যে

ফসলের আবাদ হইবে, তাহা ব্যতীত উহাতে যে কোন উদ্ভিদ জন্মে তাহাকে সংহার করা কৃষকের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। কর্ষণের ফলে উক্ত শত্রুগণের নিপাত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহাদিগকে নিপাত করা যে কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিলে মৃত্তিকা চূর্ণনাদির প্রয়োজন না থাকিলেও ভূকর্ষণ করিতে আগ্রহ জন্মে।

আগাছায় শত্রুভাব

আগাছা যে কেবল ক্ষেত্রের রস ও সার পদার্থ আহরণ করিয়া ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদকে তাহা হইতে বঞ্চিত করে, তাহা নহে। আগাছার অবস্থান হেতু আবাদী উদ্ভিদ-গণের শাখা পল্লবাদি প্রসারিত হইবার জন্য স্থানের অসঙ্কুলান হয়, ভূগর্ভ মধ্যেও তাহাদিগের মূল সমূহ অবাধে বৰ্দ্ধিত হইবার সুযোগ পায় না,—আগাছার মূলেই ভূগর্ভ পূর্ণ হইয়া থাকে। আগাছাগণ স্বভাবজাত উদ্ভিদ এবং সবল ও তেজাল, কিন্তু আবাদী উদ্ভিদগণ অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রকৃতি। সবলের নিকট দুর্ব্বল চিরদিনই পরাভূত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। আগাছাগণ ক্ষেত্র মধ্যে অযাচিত ভাবে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক আবাদী ফসলের আহার্য্য অপহরণ করে,—ভূপৃষ্ঠে ও ভূমধ্যে স্থানাধিকার করে—ক্ষেত্র মধ্যে বায়ু, আলোক ও উত্তাপ প্রবেশের পথ রোধ করে। অতঃপর আগাছাদিগকে বীজ ধারণ করিতে অবসর দিলে সেই বীজ পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রকে আরও জঙ্গলময় করিয়া তুলে, মৃত্তিকাকে রসহীন করিয়া ফেলে, বায়ুবাদি রোধ করিয়া ফসলের বিনাশ সাধন করে, এক কথায়—ফসলকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। জঙ্গল দেখিবামাত্রেই সমূলে উৎপাটিত করা একান্ত কর্ত্তব্য, বিলম্ব করিলে গাছে বীজ জন্মিবে এবং সেই বীজ ছড়াইয়া

পড়িয়া বহু দিন, বহু বৎসর পর্য্যন্ত উপদ্রব করিবে। আগাছার বীজ সহজে মরে না; দুই চারি, হইতে পাঁচ সাত বৎসর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া সুযোগ পাইলেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বীজ জন্মিবার অগ্রেই বিনাশ না করিলে প্রতি বৎসরই উহারা শুভ দর্শন দিবে। আগাছা সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটী প্রবাদ আছে—One year's seeding, Seven years' weeding.'—ইহার অর্থ এই যে, এক বৎসর বীজ জন্মিতে দিলে বহুকাল ধরিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। উলু, ভেরেণ্ডা, চোর-কাঁটা, শেয়াল-কাঁটা, বন--বেগুন, বন-ওকড়া, চকোর, মুথা, শ্যামা, দুধিয়া—এই কয়টী আগাছা এদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। আবাদী বা নরম জমিতে দুর্ব্বাঘাস বড় দেখা যায় না। পতিত, কঠিন, অনাবাদী ক্ষেত্র ও পথিপার্শ্বে ইহারা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং দুর্ব্বাঘাসকে আমরা তত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক, আগাছা মাত্রেই ফসলের হন্তারক, ক্ষেত্রের অপহারক, উদ্ভিজ্জগতের দুর্দ্দান্ত চোর। বীজ হইবার পূর্ব্বে উহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করা কৃষকের একটি বিশেষ কার্য্য মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। উহাদিগকে উৎপাটিত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া না দিয়া, ক্ষেত্রে থাকিতে দিলে ক্রমে তাহারা বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার অঙ্গীভুত হইয়া যায় সুতরাং অপহৃত অংশ পুনরায় মৃত্তিকার সংযোজিত হয়, মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জাংশ বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে ভুকর্ষণ সময়ে কৃষকগণ ক্ষেত্রস্থ তাবৎ আগাছাকেই ভূশায়ী করিয়া পচিতে দেয়। ইহাকে 'পচান.চাষ' কহে। এতদ্দ্বারা জমি উর্ব্বরা হয়। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার জন্য হরিৎসারের (green manure) ব্যবস্থা আছে। এতদুপলক্ষে কৃষকগণ স্বতন্ত্রভাবে কোন ফসলকে ভূশায়ী করিয়া দেয় না বটে, কিন্তু আগাছাদিগকে ভুশায়ী করিয়া দিলে সে উদ্দেশ্য কতকটা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

উৎপাটিত আগাছা ক্ষেত্র মধ্যে স্থান পাইলে, তৎপরিগৃহিত পদার্থ নিচয় মৃত্তিকা ফিরিয়া পায়, কিন্তু যে রস আহরণ করে তাহা ভূমিতে আর ফেরৎ আসে না। জীবিতাবস্থায় উহারা যে রস পরিশোষণ করে তত্তাবৎই বায়ুমণ্ডলকে প্রদান করে, কেবল নিজ নিজ কলেবর রক্ষার্থ যতটুকু রসের প্রয়োজন তাহাই ধারণ করিয়া রাখে। অনেক স্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া দেয়, পরে সেই সকল স্তূপ অল্পাধিক শুষ্ক হইলে, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। সংগৃহিত আগাছাদিগকে জ্বালাইয়া না দিয়া ক্ষেত্রে পচিতে দিলে সর্ব্বাংশে ভাল হয়। ক্ষেত্র মধ্যে পতিত থাকিয়া বিগলিত হইবার সময় না থাকিলে সচরাচর উহাদিগকে পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করতঃ ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়। সময়াভাব প্রযুক্ত হইলে, আপাততঃ না পুড়াইয়া উহাদিগকে কোন স্থানে বৃহৎ স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিলে ক্রমে পচিয়া সুন্দর উদ্ভিজ্জসারে পরিণত হয়, তখন স্তূপ ভাঙ্গিয়া সমগ্র সারকে ক্ষেত্রময় প্রসারিত করিয়া দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। আবর্জ্জনাকে ক্ষারে পরিণত করিলে তদন্তর্গত সোরাজান (nitrogen) নামক পদার্থ বিমুক্ত হইয়া কেবল মাত্র স্থূল পদার্থ—পটাস, ফস্ফরিক-য্যাসিড্, বালুকা, ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। এ সকল পদার্থ যে কোন উপকারে আইসে না তাহা নহে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে ক্ষেত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহা ব্যতীত উদ্ভিজ্জ (Humus) পদার্থই সোরাজানের আধার। মৃত্তিকামধ্যে উহা না থাকিলে খাদ্যাভাবে জীবাণু (Germs) বৃদ্ধি পায় না কিন্তু ইহারাই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার প্রধান সহায়। আগাছার অনেক দোষ কীর্ত্তন করিলাম কিন্তু—

আগাছা দ্বারা আমরা প্রভূত উপকার পাইয়া থাকি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পতিত, অনুর্ব্বরা বা বালিপ্রধান অথবা আঁটাল জমিতে আগাছা জন্মিলে এবং তাহাদিগকে ভূকর্ষিত করিলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়, বেলে মাটি সারাল হয় এবং শোষণ ও ধারণক্ষম হয়। তাহা ব্যতীত, আঁটাল মাটির আঁটালতা অল্পাধিক হ্রাস প্রাপ্ত হয়, মৃত্তিকার রস শোষণের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অধিক কি—মৃত্তিকা কোমল ও স্থিতিস্থাপক হয়। মৃত্তিকার প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিতে দেওয়ায় লাভ আছে, কিন্তু অধিক দিন বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া কোমলাবস্থাতেই হলচালনা দ্বারা উহাদিগকে ভূশায়ী করিয়া দিতে হইবে—ইহা যেন মনে থাকে। অধিক দিন বর্দ্ধিত হইতে দিলে ভূমির রস কমিয়া যায়। অতিশয় রসা জমিতে জঙ্গল জন্মিতে দিলে উহারা মূল দ্বারা ভূমির রস শোষণ করিয়া পত্র দ্বারা বর্জ্জন করতঃ ভূমিকে শীঘ্রই শুকাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা ভূপতিত হইয়া মৃত্তিকার শোষকতা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তখন আর মৃত্তিকা পূর্ব্ববৎ রসা থাকে না। সেই সকল আগাছা ভূগর্ভ হইতে নানাবিধ পদার্থ আহরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠোপরি আনিয়া দেয়, তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী ফসলের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এ হিসাবে আগাছাদিগকে ফসলের যোগান-দাতা বলিলে চলিতে পারে।

আগাছায় উপকার

উলু ও মুথা ঘাস যত ক্ষতিকর ও ধৈর্য্যচ্যুতিকর, এরূপ কোন আগাছা আছে কিনা সন্দেহ। ইহাদিগকে নির্ম্মূলিত করা বিষম সমস্যার কথা। ইহাদিগের বিনাশের একটী সহজ উপায়—ক্ষেত্রে ঘন করিয়া বীজ বপন করা। ধান্য, মাড়ুয়া, গোধুম, পাট প্রভৃতির ন্যায় ফসল ক্ষেত্রে খুব ঘন

আগাছা বিশেষের উপায়

করিয়া বুনিলে উক্ত আগাছাগণ অঙ্কুরিত হইতে পায় না। উপর্য্যুপরি দুই একটী ফসলের এইরূপ ঘন আবাদ হইলে উহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিম্বা উপ্ত হইবার সুযোগ পায় না। বাগানের আগাছাদিগকে বিনাশ করিবার—কেবল খুরপী ভিন্ন অন্য উপায় দেখা যায় না। বাগান-বাগিচায় বা সব্জী-ক্ষেত্রে নিরন্তর খুরপী করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার হয় এই যে, মৃত্তিকা ঝুরা ও কোমল থাকে। বাগানে সর্ব্বদা খুরপী হয় বলিয়া তথাকার তাবৎ গাছ-পালা তেজাল ও ফলন্ত হয় এবং প্রতিদিন তাহাদিগের জলের প্রয়োজন হয় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—লোকে গোলাপ-ক্ষেত্রকে শীতের প্রারম্ভে কুদ্দালিত করতঃ মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া চৌরস করিয়া দেয় এবং পরে সার ও জল প্রদান করে। ঈদৃশ পরিচর্য্যার ফলে উদ্ভিদগণ সত্বরই কুসুমিত হয়, কিন্তু অপর সময়ে কেহ উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিও করে না সুতরাং সে সময় গোলাপ-ক্ষেত্রকে উপেক্ষিত বা বর্জ্জিত বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে উক্ত ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে পূর্ব্ববৎ তদ্বির করিলে বারমাসই উহারা পুষ্প প্রদান করিতে পারে। উদ্ভিদের ফলনের বা পুষ্পের গুণবত্তার যে ইতরবিশেষ হয় তাহা ঋতু-বিশেষের ক্রিয়া-ফল মাত্র। আর একটী দৃষ্টান্ত বলি—

রাজনগরস্থ দ্বারভাঙ্গা-মহারাজার 'কলম-বাগ' নামে একটী আম্র-কানন মধ্যে ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের পাঁচ শত আম্র বৃক্ষ আছে। কলমের আম্র বৃক্ষগণ ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের হইলে তাহাদিগকে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত বলিতে হইবে কিন্তু উক্ত উদ্যানে কখন কখন ১০।১৫ বা ২০।২৫টী ফল হইত। বলা বাহুল্য—আম্র কাননটী উলূঘাসে আবৃত, এমন কি দিন-মানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হইত। খৃষ্টীয় ১৯০৬ সালে উহা আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সমগ্র ভূমিখণ্ডকে আমি উত্তমরূপে কুদ্দালিত ও মৃত্তিকা চূর্ণীত করিয়া দিই। তাহার ফলে পর বৎসর ন্যূনকল্পে

৫০,০০০ আম্র পাওয়া যায়। সেই অবধি প্রতি বৎসর নিয়মিত পাট হয়,—প্রতি বৎসর ফল ও পাওয়া যায়। এমন ও ঘটে, কার্য্য বিপাকে কোন বৎসর যথাবিধি পরিচর্য্যা হইয়া উঠে না, সে বৎসর ফলনও যথেষ্ট কমিয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এইজন্য—

বন-জঙ্গলকে জ্বালাইয়া না দিয়া জমিকে কর্ষণাধীন রাখা প্রয়োজন। কেবল যে মাটি প্রস্তুত করিবার জন্য কর্ষণ করিতে হয় তাহা নহে, জমির আগাছা বিনাশের জন্য ও উহা বিশেষ প্রয়োজন। বন জঙ্গল ও আগাছা না জন্মিলে লোকে যে জমির এত অধিক পরিচর্য্যা করিত তাহা বিশ্বাস হয় না।

নিস্তৃণতা

আবাদাধীন ভূমি হইতে তৃণোৎপাটন করিবার প্রথাকে (weeding) কহে। নিস্তৃণতা শব্দ হইতে নিড়ান' শব্দের উৎপত্তি বলিয়া, বোধ হয়। নিস্তৃণতা দ্বারা আবাদী ক্ষেত ও বাগবাগিচাকে পরিষ্কার ও মাটিকে আলগা করিয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদের পাদদেশে তৃণ জন্মিতে দিলে উহাদিগের আহার্য্য অপহৃত হয়। চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে ফসলের প্রথমাবস্থায় নানা জাতীয় তৃণাদি জন্মে কিন্তু ফসল কিঞ্চিৎ বাড়িয়া উঠিলে আগাছাগণ আর বড় জন্মিতে পারে না। ঘনভাবে গাছ জন্মিলে আওতাবশতঃ তাহাদিগের উদ্গত ও বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা হয় না। ফলের বা ফুলের বাগানে সচরাচর গাছ-পালা অতিশয় ঘন করিয়া রোপণ করা হয় না। ইহাদিগের পরস্পর মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকে। আম্র, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, নারিকেল প্রভৃতি গাছের পরস্পর-মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। পুষ্পোদ্যানে উদ্ভিদের পুঞ্জ-পরস্পর মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান থাকে। এই সকল ব্যবহিত স্থানে তৃণ জন্মে। এইরূপে ক্ষেত বা বাগানের মধ্যে তৃণ থাকিতে দিলে মাটি ঠাণ্ডা ও সরস থাকে। বালুকাপ্রধান ও হাল্কা মাটিতে যে

সকল বাগান রচিত, তথায় তৃণমণ্ডল থাকিলে মাটি সরস থাকে এবং রৌদ্রের উত্তাপে মাটি উত্তপ্ত হইতে পায় না। এঁটেল মাটির পৃষ্ঠদেশ নিস্তৃণিত হইলে ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া যায়, মাটি জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠ তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে এ সকল বিড়ম্বনা ঘটিতে পারে না। অনেকের বাগ-বাগিচা হইতে লোকে ঘাস কাটিয়া লইয়া যায়, অনেকে চুরী করিয়া লইয়া যায়। বিশেষ আবশ্যক বোধ না করিলে ভূপৃষ্ঠকে তৃণ বর্জ্জিত করিতে নাই। তৃণ অধিক বড় হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে কাস্তে দ্বারা কাটিয়া লইলে চলিতে পারে। উদ্যানস্থ তৃণমণ্ডলের ঘাস কাটিবার জন্য Lawn mower নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় তৃণহীন ভূমি হইতে যে ঝাঁজ উঠে, তাহাতে উদ্ভিদ-গণ বড় ক্লেশ পায়। কোমল প্রকৃতি উদ্ভিদ বা চারা গাছ সকল সেই ঝাঁজে বিমর্ষভাব ধারণ করে ও ঝিমাইয়া পড়ে। ভূমি তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে মাটি উত্তপ্ত হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত তৃণবর্জ্জিত বাষ্প বায়ুমণ্ডলকে অল্পাধিক সরস রাখে স্থতরাং তৃণদিগকে উত্তাপ নিবারক বলিতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

ফাও-ফসল

সময় বিশেষে কোন কোন ক্ষেতকে 'পড়্তি' বা পতিত রাখিতে হয়। কোন জমি অনাবাদী অবস্থায় দীর্ঘ কাল পতিত থাকিলে তাহাকে 'পতিত' বা পড়তি' জমি কহে। বেহার প্রদেশে 'পড়তি' দিবার প্রথাকে 'চৌমাস' কহে।

পড়তি দিবার উদ্দেশ্য,—ক্ষেত্রকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্রাম দেওয়া। উক্ত অবসর কালে 'চৌমাস' প্রাপ্ত জমি হইতে কোন জিনিষ খরচ হইতে পায় না, অধিকন্তু বিরাম হেতু ভূর্ভগস্থ অগলিত পদার্থ সমূহ বিগলিত হইয়া ভাবী ফসলের আহরণোপযোগী হইয়া উঠে। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হইলেও কার্য্যতঃ উদ্দেশ্য মত ফল হয় না কিন্তু তাহা উদ্দেশ্যের বা ভূমির দোষ নহে,—কৃষকের বুঝিবার ভুল। ভূমিকে পতিত রাখিলে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাক, ভূস্বামীর অনর্থক ক্ষতি হইয়া থাকে। যে কয়মাস ক্ষেত্র 'পড়তি' অবস্থায় থাকে, সেই কয় মাসের জমির খাজনা কৃষককে বহন করিতে হয়, অথচ ক্ষেত্রও তাদৃশ উর্ব্বরা হইয়া উঠে না। ক্ষেত্রকে কোন মতে একবারে পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। অনাবাদ বা অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকিলে, যে উদ্দেশ্যে 'পড়তি' দেওয়া যায়, তাহা সুসিদ্ধ হয় না। এজন্য তাহাতে কোন না কোন ফসলের আবাদ করা ভাল। এতদুপলক্ষে অল্প দিন স্থায়ী লতিকা জাতীয় লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গে, ফুটি, কাঁকুড়, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরি-তরকারী উদ্ভিদের কিম্বা মটর, কলাই, নাল, শন প্রভৃতি সীম্বিক (Leguminosæa) জাতীয় গাছের আবাদ করিলে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাই যথেষ্ট মনে করিলে দুইটী উপকার পাওয়া যায়; ১ম—উল্লখিত উদ্ভিদগণের পুরাতন পত্র, ফুল প্রভৃতি ভূপতিত হইয়া মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জতা বর্দ্ধিত করে; ২য়,—উদ্ভিদগণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আবৃত থাকিতে পাওয়ায় মাটির রস অধিক শুকাইতে পায় না এবং তাহার ফলে ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত পদার্থ সমূহ বিগলিত হইবার সুযোগ পায়। ক্ষেত্রকে বিরাম দিবার ছলে এইরূপ আবাদ করা যায় বলিয়া উক্ত আবাদজাত ফসলকে 'ফাও-ফসল' (Catch crop) বলা গিয়া থাকে।

অনাবাদ অবস্থায় পতিত থাকিলে ভূমি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়ে,—

ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া যায়, এতন্নিবন্ধন ভূমিতে যে সকল ফাটল দেখা দেয় তাহাদিগের ভিতর দিয়া ভূগর্ভ মধ্যে সমূহ রৌদ্র ও বাতাস প্রবিষ্ট হইয়া মাটির তাবৎ রস শুকাইয়া দেয়। মাটিতে যথোপযুক্ত রস না থাকিলে তন্মধ্যে জীবাণু (Nitro-bacteria) তিষ্ঠিতে পারে না। জীবাণুর আবির্ভাব ও বংশবৃদ্ধি না হইলে মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ সমূহের বিশ্লেষণ হয় না, স্থূল পদার্থরাশির অর্থাৎ ভূতগণের কিম্বা উদ্ভিজ্জ পদার্থের কোন শক্তি বা ক্রিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত বারি-পাত হইলে তাবৎ জল ফাটলের ভিতর দিয়া ভূগর্ভের অধিকতর নিম্ন-দেশে গিয়া পড়ে, উপরিস্তরের মৃত্তিকা তদ্দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। নিম্নস্তরের সহিত উপরিস্তরের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত না হইলে রসের পরিক্রমণ ক্রিয়া অবরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু ক্ষেত্রে যে কোন ফসল বর্ত্তমান থাকিলে মৃত্তিকা বহু পরিমাণে সজীব থাকে।

ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিবার জন্য যে ফাও-ফসলের আবাদ করিতে হয়, তাহা যেন ভূমির শক্তি-হরণকারী না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ফসল নির্ব্বাচন করা উচিত।

দুইটী প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যবর্ত্তী কাল মধ্যে ফাও-ফসলের আবাদ করিতে হয়, সুতরাং ফাও-ফসলকে ক্ষেত্রে অধিক দিন থাকিতে না দিয়া অল্পদিন মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ভূমিতে চাষ দিতে হয়। পরবর্ত্তী ফসলের আবাদ আরম্ভ করিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে ফাও-ফসলকে সংগৃহীত না করিলে, ফাও-ফসলের পরিত্যক্ত ও অবশিষ্টাংশ মাটিতে সুচারুরূপে মিশিয়া যাইতে পারে না। এই সকল পদার্থ উত্তমরূপে মিশিয়া না গেলে মাটি ফাঁপা থাকে, সুতরাং বায়ুবাদি তন্মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিয়া জমির রস শোষণ করিয়া লয়, পরবর্ত্তী ফসলের বীজ উপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটে, অঙ্কুরিত

উদ্ভিদগণ রসাভাব হেতু বর্দ্ধিত বা ঝাড়াল হইতে পারে না, অধিকন্তু শীর্ণ ও পাংশু বর্ণের হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

উৎপাদিকা শক্তি

সার অথবা মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিদের আহারোপযোগী পদার্থই যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, তাহা নহে। মৃত্তিকা মধ্যে স্বভাবতঃ যে সকল সারসঙ্কুল পদার্থ থাকে, কিম্বা জমিতে যে সার প্রদান করা যায়, উৎপাদিকা শক্তি তাহা-দিগের উপর তত নির্ভর করে না। উৎপাদিকা শক্তি সতন্ত্র জিনিষ। ভূগর্ভস্থ পদার্থ, বায়ুমণ্ডল, সূর্য্যের কিরণ, রস প্রভৃতির সহযোগে ভূমির মধ্যে একটী শক্তি (Force) উৎপন্ন হয় এবং তাহাই উৎপাদিকা-শক্তি। মৃত্তিকায় যে সকল স্থূল বা আসল জিনিষ (Elementary matters) ও জৈব-পদার্থ থাকে তাহাদিগের প্রত্যেক পরমাণু মধ্যে এক একটী শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। সুযোগ ও অবসর ক্রমে তৎসমুদায়ের বিকাশ হইয়া থাকে। উক্ত প্রচ্ছন্ন শক্তিগণকে উদ্দীপিত করিতে পারিলেই উদ্ভিদের অঙ্গসৌষ্ঠবে ভূমির উর্ব্বরতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা গিয়াছে।

অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, ভূমি ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়ে, আবার অনেকের এরূপ ধারণা যে, কোন বুভুক্ষু ফসলের আবাদ করিলে জমি একেবারে নিঃস্ব হইয়া যায় এবং তাহাতে আর কোন ফসলের আবাদ করা চলে না। একথা আবহমানকাল শুনা যাই-

তেছে, কিন্তু কোন ভূমিকে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে দেখা যায় নাই, কিম্বা এমনও শুনিলাম না যে, অমুক ক্ষেত্র দীর্ঘ কালের আবাদ ফলে নিঃস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষকের পিতামহ যে ক্ষেত্রে চাষ আবাদ করিয়াছে, কৃষকের বাপ খুড়াও তাহাতে আবাদ করিয়াছে, কৃষক নিজেও তাহাতে আবাদ করিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, ভূমি চিরদিনের মত নিঃস্ব হইয়া যায়?

ধরিত্রী গর্ভ

সুগভীর ভূগর্ভ উদ্ভিদের খাদ্যভাণ্ডার স্বরূপ। উহার মধ্যে উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ এত অধিক পরিমাণে অবস্থিত যে, তাহার আর নিঃশেষ হয় না। দুই-দশ বৎসর কিম্বা দুই-দশ পুরুষকাল মধ্যেও যদি জমি নিঃস্ব হইয়া পড়া সম্ভব হইত তাহা হইলেও সময় সময় মানব জাতিকে নূতন ও সারবান জমির জন্য দুনিয়ান্তরে যাইতে হইত এবং নূতন করিয়া তথায় চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হইত। এই পৃথিবী মধ্যে মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত জীবকে যখন বাস করিতে হইবে, তখন মধ্যে মধ্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি ফুরাইয়া গেলে চলিবে কেন? উদ্ভিদ ও জীব—এতদুভয় জগতই আহারীয় পদার্থের জন্য একমাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। মৃত্তিকা উদ্ভিদরূপ ধারণ করিয়া শস্যাদি প্রসব দ্বারা জীব জগতের আহার যোগাইতেছে, তাহার বিনিময়ে জীবগণ ধরিত্রীকে সার প্রদান করিয়া আসিতেছে কিম্বা ভুক্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া ভূমিকে প্রত্যর্পণ করিতেছে। যে সকল ভূমিকে আমরা নিতান্ত অনুর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতেও রাশিকৃত উদ্ভিদাহার বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা বলিয়া এরূপ কেহ বলে না যে, তাবৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান।

মৃত্তিকার উপকরণানুসারে ক্ষেত্রবিশেষের উৎপাদিকা-শক্তি অল্প বা অধিক হইতে পারে। দেশভেদে, স্থানীয় অবস্থাভেদে, আবাদ প্রণালী ও কর্ষণের প্রক্রিয়াভেদে কিম্বা দৈব কারণে ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থার অবান্তর ঘটিয়া থাকে। কোন শস্যশালিনী ক্ষেত্রোপরি ঘন একস্তর বালুকা সঞ্চিত হইলে, তাহার প্রকৃতি বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এরূপ পরিবর্ত্তনকে দৈব ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারা যায় না। ভীষণ ভূমিকম্পে অনেক সময় ভূমির প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া সম্ভব। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আসামের ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানের মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঈদৃশ দৈব ঘটনার উপর মানুষের হাত নাই। দীর্ঘকাল আবাদ ও কর্ষণের ফলে মৃত্তিকা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার সংস্কার করা কৃষকের আয়ত্ত বহির্ভূত নহে।

শক্তিক্ষয়ের কারণ

যে যে কারণে ভূমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। অবিরত আবাদ, সমজাতীয় ফসলের পুনঃ পুনঃ আবাদ, চাষের তারতম্য, অনাবৃষ্টি, ভূমির আদ্র্তা, সারাভাব—প্রধানতঃ এই কয়টী কারণে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা হ্রাস পাইয়া থাকে।

অবিরত আবাদ

ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইলে তাহাতে বারম্বার ফসল উৎপন্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে জলাশয় আছে তথাকার কৃষকগণ সেই জলাশয় হইতে জল লইয়া ক্ষেত্রে সেচন করিয়া থাকে। এ সকল সুবিধা না থাকিলে এত অধিক বার আবাদ হইতে পারিত না। সকল ক্ষেত্রের পক্ষেই দুইটী ফসল প্রশস্ত। সম্বৎসর মধ্যে দুইটি—ভাদুই কিম্বা আমন, আমন

ও রবি—এইরূপ দুইটী ফসলের আবাদ হইলে জমিকে পীড়ণ করা হয় না কিন্তু তিনটী ফসলের আবাদ করিলে ক্ষেত্র আদৌ বিশ্রাম পায় না। ফসল পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী কাল মধ্যে কিঞ্চিত ব্যবধান থাকিলে কর্ষণাদি পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্যকাল দীর্ঘ হয়, তন্নিবন্ধন রৌদ্র, বায়ু ও শিশিরাদির সংযোগে মৃত্তিকা মধুর হয়। এক ফসল সংগৃহীত হইবার পর অব্যবহিতকাল মধ্যে ক্ষেত্রের কর্ষণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া অপর ফসলের সূত্রপাত করিলে মৃত্তিকা অধিক দিন উহাদিগের সংস্পর্শে থাকিতে পায় না। সুতরাং ভুগর্ভস্থিত আবদ্ধ উত্তাপাদিও বহির্গত হইবার এবং বায়ুমণ্ডল হইতে মৃত্তিকা টাট্কা সামগ্রী আহরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পায় না। কেবল তাহাই নহে। সকল উদ্ভিদের মূলে এক প্রকার অম্ল (acid) থাকিতে দেখা যায়। উক্ত অম্ল দ্বারা মূলগণ মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ সমূহকে পরিশোষণ করিবার পূর্ব্বে পরিপাক করিয়া লয়। ক্ষেত্র হইতে ফসল উঠিয়া গেলেও উক্ত অম্ল মৃত্তিকা মধ্যে অল্পাধিককাল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সে অম্ল পরবর্ত্তী ফসলের পক্ষে রুচিকর নহে, এইজন্য সেই অম্লসম্বলিত মৃত্তিকায় পরবর্ত্তী ফসল ভাল থাকিতে পারে না। অতঃপর ইহাও দেখা যায়—নূতন ক্ষেত্রে আবাদ করিলে প্রথম ২।১ বৎসর তাহার যেরূপ ফলন হয়, তাহার পরে সেরূপ হয় না। এতদ্দারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উর্ব্বরতার একটা সীমা আছে, সেই সীমায় পৌঁছিলে উর্ব্বরতার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই অবস্থাকে ক্ষেত্রের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রের শক্তিকে পীড়ন করিলে কোন লাভ নাই সুতরাং ক্ষেত্রের শক্তি অনুসারে তাহাতে আবাদ করিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন আবাদ করিলে ক্ষেত্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং

তজ্জাত উদ্ভিদ শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এরূপস্থলে ক্ষেত্রে কোন ফাও ফসলের আবাদ করা উচিত। ভূমি শক্তিহীন হইবার অন্য কারণ—

সমশ্রেণীস্থ ফসলের পুনঃ পুনঃ আবাদ হওয়া। ধান্য, গোধুম, মাড়ুয়া, ভুট্টা, কাওন, প্রভৃতি তৃণসদৃশ উদ্ভিদগণ সমপ্রকৃতি। ইহাদিগের আবাদের পর দাল, কড়াই প্রভৃতি প্রজাপতিপুষ্পক (Papillionacæ) উদ্ভিদের আবাদ করা প্রশস্ত। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, ধান্য, মাড়ুয়া কাওন প্রভৃতি বর্ষাকালের ফসল সংগৃহিত হইবার পর গোধুমের আবাদ হয়, কিন্তু তাহা ক্ষেত্রের ক্ষতিকর এবং পর্য্যায় পদ্ধতির অননুমোদিত। কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল বুনিতে হয়—স্থানীয় কৃষকগণ তাহা সবিশেষ বুঝে, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। সকল জেলার পর্য্যায়-প্রণালী সমান নহে, এজন্য পর্য্যায়ের নিয়ম এস্থলে দেওয়া গেল না। স্বর্গীয় বন্ধু ৺ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Hand Book of Agriculture নামক পুস্তকে তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সম জাতীয় উদ্ভিদ

মৃত্তিকা সারবান হইলেও অনাবৃষ্টি হেতু উদ্ভিদগণ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মাটিতে সমুচিত রস না থাকিলে তদন্তর্গত স্থূলপদার্থ সমূহ বিগলিত হইতে পারে না, বিগলিত পদার্থও রসের অল্পতাহেতু উদ্ভিদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কৃত্রিম উপায়ে জল সেচন করিতে পারিলে স্বভাবতঃ নিতান্ত অনুর্ব্বর ভূমিতেও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। একদিকে যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, অন্য দিকে—

রসাভাব

ভূমি অতিশয় আর্দ্র থাকিলে ধান্যাদি জলজ উদ্ভিদ ভিন্ন কোন

উদ্ভিদ তাহাতে আরাম পায় না। রসা জমির উত্তাপ স্বভাবতঃ

আর্দ্রতা

কম বলিয়া তজ্জাত উদ্ভিদের স্বাস্থ্যহানী হইয়া থাকে, এইজন্য সঞ্চিত জল নিকাশের ব্যবস্থা না করিলে তাহাতে বারোমাস সুশৃঙ্খলে আবাদ করা চলে না। অতঃপর—বারম্বার আবাদহেতু উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইলে সার প্রয়োগ

সারাভাব

দ্বারা ভূমির অভাব পূরণ করিয়া দিতে হয়। মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ যথেষ্ট সার বিদ্যমান থাকিতেও সার প্রদান করিলে ফসলে সত্বরই তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকগণ সার প্রদান করিতে পারে না বলিয়া ফসলের ফলন দিন দিন এত অধিক হ্রাস পাইতেছে। ক্ষেত্রে যতই সার থাকুক, প্রতি ফসলের সহিত তাহার সারাংশ যে অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ক্ষেত্রে সার দিলে ভূমির স্বাভাবিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

—:০:—

চাষ ও উর্ব্বরতা

ভূগর্ভ মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি অতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। উক্ত শক্তিকে উদ্দীপিত করিতে পারিলেই ভূমির উর্ব্বরতা দৃষ্টিগোচর হয়। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন প্রথামত একই প্রণালীতে ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া থাকে। প্রচলিত যে সকল লাঙ্গল দেখা যায় তদ্দ্বরা কেবল ভাসা-চাষ (shallow ploughing) হইয়া থাকে। সকল সময়ে একই ভাবে ক্ষেত্র কর্ষিত

হইলে মনোমত বা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এক ফসলের জন্য ভাসা-চাষ, পরবর্ত্তী ফসলের জন্য গভীর-চাষ (deep-ploughing) দিলে সম্যক উপকার পাওয়া যায়। অবিরাম ভাসা-চাষ দিলে উপরিভাগের মাটির স্তর হইতে উদ্ভিদের আহার্য্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় কিন্তু গভীর-চাষ দ্বারা উপরিভাগের আপাতনিঃস্ব মৃত্তিকাকে উল্টাইয়া নিম্নদিকে, এবং নিম্নাংশের সারবান মৃত্তিকাকে উপরিভাগে আনিতে পারা যায়। উপরিভাগের মাটি হইতে ক্রমশঃ সার পদার্থ কমিয়া যায় কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে অজীর্ণাবস্থায় যাহা বর্ত্তমান থাকে তাহা নিম্নদেশে গিয়া ক্রমে বিগলিত হইয়া ভবিষ্যতে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। তাহা ব্যতীত, উপরিভাগস্থ মাটির ভিতর দিয়া যে সকল সার পদার্গ চুয়াইয়া নিম্নে নামিয়া যায় তাহাও তথায় গিয়া সঞ্চিত হয়। এইজন্য উভয় স্তরের মাটিকে উলট-পালট করিয়া রাখিতে পারিলে তত নিঃস্বতা কখনই উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকাকে সর্ব্বদা জীবন্ত রাখিবার জন্য ইহা একটী প্রধান উপায়। এতদুপলক্ষে Leslie Co'র 'Hindustan Plough' বিশেষ ফলপ্রদ। এ গরীব দেশে কৃষকগণকে এ পরামর্শ দিতে ইচ্ছা হয় না। দুই তিন টাকা মূল্যের দেশী লাঙ্গল—তাহারই কৃষকগণ মেরামত করিয়া উঠিতে পারে না,—ভাল বলদ রাখিতে পারে না, বলদকে পূর্ণ আহার দিতে পারে না, তখন তাহারা কিরূপে লেস্‌লি কোম্পানীর ১২।১৩ টাকা দামের লাঙ্গল কিনিবে? আর সে লাঙ্গল টানিবার জন্য বৃহৎ ও বলিষ্ঠ বলদই বা কোথায় পাইবে? বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তি দিগের পক্ষে উন্নত লাঙ্গল ব্যবহার করাই শ্রেয়। উন্নত লাঙ্গল ব্যবহার করায় বিশেষ লাভ এই যে—

কর্ষণকালে মাটি একেবারে উল্টাইয়া যায়,—মাটি গভীররূপে

কর্ষিক হয়, ফলতঃ তজ্জাত তৃণ ও আগাছা সমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া মাটির নিম্নে গিয়া পড়ে—ক্ষেত্রে শীঘ্র ও অধিক জঙ্গল জন্মিতে পায় না,—গৃহস্থের নিড়াইবার খরচও অনেক কমিয়া যায়। উপরন্তু উৎপাটীত তৃণাদি বিগলিত হইয়া ক্রমে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়, মৃত্তিকা সারবান হয়।

সুকর্ষণের ফল

সাধারণ আবাদের মাটি ৬=অঙ্গুলি পরিমিত গভীর হইলেই যথেষ্ট। এক বিতস্তি মাটিকে উত্তমাবস্থায় রাখিতে পারিলেই সকল কাজ চলিতে পারে। উপরিভাগের উক্ত এক বিতস্তি মাটিতে যে কত সার পদার্থ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, তবে মোটামুটী হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি বিঘার আট ইঞ্চ মৃত্তিকা মধ্যে ৫০=মণ যবক্ষারজান ৮৫=মণ ফস্ফরিক য়্যাসিড, এবং ২৫০=মণ পটাস থাকে। যে সকল জমির আট ইঞ্চ মাটীর মধ্যে প্রতি বিঘার উল্লিখিত পরিমাণ যবক্ষারজান, ফস্ফরিক য়্যাসিড, পটাস থাকে, তাহা অতি নিকৃষ্ট জমির মধ্যে গণ্য,কিন্তু উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সারবান জমিতে ৭৫=মণ যবক্ষারজান, ১২৪=মণ ফস্ফরিক য়্যাসি‍ড্‌ এবং ৬২৫=মণ পটাস থাকা অসঙ্গত নহে। উৎকৃষ্ট জমির কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিকৃষ্ট জমির বিষয় অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই যে, তাহাতে বিবিধ ও রাশি রাশি উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সঞ্চিত সার কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া ও কার্য্যে নিয়োজিত করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য। ভুমিতে সার নাই, ভুমি নিঃস্ব,—এরূপ কথা যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা কৃষি বিষয়ের কোন কথা বলিবার যোগ্যই নহেন—তাঁহাদিগের কথার মুল্যই নাই। স্বভাবতঃ মৃত্তিকা মধ্যে এত সামান্য পরিমান সার বর্ত্তমান থাকিলেও ক্ষেত্রে সার প্রদান করিবার তত আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না। এইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৃত্তিকার উপাদান

ও চূর্ণতার উপর উর্ব্বরতা যত নির্ভর করে, সারের উপর তত নহে। নিকৃষ্ট ভূমিতে সার সংযোজিত হইলে উৎপাদিনী শক্তি যে বৃদ্ধি পায় তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের চাষীগণ ক্ষেত্রে সার প্রদান করিতে অক্ষম, এজন্য মৃত্তিকা মধ্যে স্বভাবতঃ যে সার সংগৃহীতাবস্থায় অব্যবহৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই যাহাতে ফসলের কাজে লাগে, সে জন্য সচেষ্টা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সুকর্ষণ দ্বারা আমাদিগের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে

কার্পাস বা অড়হরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী যে সকল গাছের মূল ভূগর্ভ মধ্যে দুই হাতেরও অধিক নিম্নে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহারা উল্লিখিত আট ইঞ্চ অতিক্রম করিয়া নিম্নদিকে প্রবেশ করিলেও তথায় তদনুরূপ পোষণোপযোগী পদার্থ প্রায় সমপরিমানেই পাইয়া থাকে, কারণ নিম্নস্তরেও সার পদার্থের অভাব নাই

খরচ ও যোগান

ভূমিতে যত উদ্ভিদ-খাদ্য বিদ্যমান থাকে তৎসমুদায়ই যে নিরন্তর ব্যবহারোপযোগী হইয়া আছে, তাহা নহে। আবাদী ক্ষেত্রের সার এক দিকে যেমন ব্যয় হইতে থাকে অন্যদিকে তেমনি অজীর্ণ পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া ক্রমশঃ ব্যবহারোপযোগী হইতে থাকে। তাবৎ সারাংশ সর্ব্বদা উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া থাকিলে তাবৎ ক্ষেত্রেই অবিশ্রান্তভাবে আবাদ করা চলিত, তাহার ফলে—কালক্রমে বা অল্পদিন মধ্যেই জমি একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িত। ক্ষেত্র হইতে এক ফসল সংগৃহিত হইবার অব্যবহিত পরেই অন্য কোন ফসল আরম্ভ করিলে প্রথমাবস্থায় তাহার বৃদ্ধি তত ত্বরিত হয় না, ক্রমে যত দিন যায় তত তাহারা পুষ্টি লাভ করিতে থাকে, তত তাহাদিগের বৃদ্ধি ত্বরিত হয়। অনুধাবন করিলে সহজেই ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সদ্য

ব্যবহারোপযোগী সার পদার্থ পূর্ব্ব ফসল দ্বারা আহরিত হইয়া যাওয়ায় মৃত্তিকার হয়ত আপাততঃ কোন কোন পদার্থের অভাব থাকে কিন্তু ক্রমে ক্রমে জল, বায়ু, শিশির ও রৌদ্রের প্রভাবে সেই সকল পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুতে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারে আসিবার উপযোগী হয়।

একই ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি দুই চারিবার আবাদ হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি কিয়দ্দিনের জন্য স্থিতিশীল হইয়া পড়ে। এতদ্দ্বারা ইহা মনে করা ভুল যে, ভূমি সারহীন হইয়া পড়িয়াছে। সার থাকিতেও কখন কখন ভূমির এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ নিচয় হয়ত আপাততঃ উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী নহে, কিম্বা হয়ত সে সকল পদার্থ এখনও উদ্ভিদের আহারণোপযোগী হয় নাই। মৃত্তিকান্তর্গত স্থুল পদার্থ অননুমেয় আকারে পরিণত হইয়া রসের সহিত একেবারে উত্তমরূপে মিলিয়া না গেলে উদ্ভিদগণের মুল কোন পদার্থকে আহরণ করিতে পারে না। সকল স্থুল পদার্থেরই একটী সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অবস্থা আছে। সেই অবস্থায় উহারা পরিণত হইলে উদ্ভিদের মুল তাহা গ্রহণে সমর্থ হয় কিন্তু ইহা নির্ণয় করা যায় না যে, উক্ত পদার্থ নিচয়ের কত পরিমাণ আপাততঃ ব্যবহারে আসিবাব উপযোগী। রসায়নবিদগণ আজও পর্য্যন্ত ইহার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে আমরা সহজ বুদ্ধিতে পারি যে, কোন্ জমি ফসল গ্রহণের উপযোগী—আর কোন জমি নহে। ক্ষেত্র হইতে ফসল সংগৃহিত হইবার পর যে কোন ফসলের আবাদ করা যায়, তাহার অঙ্কুরোদ্গম, বৃদ্ধি প্রভৃতির গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, মৃত্তিকার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ। উক্ত ক্ষেত্রে শেষ ফসলের শ্রীবৃদ্ধি না

হইলে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্তিকা তখনও উদ্ভিদের উপযোগী হয় নাই। যতই নিকৃষ্ট জমি হউক, তাহাতে উদ্ভিদকে জন্মিতেই হইবে। জন্মিয়া সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হওয়া ও ফল প্রদান করা উদ্ভিদের ধর্ম্ম। গাছ জন্মিল কিন্তু তাহা বাড়িল না, ফল ফুল প্রদান করিল না কিম্বা যাহা প্রদান করিল তাহা অকিঞ্চিৎকর হইল। ঈদৃশ আবাদে অর্থ নষ্ট ও শ্রম পণ্ড হয় মাত্র।

বাঁজা ভূমি

বাঁজা (Sterile) জমির কথা স্বতন্ত্র। বাঁজা জমিতে যে কোন উদ্ভিদ জন্মে না, তাহার কারণ মৃত্তিকান্তর্গত উপাদান-ভেদ, বিশেষ বিশেষ উপাদানের অভাব বা সমধিক প্রাচূর্য্যতা, মৃত্তিকার শোষকতা বা ধারকতার অভাব, উদ্ভিজ্জীবনের বিনাশকারী পদার্থের অবস্থান ইত্যাদি। উষর বা লোনা জমি, মরুভূমি, বোদ মাটী প্রভৃতি বাঁজা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়

—:০:—

উর্ব্বরতার লক্ষণ

উদ্ভিদগণ ভূমির উর্ব্বরতা নির্ণয়ের যন্ত্র স্বরূপ। উদ্ভিদের অবস্থা দেখিলেই ভূমি উর্ব্বরা কি না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার লক্ষণ, স্থূলতা ও রসালতা, পত্রাধিক্য, পত্রের পূর্ণতা ও বর্ণের ঘনতা দেখিলে উদ্ভিদ যে সবল ও সুস্থকায় তাহা বুঝিতে পারি। যে ক্ষেত্রের উদ্ভিদে এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মৃত্তিকা সারবান। সার-

নিঃশেষিত বা অল্পসার ভূমির উদ্ভিদগণ শীর্ণ, বিবর্ণ, পত্রাল্প বা পত্রহীন হইয়া থাকে। সারবান ভূমির উদ্ভিদ তেজাল হইয়া থাকে। অনেক স্থলে সারবান ক্ষেত্রের উদ্ভিদকে নিঃস্ব ক্ষেত্রজাত উদ্ভিদের ন্যায় হইতে দেখা যায়। অনেকে প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ভূমির দোষ দিয়া থাকেন। মৃত্তিকার যথোচিত পরিচর্য্যা না হইলে কিম্বা মৃত্তিকা নীরস হইলে ভূগর্ভস্থ সার দ্বারা উদ্ভিদের কোন উপকার হয় না। মৃত্তিকার শক্তি উর্ব্বরতা হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। উর্ব্বরতার আধার,—ভূগর্ভস্থ সার পদার্থ। ইহা দ্বারা উদ্ভিদগণের আহার্য্যের সংস্থান হয়। ইহাদিগের সমাবেশ ও পরিচর্য্যা গুণে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব হয়।

ভূমিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব হইলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা হ্রাস পাইয়া থাকে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে ফাও-ফসলের আবাদ করা উচিত। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে 'ফাও-ফসল' আলোচিত হইয়াছে। ভূমিতে রাশিকৃত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ বর্ত্তমান থাকিতেও মাটি কঠিন হইয়া গেলে তাহাতে কোন উদ্ভিদ ভাল থাকিতে পারে না। মূল দ্বারা উদ্ভিদগণ আহার্য্য আহরণ করে, মৃত্তিকা কঠিন থাকিলে মূলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা, যে সকল ইতঃপূর্ব্বে জন্মিয়াছে, তাহারাও বিস্তৃত হইতে না পারিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া অবস্থান করে! ভূমির পৃষ্ঠদেশ কর্ষিত থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে কিন্তু তাদৃশ বৃদ্ধিশীল হইতে পারে না। নিম্নতলের (sub-soil) সহিত উপরিতলের (Surface) ঘন সম্বন্ধ থাকিলে উদ্ভিদের মূল, সংখ্যায় ও দীর্ঘে বর্দ্ধিত হইয়া যথাবশ্যক সার এবং সেই সঙ্গে আহার্য্য শোষণ করিতে সমর্থ হয়। উভয়তলের এইরূপ সম্বন্ধ রাখিতে হইলে মৃত্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকা স্থিতিস্থাপক, কোমল ও রসাল হয়, উপরন্তু

রস ও উত্তাপ শোষণ ও ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে মৃত্তিকায় সোরাজানের সংস্থান হয় তন্নিবন্ধন জীবাণুগণের বংশ বৃদ্ধি হইয়া ভূমিতে সোরাজান সঞ্চিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। অনন্তর মৃত্তিকা উত্তম সরস অবস্থায় থাকিলে উদ্ভিদগণ যথেষ্ট রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং আহার্য্য পদার্থও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ লাভ করে। বর্ষাকালে যে উদ্ভিদের এত বৃদ্ধি হয় তাহার অন্যতম কারণ—রস-প্রাচুর্য্য। অপর ঋতুতে ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার নিয়ম আছে। সে সময়ে যে জমিতে জলসেচিত হয়, তজ্জাত উদ্ভিদ উল্লিখিত কারণেই বৃদ্ধিশীল হয়। উদ্ভিদ যদি কেবল জলই আহরণ করে, তাহা হইলে উহার অঙ্গ সৌষ্টব কখনও দৃঢ় হইতে পারে না। কেবল রসে গাছ বাড়ে না। উদ্ভিদের যে স্থূল শরীর তাহা স্থূল পদার্থেরই সমাবেশ মাত্র কিন্তু ভিন্নরূপে প্রকাশিত। উদ্ভিদমূল যে রস আহরণ করে তাহা গাছের হরিতাংশ দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে কিন্তু সমুদায় রস নির্গত হইয়া গেলে গাছের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র জলে—কি উদ্ভিদ, কি জীব—কেহই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, অধিকন্তু স্থূল ও পুষ্টিকর পদার্থের অভাবে অঙ্গ-সৌষ্টবের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাই হইল জগতের সাধারণ নিয়ম।

বারিকৃচ্ছতা

নিম্নবঙ্গ ভিজা দেশ বলিয়া 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা'। পশ্চিম বঙ্গ, রাঢ় দেশ, বেহার, যুক্ত-প্রদেশ প্রভৃতির মাটি সারসঙ্কুল হইলেও বারিপাতের অল্পতাহেতু ভূগর্ভস্থ সার পদার্থ অতি অল্পই ব্যবহারিক কার্য্যে আসে। বারিকৃচ্ছদেশে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত থাকিলে দেশে কি অজন্মা হয়, না প্রতিনিয়ত দুর্ভিক্ষ হয়? দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকে অনেক

কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার—মনে হয়, মনে হয়, কেন—বিশ্বাস যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিলে দেশ রক্ষা পায়। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে নানা দিকে খাল খনন করিয়া দেওয়ায় সহস্র সহস্র বিঘা ভূমি আবাদোপযোগী হইয়াছে,—কত লক্ষ্য লক্ষ্য নরনারী,—সেই সঙ্গে কত লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশু—প্রতিপালিত হইতেছে! মৃত্তিকায় রসের পরিমাণ জ্ঞাত হইতে পারিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মৃত্তিকা মধ্যে লক্ষ্য লক্ষ্য মণ উদ্ভিদখাদ্য বর্ত্তমান থাকিতে যদি তাহা রসহীন হয় তাহা হইলে সে জমি মরুভূমির ন্যায় অকর্ম্মণ্য,—সে জমি সংসারের কোন কাজেই আসে না।

ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সিক্ত ও উত্তাপহীন জমিও সাধারণ কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। উচ্চ ও শুষ্ক জমিতে রসাভাব বা রসের অল্পতাহেতু যেরূপ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা প্রচ্ছন্ন থাকে, সিক্ত ও শৈত্য ভূমিতেও ভৌতিক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ উৎপাদিকা শক্তি নিদ্রিত থাকে। ঈদৃশ ভূমিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইলে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। অতঃপর বর্ত্তমানে কোন ফসলকে হরিৎসারে পরিণত করিতে পারিলে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা হয়, কারণ এতদ্দ্বারা ভূমির সিক্ততা অনেক কমিয়া যায়, ফলতঃ, ভূগর্ভস্থ সার উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইবার সুযোগ পায়। তাবৎ আবাদী ক্ষেত্রই প্রভূত সার পদার্থে পূর্ণ, কিন্তু উদ্ভিদগণ তাহার যৎসামান্য অংশই আহরণ করিয়া থাকে সুতরাং জমিতে সারের প্রায় অভাব হয় না, তাহা হইলেও মৃত্তিকাকে সর্ব্বদা উর্ব্বরা রাখিবার জন্য সুকর্ষণ, জল-নিকাশ, আবাদ পর্য্যায় ও ক্ষেত্রে সার সংযোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

—:০:—

অনূঢ় (Virgin) ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম যত অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে সেইরূপ প্রায় হয় না। এইরূপে যত দিন যায়, অবিচ্ছন্নরূপে আবাদ হইতে থাকায় ক্ষেত্রের শক্তি তত কমিয়া আসে—ইহা সকলেই অবগত আছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষেত্র দশ মণ ফসল প্রসব করিতে পারিত আজ হয়ত তাহাতে পাঁচমণ হয়, আবার কিছু দিন পরে পাঁচ মণ অপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে। ভূগর্ভ সার পদার্থে পূর্ণ বলিয়া প্রতিনিয়ত আবাদ হওয়াতেও ক্ষেত্র নিঃস্ব হইয়া পড়ে নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন বৎসর ফসল অধিক জন্মে, কোন বৎসর কম জন্মে। ক্ষেত্রের শক্তি প্রতিবৎসর হ্রাস পাইতে থাকিলে ফসলের পরিমাণ প্রতি বৎসর কম হইতে থাকিবে—কোন বৎসর বাড়িতে পারে না। যখন হ্রাস, বৃদ্ধি আছে, তখন ইহার অন্তরালে যে কোন কারণ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা সুনিশ্চিত। বিশেষ বিশেষ কারণে মৃত্তিকার অবস্থান্তর হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি বা বারিকৃচ্ছ বৎসরে ফসলের বৃদ্ধি তাদৃশ অধিক হয় না, সুতরাং সে বৎসর ফসল অধিক জন্মে না, কিন্তু বারিপাত হইলে মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ সমূহ বিগলিত হইবার সুযোগ পায়, এবং বিগলিত হইয়া সহজে ও অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। মাটিতে রস অল্প থাকিলে সমূহ তেজস্কর জমিরও ফলন কমিয়া গিয়া থাকে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষা করা মনুষ্যের চেষ্টা বা সাধ্যের অতীত নহে। আমরা চেষ্টা ও যত্ন করিলে ক্ষেত্রের

উর্ব্বরতা রক্ষার উপায়

উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে পারি এবং বাড়াইতে ও পারি, তখন আমাদিগের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

আবাদী ফসল সংগৃহিত হইলে তাহার সহিত ক্ষেত্রের যে সারাংশ চলিয়া যায় তাহাতে ক্ষেত্রের শক্তির অভাব না হইলেও উক্ত পদার্থ ক্ষেত্রে থাকিতে পাইলে যে ভাল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উর্ব্বরতাকে সমভাবে রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে সার প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। যে ক্ষেত্রে সার পদার্থের অভাব বা অল্পতা বুঝিতে পারা যায় তাহাতেই সার প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে; সার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়।

ক্ষেত্র মধ্যে স্বভাবতঃ যে পরিমাণ সার পদার্থ সঞ্চিত আছে তাহার অনুপাতে প্রত্যেক ফসল যে পরিমাণ সার পদার্থ উহা হইতে আহরণ করে, তাহা অতি যৎসামান্য সুতরাং সহস্র সহস্র বৎসর আবাদ হইলেও তাহা নিঃশেষিত হইবার নহে। কিন্তু সদ্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থের পরিমাণ আপাততঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়াই অবিচ্ছিন্ন আবাদের ফলে ক্ষেত্রের ফলন কিছুদিনের জন্য কমিয়া যায়। হাল্‌কা ও বেলেমাটির সংগঠন তাদৃশ ঘন নহে বলিয়া বর্ষা কালে উপরিভাগস্থ সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়, তন্নিবন্ধন উপরিভাগের মৃত্তিকায় আপাততঃ উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থের অনটন বা অভাব হয়। এই কারণে ঈদৃশ জমিতে নিরন্তর সার প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা তাহাতে আবাদ করিয়া কোন ফল লাভ হয় না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবাদ হওয়ায় ও ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ সার প্রদত্ত হওয়ায় মৃত্তিকারও অবয়ব পরিপুষ্ট ও সারাল হয়, ফলতঃ তাহার প্রকৃতির ও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা চিরকাল সংরক্ষিত হইয়া

আসিতেছে। ভূমি যতই অনুর্ব্বরা হউক তাহাতে তত আসিয়া যায় না, কিন্তু সুকর্ষণ অর্থাৎ ক্ষেত্রে বারম্বার হলচালনা করা, ক্ষেত্রকে গভীর রূপে কর্ষণ করা, মৃত্তিকা চূর্ণ করা এবং ক্ষেত্রে শীতোত্তাপ রক্ষা করা ইত্যাদির দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ধৌত ভূমি

ভূমি হইতে যে পরিমাণ সার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদায়ই যে ফসলের দ্বারা গৃহিত হইয়া থাকে তাহা নহে। বর্ষাকালের বৃষ্টিতে অনেক জমি ধুইয়া যায়, সেই সঙ্গে তাহার উপরিভাগের অনেক সূক্ষ্ম সার-মাটি তিরোহিত হয়। মৃত্তিকার শক্তিহীন হইবার ইহাও একটী বিশেষ কারণ। প্রতি পসলা বৃষ্টিতেই যে জমি ধুইয়া যায় তাহা নহে। সচরাচর প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইলেই প্রায় এইরূপ ঘটে কারণ তখন জমিতে এত শীঘ্র জল সঞ্চিত হয় যে, মৃত্তিকা তাহা শোষণ করিয়া লইবার অবসর পায় না। ঝিম্-ঝিমে বা অল্প অল্প বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকা তাহা অবিলম্বেই শোষণ করিয়া লইতে পারে সুতরাং তদ্দ্বারা জমির কোন ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারই হইয়া থাকে।

ঢালু ও বন্ধুর জমি হইতে এইরূপে মৃত্তিকার সূক্ষ্ম সার ভাগ বহির্গত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সমতল ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লয়। ইতঃপূর্ব্বে

বলা হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম পরমাণুই উদ্ভিদের আপাততঃ আহরণোপযোগী সার পদার্থ, সুতরাং তাহা নির্গত হইয়া গেলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ও দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষেত্র বিধৌত হইয়া ধোয়াট মাটি ক্ষেত্রান্তরিত হইলে ভূমির শক্তি যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দুই একবার ধুইয়া গেলে তত আসিয়া যায় না, কিন্তু মৃত্তিকার স্থূল ও অনূঢ় পদার্থ যতই বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতির সাহায্যে সূক্ষ্মাংশে পরিণত হইবে, ততই যদি তাহা বিধৌত হইয়া স্থানান্তরে নীত হয়, তাহা হইলে সে জমিতে কোন কালেই সার সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিবে না, অগত্যা অত্যল্পকাল মধ্যে উহা অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে।

ধোয়াট-রোধ

পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে রাশি রাশি সূক্ষ্ম মাটি বিধৌত হইয়া তরাই ভূমিতে স্থান পাইতেছে সুতরাং সেরূপ জমি দিন দিন ভরাট ও সারপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে উচ্চ ও গড়েন ভূমি সমূহ কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে এবং উপরিভাগে সূক্ষ্ম মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে শিলা কঙ্কর দেখা দিতেছে। ধোয়াট হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঈদৃশ গড়েন জমিকে চকবন্দি ও থাকবন্দি করিয়া লইতে হয়। এ দেশের কৃষকগণ এ প্রথা বহুকাল হইতেই অবগত আছে। ক্ষেত্র মধ্যে বর্ষার জল আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই কৃষকগণ স্বস্ব ক্ষেত্রের চতুপার্শ্বে আল বা বাঁধ দিয়া রাখে। ইহাকেই চকবন্দি কহে। ক্ষেত্রের জল আটক করা ও সার আটক করা—একই কথা এবং এক উদ্দেশ্যে দুই কার্য্য সমাহিত হয়। ক্ষেত্র চকবন্দ ও সমতল হইলে সর্ব্বত্র সমভাবে রস সঞ্চিত থাকে এবং উত্তাপও সর্ব্বত্র সমভাবে সংরক্ষিত হয়। আলবিহীন ও গড়েন জমিতে যে সকল আবাদ হইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায় যে, উচ্চ স্থান অপেক্ষা নিম্ন স্থানের

উদ্ভিদসমূহ বৃদ্ধিশীল ও তেজাল হইয়া থাকে এবং তাহার ফসলও পরিপুষ্ট হয় ও সমধিক হয়। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চ স্থান অপেক্ষা নিম্নাংশ অধিক সারাল,—অধিক রসাল।

ভূমির জিরেন

ক্ষেত্রকে মধ্যে মধ্যে 'জিরেন' দিতে হয় ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ক্ষেত্রে ক্রমাগত আবাদ হইতে থাকিলে মৃত্তিকান্তর্গত স্থূল পদার্থরাশি শীঘ্র দ্রবীভূত হইতে পারে না ফলতঃ উদ্ভিদগণ আহারাভাব অনুভব করে। মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে জমিকে মধ্যে মধ্যে এক বা দুই ফসল-কাল বিশ্রাম দেওয়া যায়। বিশ্রাম পাইলে সূর্য্যোত্তাপ, বায়ু, বৃষ্টি ও শিশিরাদির সাহায্যে মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ এইরূপ সমধিক পরিমাণে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপে নবশক্তি সঞ্চারিত হইবার পর ক্ষেত্রে যে কোন ফসলের আবাদ করা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ফলন্ত হইয়া থাকে। কোন মূল্যবান ফসলের আবাদ করিতে হইলে ভাবী ক্ষেত্রকে এক-ফসল-কাল জিরেন দিবার প্রথা অনেক দেশেই আছে। ত্রিহুতে যে ক্ষেত্রে তামাকের আবাদ হয়, তাহাকে পূর্ব্বেই এক ফসল-কাল জিরেন দেওয়া হইয়া থাকে এবং জিরেন-কালে তাহাতে মধ্যে মধ্যে হল-চালনা করা হয়।

উন্নত যন্ত্রাদির ব্যবহার

ইয়ুরোপ ও আমেরিকাতেও জমিকে জিরেন দিবার পদ্ধতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে কিন্তু আমেরিকার এক্ষণে জিরেন-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কর্ষণোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষকগণ ক্ষেত্রকে জিরেন না দিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া থাকে। মার্কিনাগণ কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পারিলে জমিকে জিরেন দিবার আবশ্যক হয় না। প্রাচীনকালে কৃষিকার্য্যের

উপযোগী উত্তম উত্তম যন্ত্র না থাকায় লোকে জমিকে উত্তমরূপে অর্থাৎ গভীররূপে কর্ষণ ও মৃত্তিকাকে তাদৃশ সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিতে পারিত না, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিদের খাদ্য-রাশির দ্রবীভূত হইতে কালবিলম্ব ঘটিত। এক্ষণে উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন উপরের হৃতসারমৃত্তিকা নিম্নভাগে এবং নিম্নের সারাল মৃত্তিকা উপরিভাগে আসিয়া পড়ে সুতরাং মৃত্তিকা সুন্দররূপে চূর্ণীত ও সঞ্চালিত হয়। এই সকল কারণে উৎপাদিকা-শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠে, ফলতঃ জমিকে জিরেন দিবার আদৌ আবশ্যক হয় না। ভারতবর্ষে এখনও সেই প্রাচীনাবস্থার তিরোধান হয় নাই, ভারতে এখনও সেই সাবেক আমলের লাঙ্গল চলিতেছে,—কাজেই ভূমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং তাহার লাঘবই হইতেছে। ভূ-গর্ভে সার সঞ্চিত থাকিতেও জমি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়ি, আর জমিকে মধ্যে মধ্যে জিরেন দিয়া অনর্থক পতিতাবস্থায় রাখিতে বাধ্য হই। এদেশের সাহেব কুঠিয়ালগণ ও অনেক কৃষিকর্ম্মনিরত সাহেব বিলাতী উন্নত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় অল্লাধিক ব্যক্তিও উন্নত লাঙ্গল, উন্নত বিদে প্রভৃতি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা এই সকল আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারাই উহাদিগের উপকারিতা যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

মৃত্তিকার আয়তন বৃদ্ধি

সুকর্ষণ হইলে কর্ষিত মৃত্তিকার পরিমাণ অধিক হয়,—মাটি ধূলাবৎ হয়। এতদবস্থায় একাধারে বহু পরিমাণ মৃত্তিকা ভৌতিক ক্রিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেক অণু-পরমাণুর উপর আপনাপন শক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর ও সুযোগ পায়।

আমাদিগের ক্ষুদ্র লাঙ্গল, মদিকা বিদে প্রভৃতি দ্বারা না হয় গভীর কর্ষণ, না হয় মৃত্তিকা চূর্ণন। ঈদৃশ যন্ত্র দ্বারা জমির সমুদায় স্থল সুচারুরূপে কর্ষিতও হয় না। তাহা ব্যতীত, রাশি রাশি ছোট বড় ঢেলা থাকিয়া যায়, ফলতঃ রৌদ্র ও শিশিরাদি সমগ্র মৃত্তিকার উপর নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। এই সকল কারণবশতঃ অধিক মাটি দ্রবীভূত হইতে পায় না—আর এইজন্য ভূমির শক্তি আমরা বুঝিতে পারি না।

জিরেনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, ক্ষেত্রকে পতিত রাখিয়া জিরেন না দিয়া, জিরেন-কাল-মধ্যে ক্ষেত্রে কোনও ফাও-ফসল উৎপন্ন করিলে চলিতে পারে। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ফাও-ফসলের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

—:০:—

বিরাম কাল

যে সকল দেশের বারিপাত অতি সামান্য, এমন কি—সম্বৎসরে ১০।১৫ ইঞ্চের অধিক নহে, তথাকার জমি স্বভাবতঃই শুষ্ক। তথায় যে পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্য থাকে, তাহা জীর্ণ হইয়া উদ্ভিদের আহারণোপযোগী হইতে অধিক সময় লাগে। গড়েন জমিতে জল অধিক শোষিত হইতে পায় না, তন্নিবন্ধন তথাকার মৃত্তিকা সরস না হইলে তাহাতে ভৌতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয় না, সুতরাং তাহার সারাংশ অনূঢ়াবস্থায় থাকিয়া যায়। এরূপ স্থলে ফাও-ফসল আবাদ করিয়া ক্ষেত্রকে জিরেন দেওয়া ভাল,

কিন্তু কত দিন অন্তর জিরেন দিতে হইবে তাহা ভূ-স্বামীর বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ভূমি একান্তই সারহীন হইলে এক বৎসর অন্তর জিরেন দিতে হয়,নতুবা দুই তিন বৎসর অন্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ঈদৃশ জমিতে যথোচিত পরিমাণে উদ্ভিজ্জ-সার দিতে পারিলে উহা অধিক পরিমাণে বৃষ্টির জল শোষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার ফলে অনূঢ় পদার্থ বহু পরিমাণে ও অল্পকাল মধ্যে জীর্ণ হইয়া থাকে। 'পতিত-জিরেনের' ব্যবস্থা অন্যরূপ।

পতিত-জিরেন

জমিকে পতিত-জিরেন দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এতদবস্থায় মধ্যে মধ্যে হলচালনা দ্বারা মৃত্তিকা আল্‌গা রাখিতে পারিলে বর্ষার তাবৎ জল ভূমি শোষণ করিয়া লইতে পারে। ভূমি যত অধিক জল শোষণ করিতে সক্ষম হইবে, মৃত্তিকা তত অধিক দিন সরস থাকিবে। স্বভাবতঃ যে জমি আর্দ্র তাহাকে বিশ্রাম দিবার আবশ্যক হয় না, বরং জিরেন দিলে তাহাতে নানাবিধ ঘাস ও আগাছা জন্মে এবং ভবিষ্যতে আবাদ করিতে বড় কষ্ট পাইতে হয়, কারণ জিরেন পাইবার হেতু সেই সকল আগাছার শিকড় ক্ষেত্রময় এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে যে, পরে সে ক্ষেতকে ক্রমাগত নিড়াইতে হয়। এই সকল আগাছার বীজ জন্মিয়া বীজ সমূহ ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়ে এবং নূতন ভাবে জন্মিতে থাকে, সুতরাং নিড়াইবার কাজ বাড়িয়া যায়।

জিরেনের উপকারিতা

জমিকে জিরেন দিলে আর একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এই যে, সংযুক্ত পদার্থ সমূহ বিমুক্তি লাভ করতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সংযুক্ত পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে উদ্ভিদ-খাদ্য দ্রবীভূত হয় উপরন্তু নাই-ট্রোজেন (যবক্ষারজান) বিমুক্ত হইবার পথ সরল হয়। জিরেন-

ভূমি কর্ষিত হইলে তন্মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির, প্রভৃতির ক্রিয়া অধিক ও বিস্তৃত হয় বলিয়া অনূঢ় স্থূল পদার্থ আর ঘন ভাবে সম্বদ্ধ থাকিতে পারে না, অগত্যা তাহারা নাইট্রোজেনকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে সারবান হাল্‌কা মাটিতে অনেক সময় উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে, কারণ হাল্‌কা জমির মাটি ফাঁপা থাকে, তন্মধ্যে বায়ু গমনাগমনের পথ প্রশস্ত থাকে এবং যৌগিক আকর্ষণে মৃত্তিকান্তর্গত বিমুক্ত নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। উক্ত সোরাজনজনিত বাষ্প ভূমির একটী বিশেষ সম্পত্তি এবং উদ্ভিদের একটী বিশেষ পুষ্টিকর আহার্য্য। ভূমি হইতে উক্ত বাষ্পের অপচয় হওয়া ফসলের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। উদ্ভিদের লাবণ্য ও বৃদ্ধিশীলতা—এই নাইট্রোজেন নামক বাষ্পের উপরেই নির্ভর করে। ঈদৃশ জমিকে জিরেন না দিয়া পর্য্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

ত্রিংশ অধ্যায়

—:•:—

পর্য্যায় আবাদ

একই ক্ষেত্রে বারংবার সমবর্গীয় ফসলের আবাদ করিলে তাহাতে তাদৃশ অধিক ফসল উৎপন্ন হয় না, এইজন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ করিতে হয়। এই প্রণালীকে 'পর্য্যায়-আবাদ' (Rotation) কহে। একই ক্ষেত্রে প্রতি

বৎসর ইক্ষুর আবাদ করিলে প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে ফলন কম হইয়া থাকে, আবার তৃতীয় বৎসরে দ্বিতীয় বৎসরের অপেক্ষা ফলন কমিয়া যায় এবং পরে ক্রমশঃ ফসল কমিতেই থাকে। এতদ্ব্যতীত ফসলের গুণবত্তারও হ্রাস হয় কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তাহাতে অপর ফসলের—বিশেষতঃ সিম্বীক ফসলের অর্থাৎ নানা জাতীয় মটর ও কলাই, নীল, শণ, বীন, বুট, সীম প্রভৃতির আবাদ করিলে ক্ষেত্রের নষ্ট-শক্তি পুনরায় সমাগত হয়। সকল ফসলের নিজ নিজ আহার্য্যের একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, সুতরাং একই ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি একই ফসলের আবাদ হইলে উক্ত ফসল আপাততঃ প্রয়োজনমত আহারাভাবে মুহ্যমাণ হইয়া পড়ে, মৃত্তিকা হইতে উক্ত ফসল যে যে পদার্থ সম্বৎসরে যে পরিমাণে আহরণ করিয়া লইয়াছে, সেই সেই পদার্থ আপাততঃ আহারণোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায় না, কিন্তু সে বৎসর তাহাতে উল্লিখিত কোন সিম্বীক ফসলের আবাদ করিলে শেষোক্ত ফসল তথা হইতে আপনাদিগের আহার্য্য যথা পরিমাণে পাইয়া থাকে। সিম্বীক উদ্ভিদের বিশেষত্ব এই যে, উহাদিগের মুল সমূহ বায়ুমণ্ডলস্থ যবক্ষারজান (nitrogen) আহরণ করিতে সমর্থ। এই কারণে তাহারা আপনারাই বৃদ্ধিশীল হয় অধিকন্তু নিজ নিজ অবয়বগত তাবৎ পদার্থ মরণকালে ভূমিতেই রাখিয়া যায়। এতদ্দ্বারা ভূমিতে সোরাজানের সঞ্চার হয়, তন্নিবন্ধন পরবর্ত্তী ফসলের উপকার হয়। অতঃপর—

দ্বিতীয় ফসলের, পূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহের প্রয়োজন না হওয়ায়, সেই সকল পদার্থ ইতোমধ্যে পুনরায় ভৌতিক ক্রিয়াবশে ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে এবং উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্য ফসল পরিবর্ত্তন করিলে প্রত্যক্ষ লাভ দেখিতে পা

যায়। পর্য্যায়-আবাদের জন্য কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল সে ক্ষেত্রের উপযোগী হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিতে হয় নতুবা হিত করিতে গিয়া বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ইক্ষু ক্ষেত্রে ভুট্টা, দেব-ধান্য বা গহমা, ধান্য, গোধুম, চীনা, মাড়ুয়া প্রভৃতি তৃণবর্গীয় উদ্ভিদের আবাদ করিলে চলিবে না, কারণ এ সকলই সম বর্গীয় উদ্ভিদ এবং ইহারা সকলেই ক্ষেত্রের নিতান্ত শক্তিহরণকারী। সিম্বীক উদ্ভিদগণ মৃত্তিকার শক্তি-সংগ্রাহক। সেই জন্য উল্লিখিত যে কোন ফসলের পর সিম্বীক ফসলের আবাদ করা উচিত।

প্রায় দেখা যায় ধান্য, গোধুম, চীনা, মাড়ুয়া প্রভৃতি একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ হইয়া থাকে, তাহার প্রথম কারণ,—আমাদের কৃষকগণের জমি অধিক থাকে না—সকলেরই প্রায় এক এক টুকরা মাত্র জমি। অগত্যা তাহাদিগকে সেই অল্প স্থানের মধ্যেই সম্বৎসর মধ্যে দুই বা তিনটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়,—জমিকে জিরেন দিলে কিম্বা তাহাতে অল্প মূল্যের বা অল্প ফলনের ফসল আবাদ করিলে চলে না। দ্বিতীয়তঃ—'বারমেসে' জমি প্রায় নাতিসিক্ত প্রদেশ বা ভূখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। বারিপ্রধান দেশে বারিপাত অধিক হয় বলিয়া মৃত্তিকায় যবক্ষারজানের অভাব হয় না, বরং বর্ষাকাল মধ্যে জমিতে উহা এতই অধিক সঞ্চিত হয় যে, সম্বৎসরের তাবৎ ফসলই তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। নাবাল জমি প্রায় রস প্রধান হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে রসের আধিক্য হেতু মৃত্তিকার সারাংশ উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে! ধান্য—বর্ষাকালের ফসল। উহা কর্ত্তিত হইলে সে জমিতে সারের অভাব থাকে না, তজ্জন্য তাহাতে গোধুমের আবাদ করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। অতঃপর সকল ক্ষেত্রেই যে গোধুমের আবাদ হয় তাহা

নহে। ডোবা ও নাবাল জমিতে এবং সরস বা দো-রসা মাটিতেই তাহা হইয়া থাকে। গোধুমের পর সে জমিতে বোরো ধান্য হইতে পারে না কারণ গোধুম কাটিবার পর এবং বোরো ধান্যের আবাদকালে ভূমি অতি শীঘ্র নীরস হইয়া আসে। এ সময়ে ভূমির সার আর অধিক বিগলিত হইতে পারে না, রসাভাবে উদ্ভিদগণও তাহা প্রয়োজনমত আহরণ করিবার সুবিধা পায় না। ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি বৃহজ্জাতীয় তৃণান্তর্গত উদ্ভিদ এবং তাহাদিগের আহরণ করিবার শক্তি স্বভাবতঃই অধিক। এই কারণে উহাদিগের ন্যায় বুভুক্ষু ফসলের জন্য পর্য্যায়-আবাদ অবশ্য স্পৃহনীয়।

ঋতু অনুসারে ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও পর্য্যায়-আবাদের ফল পাওয়া গিয়া থাকে। বর্ষাকালে যেরূপ গোধূমের আবাদ হয় না, সেইরূপ শীতকালে ধান্যের আবাদ হয় না, অগত্যা ঋতু অনুসারে নির্ব্বাচিত ফসলের আবাদ করিতে হয়। প্রাকৃতিক অবস্থা ভেদে কোন দেশে সম্বৎসরে একটি মাত্র, কোথাও দুইটী, আবার কোথাও তিনটী ফসলের আবাদ হইয়া থাকে। যে জমিতে একটী ফসল হয় তাহাকে এক-ফসলে' যে জমিতে দুইটী ফসল হয় তাহাকে 'দু ফসলে' এবং যাহাতে তিনটী ফসল হয় তাহাকে 'তিন-ফসলে' বা 'বারমেসে' জমি কহে। উল্লিখিত প্রণালীতে জমিকে বিভাগ করিলে বারমেসে জমিকে প্রথম, দু-ফসলে জমিকে দ্বিতীয় এবং এক-ফসলে জমিকে তৃতীয় শ্রেণীর জমি বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে বারমেসে জমি বড়ই বিরল। যাহাকে বারমেসে জমি বলা যায়, তাহাতে সচরাচর দুইটী ফসলই উৎপন্ন হইয়া থাকে—এক,—বর্ষায়, অন্য,—শীতে। শীতের অর্থাৎ রবি ফসল সাধারণতঃ ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে সংগৃহিত হয়। এ সময়ে কোন শস্যদ ফসলের আবাদ

করা চলে না। বোরো বা 'ষাটী' ধান্যের আবাদ হইতে পারে কিন্তু তাহাও অত্যন্ত নাবাল জমি ভিন্ন হয় না। তাহা ব্যতীত বোরো ধান্য উল্লেখযোগ্য ফসলের মধ্যে গণ্য নহে। যে সকল ক্ষেত্র হইতে রবিশস্য মাঘ মাসের শেষভাগে বা ফাল্গুনের প্রথমভাগে সংগৃহিত হইয়া থাকে তথায় ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, শশা, খেঁড়ো, চৈত্র-লাউ, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, নানাবিধ শাক প্রভৃতির আবাদ চলিতে পারে। ইহারা কৃষি ফসল নহে,—ঔদ্যানিক ফসল মাত্র। অযথা জমি ফেলিয়া না রাখিয়া তাহা হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়—এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ফল-পাকুড়ের আবাদ হইয়া থাকে। এইরূপ ঋতুবিশেষে একই ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ হয়, তাহাতে ক্ষেত্রের উপকার হইয়া থাকে।

একত্রিংশ অধ্যায়

—:*:—

মূলবিশেষে পর্য্যায়

অনেক উদ্ভিদের মূল দীর্ঘ হয়, অনেক উদ্ভিদ গুচ্ছমূল হয়। ধান্য, গোধূম, যব, প্রভৃতি গুচ্ছমূল উদ্ভিদ। ইহাদিগের গোড়ায় বহুসংখ্যক তন্তুবৎ মূল জন্মিয়া থাকে। উক্ত মূলগণ ভূগর্ভ মধ্যে ছয় বা আট অঙ্গুলির অধিক নিম্নে প্রবেশ করে না এবং উক্ত কয় অঙ্গুলি মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া উহারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পদার্থ আহরণ করে।

এইরূপ গুচ্ছমূল উদ্ভিদের একই ক্ষেত্রে বারম্বার আবাদ করিলে উপরিভাগের মৃত্তিকা শীঘ্রই সারহীন হইয়া পড়ে, প্রথমাপেক্ষা পরবর্ত্তী ফসলের ফলন হ্রাস হইয়া থাকে। অন্য দিকে সে জমিকে ঘন ঘন 'জিরেন' দিলেও ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষতি হয়। এরূপ স্থলে জমির ব্যবহার হয়, অথচ ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষতি না হয়, তাহা করিতে হইলে পরবর্ত্তী ঋতুতে উক্ত ক্ষেত্রে অড়হর, কার্পাস প্রভৃতি দীর্ঘমূল উদ্ভিদের আবাদ করিতে হয়, কারণ ইহাদিগের মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। উপরিভাগের মৃত্তিকা মধ্যে কি আছে বা না আছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ তাহারা মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে সার আহরণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার অভ্যন্তর দেশও যে সারপূর্ণ তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

তরি-তরকারির বাগানেও উল্লিখিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, তথা হইতে বারমাসই আনাজ-তরকারি পাওয়া যায়। গাজর ও মূলা দীর্ঘমূলক কিন্তু বীট ও শালগম দীর্ঘমূল নহে। বীট, শালগম মৃত্তিকার ভিতর অধিক দূর প্রবেশ করে না,—উপরিভাগ হইতেই সার আহরণ করিয়া জীবিত থাকে ও বৰ্দ্ধিত হয়। গাজর প্রভৃতি দীর্ঘমূল উদ্ভিদ অড়হর বা কার্পাসের ন্যায় উপরিভাগের মাটির উপর নির্ভর না করিয়া নিম্নতর স্থান হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব কারণে ক্ষুদ্র বা অনতি-দীর্ঘমূল উদ্ভিদের পর দীর্ঘমূল উদ্ভিদের আবাদ করিলে উপকার হইয়া থাকে।

অনেক জমি ভাসা-মূল উদ্ভিদের উপযোগী না হইতে পারে, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সার-হীন হইয়া পড়িতে পারে। তখন তাহাতে দীর্ঘ মূল ফসলের আবাদ করিলে তাহার কোন পুষ্টিকর পদার্থের অভাব হয় না, কিন্তু তাহা না করিয়া পুনঃ পুনঃ ভাসা-মূল

উদ্ভিদের আবাদ করিলে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। ভাসা-মূল উদ্ভিদের আবাদের পর দীর্ঘমূল উদ্ভিদের আবাদ করিলে শেষোক্ত ফসলের আবাদকাল মধ্যে উপরিভাগের জমি একদিকে যেমন জিরেন পায়, অন্যদিকে উক্ত ফসলের জন্য কর্ষণ ও পরিচর্য্যা হেতু অল্প দিন মধ্যে তাহা আবার সারবান্ হইয়া উঠে।

পর্য্যায়ে কীট নিবারণ

পর্য্যায়-আবাদের অন্য শুভফল এই যে, ক্ষেত্র মধ্যে নানাবিধ কীট বা রোগ স্থান পায় না। কতকগুলি রোগ আছে তাহারা ফসল বিশেষকেই আক্রমণ করে, আবার কতকগুলি কীট আছে, তাহারা ফসল-বিশেষকে ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। একই ক্ষেত্রে একই ফসলের বারম্বার আবাদ হইলে কীটবিশেষ বা রোগবিশেষ ক্ষেত্র মধ্যে স্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যখনই সে ফসলের আবাদ হয় তখনই তাহাদিগের আবির্ভাব হয়। এইরূপে যত দিন যায় তত তাহারা বিস্তার লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রের আলু দাগী হইয়া থাকে। এই 'দাগী' রোগকে Potato Scab বা Potato-rot কহে। যে ক্ষেত্রে এই রোগের আবির্ভাব হয় তাহা হইতে পরবৎসর আলুর আবাদ স্থানান্তরিত না হইলে উক্ত রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠে। ইক্ষু গাছে নানাজাতিয় কীট দেখা যায়। ইহারা ইক্ষুকে নষ্ট করিয়া ফেলে। বার্ত্তাকু গাছের জাতিগত যে কয়টী কীট আছে তাহারা বার্ত্তাকু গাছের শিকড় ও গাছের ডগায় ছিদ্র করিয়া গাছ নষ্ট করে, ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ফলই নষ্ট করিয়া দেয়। সকল ফসলই মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রান্তরিত হইলে তাহাদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ফসল বিশেষের জাতিগত কীট অন্য ফসলকে প্রায় আক্রমণ করে না। ফসল উঠিয়া গেলে সেই সকল কীট অথবা রোগের কীটাণু germs বা

spores) মৃত্তিকা মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বা নির্জীবাবস্থায় অবস্থান করে। সময় আগত হইলে আবার তাহারা নবজীবন লাভ করে এবং বংশ বৃদ্ধি করিয়া আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ হইলে অগত্যা তাহারা বিলুপ্ত হয়। বারম্বার এক ক্ষেত্রে একই ফসলের আবাদ হইলে উদ্ভিদগণ তাদৃশ তেজাল না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষীণ ও দুর্ব্বলের নিকট রোগ চিরদিনই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। অতএব ফসলকে তেজাল ও নীরোগ রাখিতে হইলে সকল ফসলকেই মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরিত করা উচিত।

এতদ্ব্যতীত—

কতকগুলি আগাছাও ফসল বিশেষের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। যে ফসলকে ইহারা ভাল বাসে কিম্বা যে ফসলের অনুরূপ পাট পরিচর্য্যা পাইলে ইহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে ফসলের আবাদের সূত্রপাত হইলেই ইহারা যেন আগ্রসহকারে দেখা দেয়। বৎসর বৎসর ফসল ক্ষেত্রান্তরিত হইলে তাহারা আর দেখা দিতে পারে না। এই সকল আগাছায় সমগ্র ক্ষেত্র জঙ্গলময় হইয়া যায়। ইহারা ফসলের আহার্য্য অপহরণ করে ও নানাপ্রকারে ক্ষেত্রস্বামীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে।

পর্য্যায়ে আগাছা

ক্ষেত্রকে অনর্থক পতিতাবস্থায় রাখিলে ক্ষত্রস্বামীর ক্ষতি হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পাঠক ও তাহা বুঝিতে পারেন। ক্ষেত্রকে বারমাস খাটাইয়া লইতে হইবে। জগতের সকলেই যখন ক্রিয়াশীল, তখন ভূমিকে আমরা কেন না সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল রাখিতে চেষ্টা করিব? জমিকে পতিত রাখিতে হইলে আমাদিগের পানাহার ও সময়ে সময়ে বন্ধ রাখিতে হয়। আমাদিগের বাঁচিয়া থাকিবার একটী খরচ আছে। জীবনের প্রতিমূহুর্ত্তই ব্যয় সাপেক্ষ। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আমি

ঘর্ম্মাক্ত হইতেছি। উক্ত ঘর্ম্ম আমার শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। ঘর্ম্ম শরীরজাত পদার্থ। উহার সহিত শরীরান্তর্গত কোন কোন পদার্থ বহির্গত হইয়া যাইতেছে। সেই পদার্থ নিচয়কে পুনরায় শরীর মধ্যে আনিতে হইলে আমাকে পানাহার করিতে হইবে। পানাহারে খরচ আছে। তাহাতেই বলিতেছি জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তই খরচ সাপেক্ষ,—বিনা খরচায় বাঁচিয়া থাকা যায় না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যখন আমরা অভাবগ্রস্ত, তখন ভূমিকে বিশ্রাম দিই কিরূপে? তবে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন্ ফসল কোন্ ফসলের পর আবাদ করিতে হয়। কোন ফসলের আপাততঃ আবাদ করিবার ইচ্ছা বা সুযোগ না থাকিলেও ক্ষেত্রে হরিৎ-সার (green manure) দিবার জন্য সাময়িক কোন ফসলের আবাদ করতঃ যথা সময়ে হলচালনা দ্বারা সেই সকল উদ্ভিদকে ভূশায়ী করিয়া দিলে উহারা বিগলিত হইয়া ভূমির যে উৎকর্ষতা পরিবর্দ্ধিত করে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জমিতে আবাদ থাকিলে মৃত্তিকার ক্রিয়াশীলতা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে।

মুখ্য ও গৌণ ফসল

জমির উর্ব্বরতা সংরক্ষণ বা পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্য অবিমৃশ্য-ভাবে যে কোন ফসলের আবাদ করা উচিত নহে—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পর্য্যায়ে তিনটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বন্ধ থাকা উচিত। যে কয়টী ফসলকে পর্য্যায়ক্রমে আবাদ করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটী সঙ্কল্প স্থির করতঃ বিবেচনা সহকারে যথাযোগ্য ফসল নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে যে ফসলের আবাদ করিতে হইবে তাহাদিগের মধ্যে একটী ফসল প্রধান অর্থাৎ গৃহস্থালী বা অর্থকারী হওয়া উচিত। উক্ত গৃহস্থালী বা অর্থকরী ফসলকে মুখ্য বা মধ্যবিন্দু স্বরূপ মনে করিয়া অপরাপর বা

গৌণ ফসল নির্ব্বাচন করিতে হইবে। গৌণ ফসল এরূপ হওয়া উচিত যে তদ্দ্বারা মৃত্তিকার উপকার হইতে পারে। যে কার্য্যই করা যাউক, তাহার সহিত অর্থের সম্বন্ধ—অন্ততঃ কাল্পনিক সম্বন্ধ—না থাকিলে ফসলের তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বিক্রয় করি বা না করি, সকল ফসলের এককটী বাজার দর আছে। এস্থলে বাজার দরের কথা বলাই উদ্দেশ্য। অতঃপর, তৃতীয় ফসলটী হরিৎসারোপ-যোগী হইলে ভাল হয়। শেষোক্ত ফসলকে হরিতাবস্থায় ভূশায়ী করিয়া দিতে হয় এবং তাহা হইলে মৃত্তিকায় সার প্রদানের ফল হয়। নীল, শণ, বুট প্রভৃতি হরিৎসারের জন্য আবাদ করিতে হইলে খুব ঘন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ঘনরূপে বীজ বুনিলে গাছে ক্ষেত ভরিয়া যায়, তাহার ফলে ক্ষেত্রমধ্যে আগাছা ও উলু শর প্রভৃতির ন্যায় সারশোষক উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না।* দীর্ঘমূল আগাছাকে কর্ষণ দ্বারা উচ্ছেদ করা একরূপ অসম্ভব।

পর্য্যায়ের কাল ব্যবধান

ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইলে পর্য্যায়-প্রণালীতে আবাদ করিতে বিশেষ সুবিধা হয় কারণ পর্য্যায়ের জন্য সঙ্কল্পিত সকল ফসলই প্রতি বৎসর কোন না কোন খণ্ড ক্ষেত্রে স্থান পাইয়া থাকে। যদি ইক্ষুই ক্ষেত্রস্বামীর প্রধান ফসল হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রস্বামীর পক্ষে ইক্ষুর আবাদ কোন বৎসরই বন্ধ করা উচিত নয়। প্রথম বৎসর এক ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় বৎসর অন্য ক্ষেত্রে,

* যে ক্ষেত্র অধিক দিন পতিত থাকায় আগাছার আবাস ভূমি হইয়া পড়ে, অর্থ-করী ফসলের আবাদ করিবার পূর্ব্বে তাহাতে ঘনভাবে কোন শস্যের আবাদ করিলে আগাছা জন্মিতে পারে না। এইরূপ দুইএকবার আবাদ করিতে পারিলে উহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। অনেক আবাদী ক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ ক্ষেত খামার হইতে ঘাসের বীজ উড়িয়া আসিয়া পড়ে তন্নিবন্ধন ভাল ক্ষেত্রেও উহাদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য মধ্যে মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই হরিৎ ফসলের আবাদ করা ভাল।

তৃতীয় বৎসর অন্য ক্ষেত্রে উহার আবাদ করিতে পারেন এবং চতুর্থ বৎসর পুনরায় প্রথম বৎসরের ইক্ষু ক্ষেত্রে ইক্ষুর আবাদ করিতে পারেন। একদিকে ইক্ষু যেরূপ প্রতিবৎসর নূতন ক্ষেত্রে পাইতে লাগিল, অন্য দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসল ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য ক্ষেত্র পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইলে প্রতিবৎসর ইক্ষুর আবাদ করা চলে না, আর যদিও চলে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় অর্থকারী ফসলকে স্থান দেওয়া যায় না, কেবল মাত্র ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত করিবার জন্য হরিৎ-ফসলের আবাদ করিতে পারা যায়।

যে কয়েক বৎসর পরে প্রধান ফসল পুনরায় প্রথম বৎসরের ক্ষেত্রে স্থান পায় সেই কয় বৎসর ধরিয়া এক একটী পর্য্যায়ের নাম হইয়া থাকে প্রতি বৎসর একই ক্ষেত্রে প্রধান ফসলের আবাদ হইলে তাহাকে 'এক-বছুরে', একবৎসর অন্তর হইলে 'দু-বছুরে, তিন বৎসর হইলে 'তিন বছুরে'—পর্য্যায় বলে। পর্য্যায়,—চক্রের ন্যায় যে স্থান হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করে দুই, তিন হইতে পাঁচ সাত বৎসরে ঠিক সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাত বৎসরের অধিক পর্য্যায়ের পরিমাণ বা ব্যাপ্তি হইতে দেখা যায় না।

কেবল উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার বা পুনরানয়ন করিবার জন্য পর্য্যায় প্রণালী অবলম্বন না করিলেও চলিতে পারে, কারণ প্রতি ফসলের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সার প্রদান করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিৎফসল ক্ষেত্রে চষিয়া দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু পর্য্যয়ের সহিত অনেকগুলি উদ্দেশ্য সন্নিহিত থাকায় উহাকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না।

তামাকের ন্যায় কোন কোন ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট জমির প্রয়োজন

কিন্তু সেরূপ জমি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। যে জমিতে তামাকের অনুকূল সার-পদার্থ অবস্থিত তাহাতেই উহা উত্তম জন্মে এবং সেই জমিই উহা ভাল বাসে। ঈদৃশ মূল্যবান অর্থকারী ফসলকে প্রতি বৎসর এক ক্ষেত্রেই থাকিতে দেওয়া ভাল কারণ স্থানান্তরিত হইলে উহার গুণাবতার ইতরবিশেষ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, এক ক্ষেত্রে বহুদিন উহার আবাদ করিতে হইলে ফসল কর্ত্তিত হইবার পর হইতে পুনরায় আবাদ আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের পরিচর্য্যা করিতে হয়, ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সার প্রদান করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও বহুদিন এ প্রণালীতে সুবিধা হয় না। ইহাতে জমির সমূহ ক্ষতি হয় এবং ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমশঃ এত হ্রাস হইয়া আসে যে, ক্ষেত্রস্বামীকে অগত্যা হয় ক্ষেত্র, না হয় ফসল, পরিবর্ত্তন করিতেই হয়। যে সকল জমিতে প্রতিবৎসর পলি পড়ে তাহাতে বহুকাল একই ফসলের আবাদ হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ কৃষিরসায়নিক Lawes ও Gilbert সাহেবদ্বয় ইংলণ্ডের রদামষ্ট্যাড (Rathamstadt) কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ষাট বৎসর এক ক্ষেত্রে গোধূমের আবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষেত্র বা ফসল—কিছুরই কোন ক্ষতি হয় নাই। এইরূপ উপমা অতি বিরল। তাহা ব্যতীত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে ফসলের আবাদ হয় তাহার প্রতি পরীক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। অল্প ভূমিতে অল্প ফসলর আবাদ হয় তন্নিবন্ধন ভূমির শক্তি হ্রাস হইতে পারে না। এরূপ বিরল বা একমাত্র দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া ক্রমান্বয়ে একই ফসলের আবাদ করা কোন মতে পরামর্শসিদ্ধ নহে। এক ক্ষেত্রে বহুদিন এক ফসলের আবাদ হওয়ায় বহু বহু ক্ষেত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

চা-বাগিচায় সবুজ সার।

বিস্তীর্ণ ভূমিকে সবুজ সার প্রয়োগের প্রথা আজকাল চা-বাগানে খুব প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বসাধারণে সে পদ্ধতি অনুসরণ করে নাই। বিস্তৃত ক্ষেত্রেই ইহা দ্বারা সুবিধা হয় বলিয়া আসামের চা-বাগানে ইহার প্রবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে। উক্ত পদ্ধতি চা-বাগানে যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও অধিক দিন হয় নাই। বিগত ২০।২৫ বৎসর মধ্যে সমগ্র আসামে প্রায় প্রত্যেক চা-বাগানে প্রতি বৎসর শীতকালে যখন শেষবার পাতা সংগৃহীত হয়, তাহার অব্যবহিতকাল মধ্যে চা-বৃক্ষ ছাঁটা যায়। চা-বৃক্ষ ছাঁটা গেলে সেই সকল ছাঁট ভূমিতেই নিপতিতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে নিপতিতাবস্থায় কয়েকদিন থাকিলে সেই সকল ছাঁট বা কর্ত্তিত শাখা-প্রশাখা হইতে পাতা সকল স্বতঃই খসিয়া ভূপতিত হইয়া যথাস্থানে পচিয়া গিয়া মাটিতে মিলিত হয়। ইহার দ্বারা চা-বাগিচার ক্ষেতে একদফা সার দেওয়া হইল। অতঃপর, সেই ক্ষেতময় ধঞ্চে, অড়হর, নীল, শণ, প্রভৃতি সিম্বাক জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ঘন করিয়া বাপিত হয়। বাপিত বীজ উপ্ত হইয়া ক্রমে তজ্জাত গাছ সকল ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে, তাবৎ উপ-ফসল,—ধঞ্চে, নীল,অড়হর বা যে কোন ফসল বাপিত হইয়া থাকে। অতঃপর তৎসমুদায়কে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া ভূশায়ী করিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই উক্ত কার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হয় কারণ,আষাঢ় মাস হইতেই বর্ষার সূত্রপাত হয়। বর্ষার সমাগম হইলেই ভূশায়িত গাছগুলি বিগলিত হইতে থাকে। ইহাই চা-বাগিচায় দ্বিতীয় বার সার প্রদান। সুপ্রশস্ত ক্ষেত-খামারে বা বাগ-বাগিচায়, কিম্বা মাঠ-ময়দানে সার প্রদানের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মাটি খুব সারাল হইয়া উদ্ভিদকে আহার প্রদান করে,—উদ্ভিদ সমূহ তেজাল হয়, উদ্ভিদগণ সমধিক ও শীঘ্র বৃদ্ধি

পাইয়া আশাতীত রাশি রাশি পত্র প্রদান করিয়া থাকে। চা-বাগানে এক এক বন্দে হাজার হাজার গাছ। প্রত্যেক গাছে স্বতন্ত্রভাবে সারদেওয়া একবারেই অসম্ভব। উল্লিখিত প্রণালীতে সীম্বিক উদ্ভিদের আবাদ হইলে কাজ কত সহজ হয়, কত ব্যয়-সংক্ষেপ হয়, কত ঝঞ্চট কমিয়া যায়!

সীম্বিকের উপকারিতা

সীম্বিক উদ্ভিদের আবাদ হইলে তথাকার মাটি স্বতঃই নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান সঞ্চিত হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্র উদ্ভিদটী বিগলিত হইলে তজ্জনিত পাতাসার দ্বারা চা-বৃক্ষগণ চা-বৃক্ষের উপযোগী খাদ্য সহজেই পাইয়া থাকে, ইহাও, চা-বৃক্ষগণের কম লাভ নহে। পাতাসার দ্বারা উদ্ভিদের অবয়ববৃদ্ধির সুবিধা হয়, এইজন্য তাবৎ বৃক্ষ-লতাদি, বিশেষতঃ চারা অবস্থাপন্ন তরুলতার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চা-বাগানে সবুজ-সারের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় চা-পাতার ফলন অধিক হইয়াছে। পাতাসারের দ্বারা গাছের ফলন-ফুলনের বিশেষ উপকার হয় না, তবে কিছু উপকার যে হয় না, তাহাও নহে।

স্থায়ী সীম্বিক বৃক্ষ।

নাইট্রোজেনসম্ভূত পদার্থ ভূমিতে সঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এক-দিকে যেরূপ নানাবিধ সীম্বিক উদ্ভিদের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে, অন্যদিকে চা-বাগানের স্থানে স্থানে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে সীম্বিক বর্গীয় বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে এবং তাহারও কয়েকটী উদ্দেশ্য আছে। ১ম, চা-ক্ষেত্রে ছায়া উৎপাদন, ২য়, উক্ত বৃক্ষ হইতে বারমাসই অল্লাধিক পাতা স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, সেই সকল পাতা মাটির অবয়ব বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট করে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারিলে কৃষকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। ক্ষেত্র হইতে ফসল উৎপন্ন করা সহজ, ফসলের ফলন বৃদ্ধি করাও সহজ, কিন্তু ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা একটী দুরূহ কার্য্য।

কৃষক ও উদ্যানক

ক্ষেত্র হইতে নানাবিধ ফসল, ফল পাকুর বা শাক-সবজী উৎপন্ন করা সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজনীয় বিষয়। আশু ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার প্রদান করিয়া কৃষকের লাভ হয়, কিন্তু ইহা বুঝা উচিত যে, যে সার প্রদত্ত হয় তাহার বহু পরিমাণ ফসলের সহিত স্থানান্তরিত হয়। উদ্যানকগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। তাহারা প্রতিনিয়ত সার ব্যবহার করিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়া আসে কিছুতেই ক্ষেত্রকে নিঃস্ব বা হৃতসার হইতে দেয় না। কৃষকগণ তাহা পারে না বলিয়া কৃষিক্ষেত্র দিন দিন শক্তিহীন হইয়া পড়ে। উদ্যানক ও কৃষক—এতদুভয়ের কার্য্য প্রণালী মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা গিযা থাকে। কেবল তাহাই নহে। কার্য্য প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু উভয়ের আর্থিক আয়েরও তারতম্য হইয়া থাকে—ইহা অবশ্যম্ভাবী! উদ্যানকের জমি প্রায় প্রতিনিয়তই কোন না কোন তরি-তরকারী বা ফল-ফুলে আবদ্ধ থাকে। এই জন্য উদ্যানক আপন ভূমি হইতে বারমাস কিছু-না-কিছু সামগ্রী আদায় করিয়া থাকে, ফলতঃ তাহার আয় অধিক হয়। সার না দিয়া উদ্যানকে

চিরদিন নিশ্চিত মনে ক্ষেত্রকে দোহন করিলে মৃত্তিকা কয়দিন উর্ব্বরা থাকিতে পারে? উদ্যানক নিরন্তর সার ব্যবহার করে বলিয়া পর্য্যায়ের প্রতি তাদৃশ—অনেক স্থলে আদৌ—লক্ষ্য রাখে না, অধিক কি, অধিকাংশ উদ্যানকই পর্য্যায়ের অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝে না। সার ব্যবহার দ্বারাই তাহার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়। পর্য্যায়ের প্রতি উদ্যানকের যেরূপ ঔদাস্য, সার সম্বন্ধে কৃষকের সেই ভাব। ফসল আহরণ করিয়া লইবার পর কৃষক আর ক্ষেত্রের বিষয় ভাবে না, তাহার আরও যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, সে কথা মনে করে না। অতঃপর পরবর্ত্তী ফসলের সময় আগতপ্রায় হইলে কৃষক পুনরায় হাল-চৌকী লইয়া ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। উদ্যান-ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বারমাস অক্ষুণ্ণ থাকিবার অন্যতম বিশেষ কারণ আছে। উদ্যানের ভূমি ঘন ঘন সঞ্চালিত হয়, কিন্তু ক্ষেত-পাথার তাহা হয় না। উদ্যানে ঘন ঘন নিড়ানী হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা বিচলিত ও চূর্ণীত হওয়ায় তন্মধ্যে বায়বাদি প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্তিকার সজীবতা রক্ষা করে। অনন্তর ভূমধ্যস্থ সোরাণুগণ (Nitrosmonades) বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপাদির সংস্পর্শে অধিকতর কার্য্যকরী হয় এবং আপনাদিগের বংশবৃদ্ধি করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়।

মাটির সঞ্চালন হেতু তাহার মধ্যে দুইটী বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সমাবেশ হইয়া থাকে, ১ম—বায়বাদির সংস্পর্শিত হইয়া জীবাণুগণ বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজন আহরণ করিয়া ভূমির সোরাজনিক লবণ বৃদ্ধি করে এবং জৈব পদার্থকে (Organic matter) জীর্ণ করিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়; ২য়—বায়ুমণ্ডলস্থ সোরাজান ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্তিকার স্থূল উপকরণ (Inorganic elements) সমূহকে আপেক্ষিক সূক্ষ্মতায় পরিণত করে। উক্ত স্থূল পদার্থ সমূহ যাবৎ

না সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয় তাবৎ উহারা উদ্ভিদ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। স্থূল উপাদান সমূহ কত সূক্ষ্ম হইলে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইতে পারে, উদ্ভিজ্জ ভস্ম দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন পদার্থ সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইলে বাতাসে উড়ে ও জলে ভাসে—ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। একমুষ্টি শুষ্ক ঝুরা মাটি বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া দিলে বায়ুপ্রবাহে তাহা অনেক দূর গিয়া পড়ে, বহু উচ্চ অট্টালিকা, স্তম্ভ বা বৃক্ষের উপর গিয়া স্থান পায়, নিকটে স্থির জলাশয় থাকিলে তাহাতে পতিত হইয়া প্রথমাবস্থায় ভাসিয়া থাকে। মৃত্তিকার যে অংশ ঈদৃশ অবিভাজ্য ও লঘু অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহাই উদ্ভিদের আশু আহরণোপযোগী। কৃষকের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সেরূপ সঞ্চালিত হইতে পায় না। ফসলের প্রথমাবস্থায় দুই একবার নিড়ানী হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু পরে আবাদের গাছ বড় হইয়া উঠিলে আর নিড়ানী হয় না এবং নিড়ান করিবার সুবিধা হয় না।

সার সংস্থানের উপায়

তরি-তরকারি, ফল, ফুল প্রভৃতি উদ্যানকের ফসল। এই সকল জিনিষের আবাদে যাহা উৎপন্ন হয়, উদ্যান হইতে তাহাই সংগৃহিত হইয়া থাকে, অবশিষ্টাংশ ভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হয় কিংবা উদ্যানক তৎসমুদায়কে সংগ্রহ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেয়, পরে আবার জমিকে প্রত্যর্পণ করে, এতদ্ব্যতীত সার প্রদান করে। কৃষকের আবাদজাত শস্যাদি সংগৃহিত হয়ই, উপরন্তু উদ্ভিজ্জাংশও সংগৃহিত হইয়া স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে কৃষিক্ষেত্র শীঘ্র সারহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু কৃষকগণ যদি সারের মর্ম্ম বা উপকারিতা বুঝিত তাহা হইলে ক্ষেত্রকে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিত না। অপর স্থান হইতে সার আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিবার সামর্থ বা সুযোগ

না থাকিলেও যে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা রক্ষা বা বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না তাহা নহে। ফসলের ব্যবহার্য্য অংশ সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্টাংশকে ভূমিতে স্থান পাইতে দিলে কিংবা গৃহপালিত পশুদিগকে খাইতে দিবার পর তজ্জাত পূরীষাদি সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলে সমূহ লাভ হইবার কথা। এইজন্য—

পশু পালনের প্রয়োজনীয়তা

সকল কৃষকের অল্পাধিক গো মেষাদি পশু পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যের সহিত পশুপালনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। জীবগণ যাহা কিছু পানাহার করে তৎসমুদায়ই প্রকারান্তরে প্রত্যর্পণ করে, জীবন ধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সামগ্রী দ্বারা উদর পূর্ণ করে। যে সামান্য ভাগ আপাততঃ শরীর রক্ষার্থে বীজ মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহাও পরিণামে ভূমিতে আসিয়া সংযুক্ত হয়। এ সংসার হইতে জীবোদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে, কেহ একটী পরমাণু পর্য্যন্ত লইয়া সরিয়া পড়িতে পারে না, তবে নানাকারণে একস্থানের জিনিষ অন্যস্থানে গিয়া পড়িতে পারে। পশুপালন দ্বারা সংসারের অশেষ উপকার সাধিত হইয়া আসিতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে। পূরীষাদি অতি ঘৃণ্য ও তুচ্ছ সামগ্রী মধ্যে গণ্য হইলেও একমাত্র কৃষিকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি তাহার অমূল্যতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। যাহা হউক, পশুপালন করিলে কৃষকগণ সমূহ সার পাইতে পারে, অন্যদিকে গৃহস্থালীরও অন্য অনেক উপকার হইতে পারে।

সারোৎপাদন যন্ত্র

ক্ষেত্রজাত যে সকল সামগ্রী জীবগণ আহার করে, তৎসমুদায় জীর্ণ হইয়া এরূপ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় যে তাহার প্রভূতাংশ উদ্ভিদগণ সবই আহরণ করিতে সমর্থ। এইজন্য জীবমাত্রকেই উদ্ভিদের

আহার প্রস্তুতকারী যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়। জীবগণ যাহা উদরস্থ করে অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাকে জীর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় পচিতে দিলে কালবিলম্ব ঘটে। একমুষ্টি চাউল বা গোধুমকে পচাইতে হইলে খুব ন্যূন কল্পে ১০।১৫ দিবস সময় অতিবাহিত হয়, তাহা ব্যতীত উক্ত সময় মধ্যে উহার বাষ্পীয় জলীয় (volatile) ভাগ অল্পাধিক শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু উদর যন্ত্রে তাহা না হইয়া ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হইয়া প্রধানতঃ মূত্র ও পুরীষরূপে বর্জ্জিত হয় অথচ জলীয় বা বাষ্পীয় অংশ অধিক নষ্ট হইতে পায় না। উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থের সংস্থান হেতু ভূগর্ভ যেরূপ একটী কারখানা বা রসায়নাগার স্বরূপ, জীবদেহও সেইরূপ। উদ্ভিদ নিজেও একটী যন্ত্র মধ্যে গণ্য। উদ্ভিদগণ ভূগর্ভ ও বায়ুমণ্ডল হইতেই নানা পদার্থ আহরণ করতঃ ফলমূলাদিরূপে আমাদিগকে প্রদান করিতেছে, আমরা তৎসমুদায়কে উদরস্থ করিয়া পরে বর্জ্জন করিতেছি। জগদীশ্বরের কি সুন্দর নিয়ম! সকল পদার্থই এক শৃঙ্খলে আবাদ থাকিয়া পরস্পরকে বজায় রাখিতেছে। এই চক্রের (cycle) কথা ভাবিতে গেলে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। যাহা হউক, এস্থলে আমরা দুইটী জিনিষ দেখিতে পাইতেছি—ভোজ্য ও পরিত্যজ্য। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—ভোজ্য হইতে পরিত্যজ্যের বা পরিত্যজ্য হইতে ভোজ্যের উৎপত্তি কিনা? ইহার বিচার করা গ্রন্থকারের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে উহারা পরস্পরের উপর নির্ভরপর।

সমাবেশ চক্র

জীব-পরিত্যক্ত পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকা নিরন্তর পরিপুষ্ট হইতেছে। সেই সঙ্গে ভূমির নষ্ট-শক্তি পুনরাগত হইতেছে। সেই সকল পদার্থ ভূগর্ভে আসিয়া

তন্মধ্যস্থ পদার্থের ও রসোত্তাপের সমাবেশ বিমুক্ত হইয়া নূতন পদার্থে পরিণত হইতেছে এবং উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ও প্রাণী জগতকে ফল-পুষ্প প্রদান করিতেছে। পুরীষদি ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য বলিয়া তৎসমুদায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেও ঘৃণা করি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সেই সকল দ্রব্যই রূপান্তরিত হইয়া আমাদিগের উদরে গিয়া প্রতিদিন স্থান পাইতেছে—ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না। এস্থলে উদ্ভিদের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য ভূগর্ভকে একটী বৃহৎ কারখানা বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদগণ তৎসমুদায় আহরণ করিয়া ফল-ফুলাদি প্রদান করিয়া প্রাণী জগৎকে প্রতিপালন করিতেছে, ফলতঃ উদ্ভিদও আমাদিগের আহার্য্য ও বিলাস দ্রব্যোৎপাদন করিবার যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও মৃত্তিকা—ইহারা পরস্পরে কিরূপ চক্রাকারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে। এই চক্র বা মধ্যে বায়ুমণ্ডলকে গ্রহণ করিতে পারা যায়। কারণ উহার মধ্যে প্রাণী উদ্ভিদ বা মৃত্তিকা—এ তিন জগতের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভূমি হইতে বাষ্পাকারে রস বায়ু মণ্ডলে যাইতেছে, আবার বারি বা শিশিররূপে পৃথিবীতে আসিয়া স্থান পাইতেছে। সেই রস উদ্ভিদে যাইতেছে এবং উদ্ভিদ তাহা পত্রকূপ দ্বারা বাষ্পাকারে বর্জ্জন করিতেছে, এবং প্রাণীগণকেও শস্যাদিরূপে প্রদান করিতেছে। জগতে সকল জিনিষের মধ্যে প্রায় এইরূপ দান প্রতিদান সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সমাপ্ত

কৃষিতত্ত্ববিদ্

উদ্যানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

কৃষি-গ্রন্থাবলী—

1. A Treatise on Mango (3rd Edition)

2. Potato Culture (5th Edition) As 8.

৩। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ৭ম সংস্করণ। মূল্য ১॥০। হাতে-হেতেড়ে চাষ-আবাদ শিখিবার ও করিবার ইহাই একমাত্র পুস্তক।

৪। সব্জীবাগ (৯ম সংস্করণ) মূল্য ১৲—ইহাতে বিলাতী ও দেশী শাক-সব্জীর আবাদ ও তদ্বির-প্রণালী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৫। ফলকর (৬ষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ১॥০ ইহাতে দেশী ও বিদেশী ফলের আবাদের বিষয়, গাছের কলম করিবার প্রণালী ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে এবং নানাবিধ কলমেরও ছবি আছে।

৬। মালঞ্চ (৩য় সংস্করণ) মূল্য ১॥০ (সচিত্র) কিরূপে বাগান ও তাহার পথ-ঘাট তৈয়ারী করিতে হয়, দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ-পালা লালন-পালন ও কিরূপে কলম করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৭। পশুখাদ্য (২য় সংস্করণ) মূল্য চারি আনা। পশুদিগের খাদ্যোপযোগী নানাবিধ পুষ্টিকর ঘাষ,—গিণী ঘাষ, রিয়ানা, খাড়ি ইক্ষু, ইত্যাদির আবাদ প্রণালী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

৮। আয়ুর্ব্বেদীয়-চা (২য় সংস্করণ) মূল্য চারি আনা। এই পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদীয়-চা অর্থাৎ অশ্বগন্ধা গাছের আবাদ প্রণালী এবং তাহা হইতে চা প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী লিখিত আছে।

৯। গোলাপ-বাড়ী (সচিত্র) মূল্য ৸০ বার আনা। গোলাপ সম্বন্ধে তাবৎ কথা ইহাতে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

১০। মৃত্তিকাতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

১১। ভূমিকর্ষণ—ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য কি? কি প্রণালীতে ভূমিকর্ষণ করিলে কিরূপ ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে—মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

১২। কার্পাস-কথা (২য় সংস্করণ) মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

১৩ উদ্ভিদ-খাদ্য—মূল্য ॥০ আট আনা।

১৪ উদ্ভিজ্জীবন—মূল্য ॥০ আট আনা।

১৫ ভারতীয় অর্থশাস্ত্র—মূল্য ।০ চারি আনা।

১৬ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংস্করণ) মূল্য চারি আনা।

১৭ প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান—মূল্য ।০ চারি আনা।

১৮ বিষয়ী (যন্ত্রস্থ)......